নিগূঢ়ানন্দ

উৎসর্গ

৺মাকে

"Our Sweetest Songs are those
that tell of saddest thought."

EKTI BEGAMER ASRRU
BY NIGURANANDA
RUPEES SIX ONLY

"ওহ্ ঘাম-ই গাম্মা বেগম"

॥ এক ॥

ইতিহাসের অস্ত্র ঝঞ্ঝনার মধ্যে হঠাৎ এক ফোঁটা অশ্রু দেখলে আমরা থমকে দাঁড়াই। এক ফোঁটা অশ্রুর ব্যাপ্তি এত বড় হয়ে দেখা দেয় যে, যেন সমস্ত ইতিহাসটাকেই তা' ঢেকে দেয়। অতি ক্ষুদ্রের কাছে অতি বৃহৎ আশ্চর্য্য ভাবে ঢাকা পড়ে যায়। মানব মমতাবোধ সেই অতি ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করে দিগন্ত ব্যাপী স্বপ্নের জাল বোনে। আর সেই স্বপ্নের জালে নিজেকে আবৃত করে স্নিগ্ধ কল্পনায় ডুবে গিয়ে কিসের স্বাদ গ্রহণ করে। ইতিহাসের অস্ত্র ঝঞ্ঝনার দিনে গান্না বেগম তেমনি একটি চরিত্র, তেমনি এক বিন্দু দীন অশ্রুজল। কিন্তু সেই এক ফোটা অশ্রু জলের প্রশান্তি এত ব্যাপক, এত গভীর যে, গোটা ইতিহাসটাকে তা লুকিয়ে ফেলতে চায়।........

গোয়ালিয়রের তের মাইল উত্তরে নুরাবাদে ছোট্ট একটি কবর। সে কবরের উপর লেখা :

"ওহ্‌ ঘাম-ই, গান্না বেগম"

হায়! গান্না বেগমের জন্য একটুখানি কাঁদ।

এই একটুখানি চোখের জলের স্নিগ্ধতা যে চায়, সে গান্না বেগম।

কিন্তু এই একটুখানি চোখের জলের আকাংখা তাকে অমর করে রেখেছে।

পাণিপথের অনেক রক্ত আজ মাটির নিচে। বাবরের যুদ্ধ জয়ের তৃপ্তির হাসি কারো মনে পড়বে কিনা সন্দেহ; হিমুর কবন্ধ কদাচিৎ কেউ স্বপ্ন দেখে কিনা জানিনা, মারাঠার রক্তের তর্পন পাণিপথের মৃত্তিকা শুষে নিয়েছে। কিন্তু একফোঁটা অশ্রু বড় তীব্র, বড় ভারি মৃত্তিকা তাকে হরণ করতে পারেনি; সময় তাকে গ্রাস করতে পারেনি; অন্ধকার রাতে প্রেমিক নক্ষত্রের অম্লান দ্যুতির মত আজো তা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

সেই এক ফোঁটা অশ্রু গান্না বেগমের।

হয়তো গান্না বেগম তার উত্তরাধিকারের মধ্যেই কান্নার আবেগ নিয়ে এসেছিল। তার দীর্ঘ দুঃখের ইতিহাস সেই উত্তরাধিকারের স্ফুরণের ইতিহাস। তার সেই বেদনাময় জীবন যেন সেই উত্তরাধিকার বীজের মহিরুহের পথে ধীর স্ফুরণ।

সেই উত্তরাধিকারের কাহিনী জানতে হলে কিছুটা আমাদের সরে যেতে হবে আরো অতীতে। কন্যার কাহিনী ছেড়ে পিতার কাছে। কারণ সেই পিতাই বেদনার বীজ বপন করেছিলেন।

আলি কুলি খাঁ।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহানের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম নিয়েছিলেন।

ইস্পাহানের উদার নীল আকাশ, তার দ্রাক্ষা কুঞ্জ একটি মুগ্ধ শিশু চোখে কল্পনার রং ছড়িয়েছিল। সেই কল্পনা আত্ম প্রকাশ করেছিল কাব্যের রূপে। এক মুগ্ধ শিশু প্রকৃতির হৃদয় থেকে প্রথমেই যে রোমাঞ্চ লাভ করেছিল তা একদিন চঞ্চল হরিণ শিশুর মত কাব্যের ছন্দে তার সমস্ত চেতনাকে মঞ্জরিত না করে পারেনি। কচি চোখের মুগ্ধ বিস্ময় আলি কুলিকে কবি করেছিল।

প্রথম কৈশোরের ভাল লাগার এক অজানা পুলক, নারী সান্নিধ্যের গভীর সংস্পর্শে আরো আন্দোলিত হয়েছিল।

কবি গুন্ গুন্ করে তার কবিতার গান গেয়ে উঠেছিল।

ফুল যেমন ভ্রমরকে টানে, তেমনি তার স্বপ্নময় হৃদয়কে টেনেছিল একটি কিশোরী।

কিশোরী খাদিজা সুলতান।

ঊর্দ্ধমুখী কোমল অথচ পুষ্ট শিশু লতার মতন বাড়ন্ত দেহ ছিল তার।

মৃত্তিকার স্তনপুষ্ট শিশুলতার সহাস্যদ্যুতি ছিল তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপী। সেই দ্যুতি আলো বিকিরণ করেছিল একটি সহজাত কবি প্রবৃত্তির উপর। সেই দ্যুতির ছটা এতটা আন্দোলিত করেছিল আলিকুলিকে

যে তার সমস্ত চেতনার মধ্য দিয়ে খেলে গিয়েছিল এক তড়িৎ প্রবাহ। গর্ভবতী পুষ্পশাখা একদিন যে আবেগে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, সেই আবেগে একটি কিশোর কণ্ঠ একদিন অবশ্যম্ভাবি রূপে ছন্দায়িত হয়েছিল। কবিতা লিখেছিলেন আলিকুলি।

খাদিজা সুলতান, প্রতিবেশী কন্যা। কিন্তু পাশাপাশি রোপিত দুটি অশত্থ ও বটের চারার মত তারা বেড়ে উঠেছিল। জীবনের প্রথম থেকেই একে অপরকে স্পর্শ করেছিল আশ্রয়ের আশায়। সেই স্বতস্ফূর্ত হৃদয়ের আকাংখা, একের জন্য অপরের আকুতি, যে রূপ লাভ করেছিল, তা প্রেম। কৈশোরের সবুজ আবেগে স্নিগ্ধ শিশিরের মত আলিকুলি ভালবেসেছিল খাদিজা সুলতানকে।

শৈশবে একই মাদ্রাসায় পড়ত ওরা দু'জন।

একই দ্রাক্ষাকুঞ্জের পাশ দিয়ে ওরা যেত মাদ্রাসার পথে।

বুলবুল মিথুনের সোহাগ, কচি দ্রাক্ষা পাতার হাওয়ার মুখে আন্দোলন, মুগ্ধ করত দুটি অচেনা আবেগে হতচকিত কিশোর হৃদয়কে।

সেই আবেগের মুখেই একদিন আলিকুলি ডেকেছিল তার আকাংখিত কন্যাকে,—খাদিজা!

সে আহ্বানে পূর্ণ যৌবন দ্রাক্ষা ফলের রস ছিল যেন। কম্পিত কণ্ঠে সে পরিবেশন হাওয়ায় আন্দোলিত দ্রাক্ষা লতার মুখে আঙুরের মতই মনে হয়েছিল। কোন উত্তর না দিয়ে ভাললাগা মুগ্ধ বিস্ময়ে খাদিজা তাকিয়েছিল তার দিকে। যে দৃষ্টির অর্থ, কি বলবে?

সে চোখের দিকে তাকিয়ে থর থর করে কেঁপেছিল শুধু আলিকুলি। সেই প্রথম কি জানি কেন, খাদিজাও একটু রক্তাভ হয়েছিল। বলেছিল আলিকুলি, 'আমি তোমাকে পেয়ার করি।'

যে কথা শুনে হাওয়ার বেগে একটি দুর্ব্বল লতার মত থর থর করে কেঁপেছিল খাদিজা সুলতান।

এই প্রথম, আর এই আরম্ভ।

সাগর পথে নদী যেন অবরুদ্ধ গহ্বর ভেঙে পথের সন্ধান পেল।

অসংখ্য কলনাদে হৃদয়ের আবেগ ফুটে উঠল আলিকুলির। সে হল কবিতা। কবিতা তার আবেগের ঢেউ, লক্ষ্য তার খাদিজা।

নদী সাগরে মিশতে চায়।

সেই মুগ্ধ কিশোরকে নিঙ্ড়ে কত অমৃত সুধা নির্গত হয়েছিল কি করে বোঝাব।

তবে সে অমৃত স্রবনের কিছু অংশ আজো ধরে রেখেছে মস্নব-ই-ওয়ালা সুলতান। অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ। প্রিয়তমার নামেই কাব্য লিখ্ত আলিকুলি।

কিন্তু সে বড় লজ্জা। সে বড় কলঙ্ক।

প্রেম মৃগনাভির মত আপনার মধ্যে গোপন থাকুক, নিজেকে মুগ্ধ করুক; অপরে যেন না দেখে।

খাদিজা বড় লজ্জা পেয়েছিল। বলেছিল, আলি তুমি আমার নাম নিয়ে কবিতা লিখো না। আমার বড় লজ্জা করে।

মুগ্ধ কিশোর প্রেমিক ছন্দোবদ্ধ উত্তর দিয়েছিল:

"তুমি বলছ কাব্যে তব রেখো নাক আমার নাম,
কাব্যে কিসের মূল্য যদি তোমার নামই নাই দিলাম!"

আমার কবিতা, সে তো তোমার জন্য। মেঘের জন্য তড়িৎ, বাগিচার জন্য ফুল, ফুলের জন্য গন্ধ, কবিতার জন্য তো তুমি। তোমাকে বাদ দিয়ে কি কবিতা হয়!

সলজ্জ আকাশ প্রিয়তম সূর্য্যের দিকে গোপন চারিণীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে যেমন অনুরাগে রঞ্জিত হয়, তেমনি রঞ্জিত হয়ে ছিল খাদিজা সুলতান। মনে মনে বলেছিল, থাক থাক থাক, তোমার সঙ্গে অমর হয়ে থাক আমার নাম।

সে নাম আজো আলিকুলি খাঁর সঙ্গে অমর হয়ে আছে। "শুধু নাম শুধু নাম"।

দেহের মিলন তাদের কোন দিন হয় নি।

সেই দৈহিক মিলনের অভাবজাত যে বেদনা বোধ, সে বেদনাই এক দিন বপন করেছিল চির বিষণ্ণ এক বেদনার বীজ। সেই বীজ জাত বৃক্ষ গান্না বেগম।

আলিকুলি খাঁ যে প্রেমের স্বপ্ন দিয়েছিলেন দৈহিক মিলনে তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। দুটি মিলনাকাঙ্ক্ষী নরনারী যে মুহূর্তে কৈশোর থেকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এঁসে বাস্তব জীবনের দাম্পত্য পটভূমিকা রচনা করেছিল সেই মুহূর্তে ঘটেছিল বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্য এসিয়া বা ভারত কোনস্থান নিরঙ্কুশ শান্তির জীবন যাপনের সহায়ক ছিল না। প্রেমের নিভৃত জীবনের স্বপ্ন-সাধ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। মধ্য এসিয়া ও ভারতে সেই সময় রক্তের বুদ্বুদে চলছিল রাজনিতিক উত্থান পতনের খেলা। আজ যে রাজা কাল সে ফকির। এই দ্রুত-রাজনৈতিক জুয়া খেলার মধ্যে প্রজাবর্গের জীবনেও শান্তি ছিল না। রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় বিক্ষুব্ধ, এলোমেলো আর বিধ্বস্ত হয়েছিল তাদের জীবন। সেই দুর্যোগ কপোত কপোতির নিভৃততম নীড়কে রেহাই দেয় নি। আলি কুলি তাদের মধ্যে অন্যতম।

আলিকুলি আর খাদিজা সুলতান উভয়েই যৌবনের দ্বার দেশে এলে—হৃদয় যারা বিনিময় করেছিল তারা এবার প্রতিজ্ঞা বিনিময় করল।

বাগ্‌দান করল আলিকুলি খাদিজাকে আর খাদিজা-আলিকুলিকে। এ একটি সোনার স্বপন, ওই দুইটি মুগ্ধ হৃদয়কে নয়, দুটি পরিবারকেও নিকটে টেনে এনেছিল। দুটি হৃদয়ের মিলনের মধ্যে পারিবারিক কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না।

প্রেম পরিণতির পথে প্রিয়া প্রিয়তমের দ্বার দেশে এসে দাড়িয়ে ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তে⋯যেন ভিত্তিভূমি টলিয়ে দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত্ হল আগ্নেয়গিরির, ঠিক যেমন করে একদিন বিসুভিয়াস পম্পাই নগরীকে লাভাস্রোতে নিমজ্জিত করেছিল, তেমনি এক বিচ্ছেদের

লাভাস্রোত নেমে এল স্বপ্নে রচা প্রেমের সুখনীড়ের উপর। কিম্বা যেন বিহঙ্গ মিথুনের সান্নিধ্য উপভোগের চরম মুহূর্তে দুর্দ্ধর্ষ বাজ এসে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল বিহঙ্গিনীকে। দুর্দ্ধর্ষ আফগানরা আক্রমণ করল পারস্য। শুধু আক্রমণ নয়, পারস্যের পবিত্রতাকে ধর্ষিত করে বসল তারা। তারপর তার উপর শ্মশানের প্রেতনৃত্য নাচতে আসলেন নাদির শাহ। পশুমেষ পালন করেছেন নাদির মাঠে মাঠে। ভাগ্য তাকে সিংহাসন দিল। মানুষকে তিনি মানবিক মর্য্যাদা দিতে পারলেন না। হৃদয়ের খোঁজ নিলেন না তিনি।

আফগান দস্যুরা সোনার মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল খাদিজা সুলতানকে। আফগানদের হাত থেকে অপূর্ব্ব সুন্দরী সে কন্যা পেলেন নাদির। বৃন্তচ্যুত করলে যে ফুল ম্রিয়মাণ হবে তিনি তা বুঝলেন না। রেণুচ্যুত করলে যে, পুষ্প মর্য্যাদা হারায়, বুঝতে পারলেন না তিনি। আলিকুলির বাগ্‌দত্তা কন্যা স্থান পেল নাদিরের হারেমে। মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে ক্ষুধার্তের দেহে যত বাজে, মনে তত বাজে না। গৃহের অর্থ লুণ্ঠিত হলে উপার্জিত অর্থের ব্যর্থতায় শ্রমের অনুপাতে দুঃখ করি। কিন্তু প্রেমাস্পদকে লুণ্ঠিত করে নেওয়া যেন হৃদয় খানাই উপ্‌ড়ে নেওয়া। এ এক অনন্তস্থায়ী দগ্ধ ক্ষতের মতন। এ যন্ত্রণা কখনো যাবার নয়। আফগান দস্যুদের হাত থেকে সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা লাভ করলেন আলিকুলি! সে ব্যথা যেমন জীবনের ভিত্‌ নেড়ে দিল, তেমনি তার গৃহ জীবনের মূলকেও উপড়ে দিল।

সেই ব্যর্থ যৌবনের যন্ত্রণা যেন ইস্‌পাহানের আকাশে বাতাসে, সর্বত্র দেখতে পেলেন আলিকুলি খাঁ। স্মৃতি, স্মৃতি, সর্বত্র স্মৃতির অপার বিস্তার! ইস্‌পাহানের দ্রাক্ষা কুঞ্জে, নীল আকাশে, বুলবুলের কণ্ঠে, সর্বত্র স্মৃতির বেদনা। এই সমস্ত পরিচিত পরিবেশ যেন অতীতকে জীবন্ত ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্বলন্ত শলাকার মত আলিকুলির হৃদপিণ্ডে ঘা দিতে লাগল। এক দিন তার স্বপ্ন দিয়ে রচনা, এক দিন তার কল্পনা দিয়ে রঙিন ইস্‌পাহান তাই কবির কাছে অসহ্য বোধ হল।

যাকে বাহুর আশ্রয় থেকে দস্যুরা কেড়ে নিয়েছে, হৃদয়ে তাকে রাখা যেন বিরাট ভার। সেই ভার মুক্ত হতে চাইলেন আলিকুলি। অপরিচয়ের অকূলে হারিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। মনে করলেন, দেশত্যাগ করবেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? গ্রহণ করবে তাকে কে?

হিন্দুস্থানের কথা মনে পড়ল তার। হিন্দুস্থান যুগে যুগে কালে কালে বহু মানুষের ধারণাকে বহন করেছে। 'শক হুন দল, পাঠান, মোগল, এক দেহে সেখানে লীন হয়েছে। সে হিন্দুস্থান কি আলিকুলিকে গ্রহণ করবেনা?

১৭৩৪ শতাব্দ। এক হতভাগ্য প্রিয়াবঞ্চিত যুবক ভারতবর্ষের দিকে রওনা হলেন।

॥ দুই ॥

মুহাম্মদ শা তখন দিল্লীর বাদশা।

মোগলের সে গৌরব নেই, সেই পৌরুষ নেই। কিন্তু নাম আছে। বাহ্যিক আড়ম্বর আছে। লোক দেখান দরবারী বিলাস আছে। গুণীজনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে নাম কিনবার অহংকার রয়েছে। আলিকুলি খাঁ কবি, গুণীজন মুহাম্মদ শা তাকে গ্রহণ করলেন। যোদ্ধার চেয়ে কবিকেই তখন তার বেশী প্রয়োজন। মোগল শৌর্য্য তখন রমণীর অঙ্কশায়িনী। নর্ত্তকী আর নৃত্য, বাঈজী আর সঙ্গীত এখন সম্রাটের অপরিহার্য্য বিলাস। নৃত্যের তালে তালে সঙ্গীত রচনা করবে কবি। ফুলের বুকে গন্ধ সংযোগ করবার মত উদ্দাম যৌবনকে তা মাধুর্য্যে মণ্ডিত করবে। সুতরাং ওমরাহদের মধ্যে একজন বলে, তাকে গ্রহণ করলেন বাদশাহ। স্থান হল দ্বিতীয় মির তুজুক। পদবী জঙ্গ।

অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাটের ভাল লেগে গেল তাকে।

অপূর্ব্ব গজল লেখেন কবি। বিষন্ন বেদনার ভারে সে গজল মধুর। সম্রাট তার বাঈজীর কণ্ঠে সে গজলে বেদনার আবেদন ফোটান।

নর্ত্তকী মহলে তাই বাদশার পাশে স্থান হল আলিকুলির।

আলিকুলির জীবনে সে এক নতুন ঘটনা। যে জীবন পিছনে রেখে এসেছেন তিনি সে জীবন যেন আবার হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে।

সম্রাটের প্রিয় নর্ত্তকীদের মধ্যে ছিল বুলবুল। আসল নাম কি কারো মনে নেই। কে যে কখন তাকে বুলবুল নামের ছদ্মবেশের আড়ালে আসল পরিচয় ঢেকে দিয়েছিল তাও জানা নেই। এই বুলবুল তার গানকে সুর দিল। হৃদয়ের বেদনাকে জীবনের অনুভূতি দিল। এই বুলবুলের মধ্যে তার বেদনাকে জীবন পেতে দেখে কেমন

যেন আপন মনে হল তাকে। যেন বুলবুল তার হৃদয়কে বুঝেছে। যেন বুলবুল তার হৃদয়েরই প্রতিধ্বনি। বুলবুল নিজে নর্ত্তকী হলেও বিদুষা ছিল। ভাগ্য তাকে নৃত্যব্যবসায় নামালেও সে ছিল অন্য জগতের রমণী। সে ছিল কবি, সে ছিল শিল্পী। নিজে গান লিখতে পারত সেও।

আলিকুলির গানের সে ছিল সমজদার গায়িকা আর শ্রোতা দুইই। যে বেদনা এ গানের উৎস হিসেবে কাজ করে, তা যেন সে বুঝতে চাইত। তা যেন সে বুঝতেও পারত।

তা যেন সে বুঝে ছিল। হ্যাঁ বুঝেছিল। বুঝেছিল বলেই আলিকুলিকে সে এক দিন চমকে দিয়ে ছিল। এক দিন নিজের লেখাতে উত্তর দিয়ে ছিল আলিকুলিকে।

'ও আকাশ ব্যথা-নীল, তবু দেখ মালা পরে
রজনীতে কত তারকার,
ও সাগর ঢেউ তুলে কাঁদে দেখ, তবু ঢেউয়ে
কত তার আলোর বাহার।
কেঁদনা প্রিয়তম, বেদনাই জীবনের শেষ নয়।'

এ আশার, এ সমবেদনার কথা। মুহ্যমান হৃদয়কে যেন এ আত্মীয়ের সান্ত্বনা। সে দিন নর্ত্তকী মহল থেকে যেতে দেরী করেছিলেন আলিকুলি। বাদশা চলে গেলেন তবু কী এক স্থির প্রশান্তিতে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকলেন কবি। লক্ষ্য করেছিল বুলবুল। তার হাতের বলয়ের শিঞ্জিনী তুলে'ছিল সে। হীরে বসান চুড়ি গুলো থেকে আলোর চমক ঠিকরে বেরিয়েছিল। বুলবুল কাছে এসেছিল কবির। একটা বিমর্ষ অথচ শান্ত দৃষ্টি নিয়ে আলিকুলি তাকিয়েছিল তার দিকে। একটুখানি মমতা মাখান হাসি হেসে বুলবুল বলেছিল :

—একি কবি আপনি এখনো বসে ?

দৃষ্টির মধ্যে গাঢ়তা টেনে আলিকুলি তাকিয়েছিলেন তার দিকে। বলেছিলেন,—তোমার জন্য।

—আমার জন্য! যেন একটু আশ্চর্য্যই হয়েছিল বুলবুল, কিন্তু তখনি নিজের অন্তরের মধ্যে কি বুঝে নিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে, একটু হেসেছিল। বলেছিল, আমার জন্য কেন কবি?

—এ গান তোমাকে কে লেখে দিল?

আলিকুলি বুলবুলের কবি প্রতিভার কথা কিছু জানতনা হয়তো।

বুলবুল বলল, কে লিখে দেবে জনাব? কবিতাতো লেখবার জিনিষ নয়, ওযে হৃদয়ের জিনিষ—এমনি না এলে হয়?

একটু যেন চমকে উঠেছিল আলিকুলি, সে কি! বুলবুল নিজে গান রচনা করেছে! আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিল, তুমি!

মাথা এবার একটু নত করেছিল বুলবুল। বলেছিল, মেহেরবান, নৃত্য আমার ব্যবসা। আমার হৃদয় নয়। আমার দুর্ভাগ্য।

ব্যস্, আর বলতে হলনা, কবি হৃদয়, কবি হৃদয়ের আকুতিকে তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল। আলিকুলি হাত ধরল বুলবুলের। যেন ইপ্সিত স্পর্শ, চমকে কেঁপে উঠতে গিয়ে ভাল লাগল বুলবুলের। সে বলল, মেহেরবান, এ গান আমি লিখেছি, আপনার জন্য। আপনার মধ্যে আমি বঞ্চিত হৃদয়ের ব্যথা দেখে দুঃখ পেয়েছি। আপনি শুধুই বিমর্ষ। কিন্তু আল্লা তো শুধু বিষাদের জন্য এ পৃথিবী সৃষ্টি করেন নি, তবে আপনিই শুধু কাঁদবেন কেন?

অনেকক্ষণ, অনেক, অনেকক্ষণ আলিকুলি তাকিয়ে থাকল বুলবুলের মুখের দিকে, তারপর বলল, হয়তো তাই।

এর পরেই আলিকুলিকে যারা দেখেছে, তারা বুঝেছে, আলিকুলির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সেই অতল গম্ভীর বেদনাময় হৃদয়ের উপর আলিকুলি যেন ঢেউয়ের স্পন্দন ফোটাবার চেষ্টা করেছে। তার গানের সুর পাল্টে গিয়েছে। এমন কি মুহাম্মদ শা বুলবুলের কণ্ঠে আলিকুলির নতুন গান শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। বুলবুল গেয়েছিল:

"কিছু যদি নাও থাকে তবু তোর কিছু আছে, আছে।

আকাশে আলোর রেশ, বাতাসে জীবন, পৃথিবী শ্যামল ঘাসে
ঘাসে দুনিয়া মালিক কিছু শূন্য করেনি দেখ, না থেকেও নীল
আশমান-অসীম তৃষ্ণা বুকে, তবুও চাতকী দেখ কাঁদেনাক গায়
শুধু গান।

"এ জাহান..............."

তারিফ করেছিলেন মুহাম্মদ শাহও, "সুর পাল্টেছ দেখছি আলিকুলি! এই ভাল। পৃথিবী শুধু বেদনার? আনন্দ কর, আনন্দ কর। আজ বড় ভাল লাগল তোমার গান।"

জীবনটাকে ভাল লাগতে আরম্ভ করেছিল আবার যেন আলিকুলির। জীবন যেন দুর্বার এক নদীর মত, পাহাড়ের গায় ধাক্কা খেয়েই ফিরে আসে না। সাগরে সে পৌঁছায়ই! পাহাড়কে আশ্রয় মনে করে ধাক্কা খায় সে, কিন্তু আবার চলে। আশ্রয় যতক্ষণ না মেলে ততক্ষণ চলে। আলিকুলি ধাক্কা খেয়েছেন; তাই বলে জীবনে চলার গতি তার বন্ধ হলে চলবে কেন? চলছেন তিনি। কিন্তু আবার যেন আশ্রয়ের ইশারা পাচ্ছেন। বুলবুলের মধ্যে কি সেই আশ্রয় আছে?

সেই দিনই জিজ্ঞেস করেছিলেন আলিকুলি বুলবুলকে, সত্যি কি তুমি মনে কর জীবন শুধু বেদনার জন্য নয়?

বুলবুল বলেছিল, শুধু এক নিয়ে তো জীবন হতে পারে না, দুই চাই। না হলে সংঘাত কোথায়? রৌদ্র আছে, তাই তো ছায়া, মৃত্যু আছে তাই তো জীবন, দুঃখ আছে তাই তো সুখ; শুধু একক দুঃখ কি থাকতে পারে?

দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন আলিকুলি বুলবুলকে। বলেছিলেন, তবে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও বুলবুল।

এভাবে আবেদন শুধু সরল হৃদয়ই করতে পারে। শিল্পীর পক্ষেই এ আবেদনে ভেসে যাওয়া সম্ভব। বুলবুল যে তাকে ভালবাসে, বুলবুল যে তাকে আশ্রয় দিতে পারে একথা কি করে বুঝল আলিকুলি?

এ শিল্পীর আবেদন যদি অশিল্পীর কাছে গিয়ে পৌঁছুত তবে হয় তো

অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু বুলবুল ছিল নিজেও শিল্পী। এ আবেদনের চরিত্র তারও অজ্ঞাত নয়। সে জানতো আলিকুলি একদিন এ ভাবে আবেদন করবেই; কারণ সে নিজেও আলিকুলিকে ভালবেসেছিল। কিন্তু ধরা দিলেও 'তবু' থাকে। সেই তবুর নিস্পত্তির জন্য বুলবুল বলেছিল,—আমিই যে আপনাকে শান্তি দিতে পারব, একথা কেমন করে বুঝলেন?

আলিকুলি তার কবি সুলভ আকুলতা দেখিয়ে বললেন, আমি জানি। আমার মন বলেছে। তোমার ব্যবহার, তোমার কথা আমাকে বলেছে।

—কিন্তু!

—এর মধ্যে কিন্তু নেই।

—তবু, ধরুন।

—বল?

বুলবুল বলল, আমি নর্তকী, আমি বাঈজী, আমাকে কি........

আর বলতে দিলেন না আলিকুলি। মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলেন। বললেন, সর্বোপরি তুমি শিল্পী, তোমার জীবন দর্শন আছে। তোমার আর কোন পরিচয়ে আমার দরকার নেই।

বুলবুল আর কিছু বলেনি। তার স্বভাব বিহঙ্গের। ঘর বাধার আকাংখা তার সহজাত প্রবৃত্তি। নর্তকী হলেও উপভোগ তার লক্ষ্য নয়, গৃহ তার কাম্য।

আলিকুলি কবি। আলিকুলি সহৃদয়, আলিকুলিকে প্রথম দিন দেখেই সেখানে একটা আশ্রয়ের আকাংখা করেছিল বুলবুল। সেই আকাংখাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিল সে। সেই স্বপ্ন আজ তার সার্থক হতে চলেছে। আর কোন প্রশ্ন তোলেনি বুলবুল।

আলিকুলি তার হাত দুটো ধরেছিল। জীবনের সমস্ত নির্ভরতা যেন তখনি ছেড়ে দিয়েছে বুলবুল আলিকুলিকে। আলিকুলি বলেছিল, এস, আমরা ঘর বাঁধি।

নদীর মত চঞ্চল যে নর্তকী, সমুদ্রের মত স্থির দেখা গেল তাকে।

একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে শুধু সম্মতি জানাল বুলবুল।

এক উদ্বাস্তু শিল্পী হিন্দুস্থানে আশ্রয়ের আশায় এসেছিলেন। হিন্দুস্থান তাকে বঞ্চনা করল না। বাদশা মুহাম্মদ শা নিজে বুলবুলের সঙ্গে আলিকুলির ঘর বেধে দিতে সাহায্য করলেন।

নতুন জীবন আরম্ভ হল কবিদম্পতির। উভয়েই তারা কবি ?

॥ তিন ॥

রাজনীতির সরব কোলাহলের মধ্যেই একটি নীরব নীড় রচনা করল ওরা।

দুটি মুগ্ধ বিহঙ্গ যেন মিলনের আনন্দে সৃষ্টিকে অভিনন্দন জানাতে চাইল। বুলবুল বলেছিল একদিন, জীবন শুধু মাত্র অফুরন্ত ব্যথার জন্য নয়। এখানে আনন্দ আছে। উপভোগ আছে, সেই আনন্দের স্বাদ সত্যিই যেন সে এনে দিয়েছিল আলিকুলির জীবনে। পুষ্পবৃক্ষ যেমন মাটির রসে পুষ্ট হয়ে ফুলে ফুলে হেসে উঠে, জীবনরস সিঞ্চিত হয়ে আলিকুলিও তেমনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিলেন। জীবনের গজল লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু শুধু কাব্যে নয়, কল্পনায় নয় অন্যত্রও জীবনের জোয়ার এসেছিল। যৌবনরস সৃজনের উৎসাহে প্রাণবন্ত এক জীবনের সৃষ্টি করেছিল।

একটি শিশু।

শিশু নয় যেন একটি কচি ধানের শিষ। হাওয়ায় কেঁপে, দুলে দুলে, হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছিল আলিকুলির, শুধু আলিকুলির নয়, বুলবুলেরও।

শিশুটি কন্যা।

তা হোক তবু সাত রাজার ধন এক মানিক।

বাবা মা আদর করে নাম দিলেন, গান্না।

এই শিশুকে নিয়েই আমাদের কাহিনী।

গান্না, তার মায়ের রূপ পেয়েছিল। কিন্তু তার চোখ দুটি ছিল পিতার চোখের ন্যায় গভীর প্রশান্তি ভরা। মা, তার চোখ দুটি দেখে আদর করে কন্যাকে অঙ্কে মিশিয়ে ফেলতে চাইতেন। বাবা তার মুখখানা দেখে কন্যাকে অজস্র সোহাগে ভরে দিতেন।

শুধু রূপের দিক থেকে নয়, গুণের দিক থেকেও পিতামাতার গুণ পেয়েছিল গাম্না—তার পিতার কবিত্ব শক্তি আর মাতার শিল্পবোধ।

অতি শৈশবেই যখন আম্মা, আব্বা, আধো আধো বোল ফুটে ছিল, তার মধ্যে তখনই তার ঐ গুণগুলি কিছু কিছু আন্দাজ করা গিয়েছিল। কারণ সেই শিশুই বাইরে আঙ্গিনার একখণ্ড সবুজ তৃণাস্তরনের দিকে তাকিয়ে থাকত। কি এক রহস্যময় ভাবনা নিয়ে বুলবুল পাখীর নৃত্য লক্ষ্য করত। প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সংযোগ ছিল যেন সেই শিশুর। কখনো তার নিস্তব্ধতায় কবিত্ব শক্তির আভাস মিলত; কখনো তার চাঞ্চল্যে নৃত্যের ভঙ্গিমা ফুটে উঠত। তা দেখে মা, বাবা, নিজেদের মতো কল্পনা করতেন।

আলিকুলি বলতেন, দেখো ও কবি হবে।

বুলবুল বলতো, দেখবে ও নাচতে শিখবে।

এই নিয়ে মা বাবার মধ্যেই হয়তো একটু ঝগড়া হয়ে যেত।

আলিকুলি বলতেন, নাচ ও শিখবে না, শিখতে চাইলেও শেখান হবে না। কি হবে নাচ শিখে?

বুলবুল বলতো, কবি হয়েই বা ওর কি হবে বল?

তোমার মত এক গম্ভীর বিষাদে পৃথিবীর দিকে তাকাতে শিখবে এই তো? ওর জীবনটা নষ্ট হবে।

আলিকুলি বলতেন, নাচ শিখলেই কি হবে বল? ও চঞ্চল হবে। ও আভিজাত্য হারাবে।

কথাটার গোপন ধার মর্মে আঘাত করত বুলবুলকে। প্রায় কেঁদে ফেলত সে, ও তুমি আমাকে নর্তকী বলে ঘৃণা করছ?

তখন তার সহধর্মিণীর অভিমান ভাঙাতে আসতেন আলিকুলি। মান ভাঙলে আবার সেই তর্ক। অবশেষে মিটমাট হোত ও গান শিখবে।

এমনি নানা জল্পনা কল্পনা হত নতুন শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে। কিন্তু উভয়েরই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল—শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সুখের করা

চাই। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়া চাই তাদের কন্যাকে। সেই আশায় যত দিন পর্যন্ত শিশু প্রথম পাঠ নেবার পর্য্যায় এসে না পৌঁছুল, মুখে মুখে তালিম দিয়ে চললেন তারা। তার প্রিয়তম কবিতাগুলি কন্যার শ্রবণে আবৃত্তি করতেন পিতা, ঘুম পাড়ানোর সময় গান গেয়ে শোনাতো বুলবুল্। আর শিশুর চেতন অথচ অবুঝ মনে সেই প্রথম প্রচার গভীর রেখা পাত করে যেত।

এই পরিবেশেই বড় হতে লাগল শিশু। অবশেষে তার বয়স যখন হল সাত বছর, আলিকুলি কন্যাকে মুসলিম সংস্কৃতির যোগ্য উত্তরাধিকারিণী করবার জন্য মৌলভি হাফিজ রহমানকে রেখে দিলেন কন্যাকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে।

এই সময় দিনে দিনে আলিকুলির মর্য্যাদাও বেড়ে চলেছিল। আমির ওম্‌রাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে আরম্ভ হয়েছিল। আলিকুলি প্রায় সবারই প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তার গভীর সৌহার্দ্দ হয়েছিল অযোধ্যার সুবাদার সফদর জঙ্গের সঙ্গে। সফদরের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল এক রাজনৈতিক দুর্য্যোগের সময়ে। আলিকুলি হিন্দুস্থানে আসবার পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। দরবারে প্রাধান্য নিয়ে ছিল দলাদলি। ইরানী, তুরাণীদের মধ্যে আর সিয়া সুন্নিদের মধ্যে। এই দলাদলির টানা পোড়েনের মধ্যে মোগল বাদশা স্বয়ং হচ্ছিলেন ক্ষত বিক্ষত। জাহান্দার শা, ফর্‌রুকসিয়র রক্ত দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। মুহাম্মদ শা সিংহাসনে বসলে বাহ্যিক অবস্থা কিছুটা শান্ত ছিল। দৃষ্টির অগোচরে ছিল প্রাধান্য নিয়ে দারুণ দলাদলি। আমির খাঁ আর কামরুদ্দিন উভয়ের মধ্যে দরবারে প্রাধান্য নিয়ে চলছিল দৃষ্টির অন্তরালে দারুন ষড়যন্ত্র। অবশ্য আলিকুলি কোন দলেই ছিলেন না। না হলেও ইরানের লোক বলে ইরাণীরা তাঁকে নিজেদের দলের বলেই ধরে নিয়ে ছিল। তা হলেও সে দরবারি ষড়যন্ত্র তার নিভৃত জীবনের শান্তিকে বিনষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু তবু তার স্বপ্ন দিয়ে রচনা নীড়

একদিন বিরাট ঝড়ের ইঙ্গিতে কেঁপে উঠেছিল। একটা প্রচণ্ড প্রলয়ের মত ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, নাদির ছুটে এসে ছিলেন হিন্দুস্থানের দিকে। যে নাদির ইস্‌পাহানে একদিন তার ঘর ভেঙেছিল, আবার ভারতবর্ষে তার নবনির্মিত গৃহ ভাঙবার জন্য ছুটে এল যেন। নাদির তার দুর্ভাগ্য।

কর্ণালের যুদ্ধক্ষেত্রে মুহাম্মদ শা বন্দী হলেন। নাদির ছুটে আসলেন দিল্লী লুণ্ঠন করতে। সে এক দুঃসময়। ভয়ে দিল্লীবাসী দিল্লী ছেড়ে ছুটে পালাল। কিন্তু পালিয়ে ত্রাণ নেই, মারাঠা আর জাঠ দস্যুরা প্রাণ ভয়ে ভীত আশ্রয় প্রার্থী দিল্লীবাসীকে নির্মম ভাবে লুণ্ঠন করতে থাকল। সেই বিপদের মধ্যেই আলিকুলি পালিয়ে আসেন অযোধ্যাতে। আশ্রয় নেন সফদর জঙ্গের কাছে। সেই থেকেই পরিচয়।

নাদির হিন্দুস্থানে থাকা কালীন বা তার পরও কিছুদিন আলিকুলি খাঁ ছিলেন অযোধ্যার দরবারে।

তাঁর ছোট্ট আত্মজা তখন শুভ্র একটি প্রভাতি ফুলের মত হয়ে ফুটে উঠছে। একদিন সুবেদারের উদ্যানে বেড়াতে এসেছিলেন আলিকুলি। সঙ্গে তার কন্যা গান্না। সফদর জঙ্গ গান্নাকে দেখে আদর করেছিলেন খুব। গান্নাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তার অপূর্ব্ব রূপে বোধ হয় মুগ্ধ হয়ে ছিলেন তিনি : এই তোমার মেয়ে ?

—আজ্ঞে জনাব।

সুবেদার গভীর ভাবে, কী যেন তাকিয়ে দেখেছিলেন গান্নার মধ্যে। গান্না কিন্তু তখন তাকিয়ে ছিল উদ্যানের অপর কোণে। সেখানে এক বালক, অপূর্ব সুন্দর বালক আপন মনে খেলা করছিল। তা দেখে হেসেছিলেন সুবেদার, যাবে তুমি ওখানে ?

আলিকুলি খাঁ সেই দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। সফদর জঙ্গ বলেছিলেন, আমার ছেলে, সুজাউদ্দৌলা।

ততক্ষণ গুটি গুটি গান্না কিন্তু এগিয়ে গিয়েছিল সুজার কাছে।

সেই সুন্দর অথচ দুষ্টু ছেলে তখন এক সোনালী রংয়ের প্রজাপতির পিছু ছুটছিল। হঠাৎ ফিরে পেছনে তাকাতেই গান্নাকে দেখে সে ভ্রূকুটি করে উঠেছিল—এই, তুই কে ?

—গান্না।

সুজা এই অপরিচিত মেয়েকে তাকিয়ে দেখেছিল। সেই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ তাকে আর অবজ্ঞা করতে পারেনি যেন সে মেয়েটির স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে কি যেন একটা ছিল। প্রশ্ন করেছিল গান্নাই এবার, তুমি কে ?

—আমি ! নিজের আঙ্গুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বলেছিল সুজা।

—আমি সুজা। সুজাউদ্দৌলা।

সফদর জঙ্গ একদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

সুজা গান্নাকে বলেছিল, ফুল দেখবি ?

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়েছিল গান্না।

এ বাগানেও ফুল ছিল, কিন্তু হাজারো ফুলের ভীড় ছিল ওদিকে।

সুজা গান্নাকে নিয়ে যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

সফদর জঙ্গ আলিকুলিকে বলেছিলেন,—জনাব, আমি যখন দিল্লীতে যাব, দেখা করবেন আমার সঙ্গে।

—নিশ্চয়ই।

কি মনে ছিল সফদর জঙ্গের কে জানে।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দ। ৮ই মে।

দিল্লী লুণ্ঠন করবার পর নাদির ফিরে গেলেন। তার আটদিন পর মুহাম্মদ শা প্রকাশ্য দরবার আহবান করলেন। গোপন গহবর থেকে ফিরে এসে আমিরেরা আবার ভিড় করলেন দরবারে। অনেকেই এলেন বাদশাহীর বাকী রসটুকু নিঃশেষে শোষণ করবার জন্য। এলেন ইরানীরা, এলেন তুরানীরা। দুরদুরান্ত পলাতক সকলেই এলেন। আলিকুলি খাঁও ফিরে এলেন দরবারে। বাদশাহ তেমনি প্রীতি

সহকারেই গ্রহণ করলেন তাকে। ইদানিং নাদিরের আক্রমণের পর আমিরদের সম্পর্কে বাদশার ধারণা তেমন ভাল ছিল না। বিপদের আলোতে প্রত্যেকের যথাযথ রূপ যেন তিনি দেখে নিয়েছেন। কিন্তু আলিকুলি সম্বন্ধে তার ধারণার যে পরিবর্তন তা উন্নতির দিকেই, অবনতির দিকে নয়। কারণ বাদশা আরো বেশী যত্নই করেছিলেন আলিকুলিকে। আলিকুলি দিল্লীতে ফিরে এসে আবার তার স্বপ্ন নীড় রচনা করতে লেগে গিয়েছিল। এবার শুধু বুলবুলকে নিয়ে একটি প্রণয়ের নীড় নয়। এবার কন্যা পরিবারকে নিয়ে গৃহের স্বপ্ন। শুধু প্রেম নয় স্নেহও থাকবে এ গৃহে। আবার গৃহ সাজালেন তিনি। বুলবুলের শিল্পবোধ আবার গৃহকে দিল নতুন রস। গান্নার উপস্থিতি তাকে করল মধুর।

এই গান্নাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আলিকুলি।

মৌলভি হাফিজ রহমানকে ছাড়েননি তিনি। সেই বিপদের দিনেও সঙ্গে করে রেখেছিলেন। আবার দিল্লীতে যখন ফিরে এলেন, মৌলভি তার সঙ্গেই এলেন।

এবার মৌলভির কাজ আরম্ভ হোল। তৎকালিন মুসলমান সংস্কৃতির আভিজাত্যে দীক্ষিত করতে হবে গান্নাকে। সে ভার তাঁর। গুণী ব্যক্তির শিক্ষাদানেই আনন্দ। মৌলভি তাই আত্মভোলা অবস্থায় শুধু তার ছাত্রীময় হয়ে রইলেন।

বছর শেষ হল, বর্ণ পরিচয় শেষ করালেন তিনি।

এল বছরান্তর। প্রকৃতি পরিচয় শেষ হল।

তারপর আরো, আরো, বছর, বিশ্বজগৎ আর জীবনের কথা শিখল কন্যা। তারপর প্রেমে এবং কাব্যে।

মস্‌নভি-ই—ওয়ালা সুলতান।

কন্যা পিতার লেখা কাব্য পাঠ করল। 'ওয়ালা' ছদ্মনামে আলি কুলি লিখেছিলেন এ কাব্য। সে বেদনাময় প্রেমের অপূর্ব্ব গীতিকথা অভিভূত করল কন্যাকে।

গান্না জিজ্ঞাসা করল মৌলভিকে, কে এই কবি ?

ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন মৌলভি। বললেন, তোমার আব্বাজান। ফারসী কাব্যে তিনি একজন দিক্‌পাল। তিনি চান তুমিও তার মত হও আম্মা।

নিজের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল গান্না।

তার সমস্ত সত্বার মধ্যে বেদনার বীজ যেন কী এক চেতনা মেলে ধরতে চায়।

এর মধ্যে পাঁচটি বছর কেটে গিয়েছে। পাঁচ বছরের শিশু তখন দশ বছরের কিশোরী। যৌবনের শিহরণ না এলেও কৈশরের শিহরণ তার মধ্যে প্রবল। সেই শিহরণকে কি এক রহস্যময় ইঙ্গিতে মৌলভি হাফিজ রহমান আরো আশ্চর্য্য করে দিয়েছেন। ঠিক এই মুহূর্তে যেন তার নিজস্ব জীবন আরম্ভ হতে লাগল। দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থাও এই সময় স্থির হয়ে ছিল না। প্রত্যহ বাদশার দরবারে ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তন হচ্ছিল। নাদির শার নিষ্ঠুর আঘাতও চেতনা সঞ্চার করতে পারেনি আমিরদের মধ্যে। নাদির দিল্লী ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমিরেরা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। মুখ্যত এই চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল ইরাণী নেতা আমির খাঁ আর তুরাণী নেতা কামরুদ্দিনকে কেন্দ্র করে। অনেক দিন ধরেই ইরাণীরা বাদশার দরবারে তুরাণী প্রভাব হটিয়ে দিয়ে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করছিল। সুযোগ হয়ে উঠেনি। নাদির শাহের আক্রমণ সেই সুযোগ এনে দিয়েছিল তাদের। নাদিরের আক্রমণের সময় ইরাণী দল বিপদের মুখেও মুহাম্মদ শাহকে ছেড়ে যান নি। কিন্তু তুরাণীরা সে সাহস আর বিশ্বস্ততা দেখাতে পারেনি। তাই নাদির ভারত ত্যাগ করবার পর ইরাণীরা আমির খাঁর নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবও হত। মুহাম্মদ শাও ইরাণীদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আমির খাঁকে উজির করবার কথা

ভাবছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে কামরুদ্দিন, তাই নিজাম উল্‌মুল্‌কে দিয়ে অপ্রত্যক্ষ চাপ দিলেন সম্রাটের উপর। দিল্লীর নিকট জয়সিংহপুরে সসৈন্যে ছাউনি ফেললেন নিজাম। দিল্লী যেন এক গৃহ যুদ্ধের সম্মুখীন হল। কিন্তু সম্রাট তখন অসহায়। নতি স্বীকার করলেন তিনি কামরুদ্দিনের কাছে। কামরুদ্দিনই আমির থাকলেন। আর ভাগ্য বিপাকে পড়ে দিল্লী ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যেতে হল আমির খাঁকে। দিল্লী ত্যাগ করে এলাহাবাদে নিজের সুবেদারীতে ফিরে গেলেন তিনি।

কিন্তু আমির খাঁ সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন। সামরিক শক্তি দিয়ে কামরুদ্দিন তার অপমান করেছিল, সামরিক শক্তির সাহায্যেই সে অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেন ঠিক করলেন।

অযোধ্যার সফদর জঙ্গের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। সফদর জঙ্গ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি সৈনিক। নিজাম উল্‌মুল্‌কের মত তিনিও শক্তিশালী। আমির খাঁ সফদর জঙ্গকে আশ্রয় করে দিল্লীতে ফিরতে চাইলেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে পাটনা আক্রমণ করে সফদর জঙ্গের সামরিক কৃতিত্ব বেড়ে যায়। সে বৎসরই মারাঠাদের ভয়ে দিল্লীতে আমির ওম্‌রাহদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আহ্বান করেন। আমির খাঁর পরামর্শে সফদর জঙ্গকেও ডাকা হয়। ১৭৪৩ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমির খাঁ আর সফদর জঙ্গ এলেন দিল্লীতে। সঙ্গে তাদের দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী। তিনি এসে দারা সুকোহর প্রাসাদে আস্তানা গাড়লেন। কিন্তু সেই রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনেও সফদর জঙ্গ বিপদের দিনে আশ্রয়প্রাপ্ত সেই আলি কুলি খাঁর কথা ভুলতে পারেন নি। দিল্লী এসে তিনি প্রথম দেখা করতে এলেন আলিকুলির সঙ্গেই।

আলিকুলি আর বুলবুলের স্বপ্ন, তাদের স্বপ্ননীড় রচনা করেছে দিল্লীতে। উন্মত্ত কোলাহলের প্রান্ত দেশে নিভৃতে তাদের গৃহ।

সে গৃহের প্রাঙ্গণ শ্যামল তৃণে ছাওয়া। যুগ্ম ময়ূর ময়ূরী সেখানে নৃত্যরত, আর অসীম কৌতূহলের চোখমেলা নানা বর্ণের পুষ্পের সমাহার।

সফদর জঙ্গের সংবাদ পেয়ে আলি কুলি তার পাঠাগার থেকে ছুটে এলেন।

এক দৃষ্টিতে তখন অযোধ্যার সুবেদার আলিকুলির অনাড়ম্বর অথচ সুন্দর গৃহটি লক্ষ্য করছিলেন। তার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য দিয়ে সফদর জঙ্গ যা পারেন নি, আলি তা সম্ভব করল কি করে? এত সৌন্দর্য্যের আমদানী এরা করল কি করে? সফদর জঙ্গ হয়তো তখনো বোঝেনি যে সৌন্দর্যের মূলে অর্থ নয় শিল্পবোধই প্রধান। এ সৌন্দর্য্যের মূলে গৃহকর্তার চেয়ে গৃহকর্ত্রীর হাত রয়েছে অনেকখানি বেশী। সফদর বললেন, আপনার থাকবার জায়গা কিন্তু সুন্দর! একটুখানি কৃতার্থ হাসি হাসলেন শুধু আলিকুলি। সফদর জঙ্গ বললেন, এবার অযোধ্যায় ফিরে যাবার সময় আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার দরবার সাজাবার ভার দেব আপনাকে।

আলিকুলি এবার কথা বললেন, এ সমস্ত কিন্তু আমার সৃষ্টি নয়। আর কিছু বলতে হল না, রসিক সফদর জঙ্গ তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন— কার কোমল হস্তের স্পর্শ এই অসাধ্য সাধন করেছে। বললেন, যে শিল্পী এ সৌন্দর্য্য শুধু কল্পনা নয়, ধরে রাখতে পেরেছেন তার জন্য আমার অভিনন্দন রইল।

একটু অহংকার মিশ্রিত নরম হাসি হাসলেন আলিকুলি।

সফদর জঙ্গ এবার যে একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু আমার আম্মা কোথায়? গান্না কোথায়? তাকে দেখবার জন্যই যে এত তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম।

বিনীতভাবে আলিকুলি বললেন, গান্নার সৌভাগ্য।

তৎক্ষণাৎ তিনি একজন বান্দাকে ইশারা করলেন ভেতর মহল থেকে গান্নাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

সফদর জঙ্গ বললেন, সেই যে অযোধ্যায় তার কি ছবি দেখেছি, যেন আমার মনে গেঁথে রয়েছে। আম্মা যেন আমার দেবকন্যা। আমার হারেম, উদ্যান, কয়েক দিনেই কি এক স্মৃতিতে যেন ভরে দিয়ে এসেছে। ও চলে আসবার পর কত সময় ওর কথা মনে পড়েছে আমার।

আলিকুলি বলেছিলেন, গান্না সৌভাগ্য করেছিল তাই।

সফদর জঙ্গ বললেন, আম্মার সৌভাগ্য বলবেন না, বলুন আমার সৌভাগ্য। ওকে যে আমি দেখতে পেয়েছি এই আমার সৌভাগ্য। জানেন ওকে দেখে আমার মনে হয়েছিল ও যেন একখণ্ড শিল্প।

আবার একটু হেসেছিলেন আলিকুলি। সেই মুহূর্তে উদ্যানের প্রান্তে নূপুরের ধ্বনি উঠেছিল। ফিরে তাকিয়েছিলেন সফদর জঙ্গ। ঠিক একটা ছবির মত কি দেখেছিলেন তিনি। মোমের উপর মিহি হলুদের পোচ লাগানো কি এক ধাতু দিয়ে গড়া একটি দেহ। তার উপর চিকন রক্ত রঙের পোচ। গাঢ় রংয়ের রক্ত গোলাপের মত দুটি অধর। গভীর রাতের চেয়েও গাঢ় অথচ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ কালো কেশ। সজীব সবল। যেন রেখায় টানা বাঙ্কম দুটি ভুরু। তার উঠন্ত দেহে বর্ষাশিক্ত পৃথিবীর শ্যাম সজীবতা।

সালোয়ার আর কামিজের উপর ওড়না যেন শিল্পের ভঙ্গিতে রঙিন হলুদ ধূম্রেখা। হাওয়ায় তার দেহ বসন একটু একটু করে কেঁপেছিল।

সফদর জঙ্গ সম্মোহিতের মত এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। কোন বাসনার বশীভূত হয়ে নয়, সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে অবর্ণনীয়ভাবে তিনি বাক্ হারিয়ে ফেললেন।

আলিকুলিই ডাকলেন তাকে, এস গান্না!

নূপুরে মৃদু মৃদু ধ্বনি তুলে গান্না এগিয়ে এল। সফদর জঙ্গের কাছে এসে মুসলমানী প্রথায় নত হল সে। বন্দেগী জনাব।

সত্যিই যে সে কাছে এসেছে এটা যেন যেন কিছুক্ষণ বিশ্বাসই

করতে পারলেন না সফদর জঙ্গ। তার পর প্রকৃতিস্থ হলে তিনি গান্নাকে হাত ধরে টানলেন, আল্লা মঙ্গল করুন। আমায় চিনতে পেরেছে আম্মা? প্রশ্ন করলেন সফদর জঙ্গ।

অযোধ্যা যাবার পর চার বছরের উপর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। শৈশবের সেই কচি স্মৃতিকে এতদূর টেনে আনা সম্ভব নয়। একটু যেন লজ্জাই পেল গান্না। অবশ্য তখনো তার লজ্জা, শিশুসুলভতা কাটিয়ে উঠবার মত নয়। কারণ তার বয়স তখন কেবল নয়। কিন্তু বয়স অনুপাতে, পুষ্টি তার বেশী। দেহের এবং মনের দুইয়েরই। এই বয়সে সে ফারসী কাব্য পাঠ করতে আরম্ভ করেছে। আম্মা নিজে তাকে গজল শিখিয়েছেন। নৃত্যও শিখেছে সে। হাফিজ রহমতের শিক্ষায় কি এক শালীনতা বোধ এখন থেকেই তাকে গাম্ভীর্য্য দিচ্ছে যেন। তাই তার এই লজ্জাবোধ।

সফদর জঙ্গ বললেন, সে অনেক দিনের কথা, মনে নেই আম্মা। তোমরা আমাদের ওখানে গিয়েছিলে। আলিকে জান?—

আবার গান্নার দেহে সলজ্জ অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠল।

আলিকুলি এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেন, অযোধ্যার সুবেদার। জনাব সফদর জঙ্গ। শুনিসনি দশহাজার সৈন্য নিয়ে তিনি দিল্লী এসেছেন?

যেন দুট বড় বড় চোখ মেলে গান্না তাকাল সফদর জঙ্গের দিকে। তার সেই বিস্ময় ভরা চোখ দেখে হাসলেন একটু অযোধ্যার সুবেদার। কিন্তু তাকে হঠাৎ অপ্রস্তুত করে দিয়ে গান্না প্রশ্ন করল, —দশহাজার সৈন্য নিয়ে আপনি দিল্লী এসেছেন কেন?

হাফিজ মুহাম্মদ তাকে কাব্য পড়িয়েছেন, আম্মা গান শিখিয়েছেন, আম্মা তার কবি। শান্তি, প্রেম এই সব তার আবহাওয়া। যোদ্ধাদের সম্বন্ধে তার ভয়, সুতরাং যে সফদর জঙ্গ তাকে স্নেহের আহ্বানে কাছে টানছেন সে সফদর জঙ্গ কি করে সেই লুটেরাদের সঙ্গে এসেছেন ভেবে পেল না যেন গান্না। তাই তার এই প্রশ্ন।

কি উত্তর দেবেন সফদর জঙ্গ ?

তার সসৈন্যে দিল্লী আসবার মুলে যে অহংকারবোধ রয়েছে তাকে রহস্য-ময় ভাবে হাসির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে সুবেদার বললেন যে, তুমি বুঝবেনা আম্মা। বড় হলে জানতে পারবে। আমাদের সৈন্য না হলে চলে না। সৈন্য বাহিনী সঙ্গে রাখার মর্য্যাদা কতখানি সেইটে বোঝাবার জন্যই যেন তিনি গান্নাকে প্রশ্ন করলেন,—শাহনামা পড়েছ আম্মা ?

গান্না বলল : শাহনামার গল্প শুনেছি আমি মৌলভী সাহেবের কাছে।

সফদর জঙ্গ প্রশ্ন করলেন, শাহনামার কাকে ভাল লাগে বলত ? মনে করলেন, গান্না বুঝি সোহরাব রুস্তমের কথা বলবে। তখন বীরত্বের মূল্য কি, তিনি বুঝিয়ে দেবেন গান্নাকে। কিন্তু গান্না তাকে যেন অপ্রস্তুত করে দিল। গান্না বলল,—শাহনামা আমার ভাল লাগে না।

—সেকি !

—হ্যাঁ।

—তবে কি ভাল লাগে তোমার ?

—গজল।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সফদর জঙ্গ। বললেন, ঠিকই, কবি কন্যার গজল ভাল লাগাই স্বাভাবিক।' তারপর বললেন, গাইতে জান তুমি ?

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল গান্না।

আলিকুলি বললেন, শুনবেন ? অপূর্ব্ব গাইতে পারে ও।

সফদর জঙ্গ বললেন, স্বাভাবিক। আম্মা শিল্পী, আব্বাজান কবি' ও গান গাইতে শিখবেনাত কে শিখবে ? কিন্তু ভাবছি ?

একটু আশ্চর্য হয়ে সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাকালেন আলিকুলি।

ভাবছি, আজকের এই রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধির দিনে এই ধ্যানময় শিল্পীর স্থান আছে ? মোগল সাম্রাজ্য দিনের পর দিন, গভীর

আত্মকলহের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ যে কি, কল্পনা করতেও ভয় পাই। ভাবি সেই দিনে জীবনের নিভৃতে এই শিল্পবোধ তার মর্য্যাদা পাবে কি? আলিকুলি একটা আত্ম সমর্থনের ভঙ্গিতে বললেন, সবই আল্লার ইচ্ছা।

সফদর জঙ্গ গান্নার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তা দেখে আলিকুলি আবার বললেন, গজল শুনবেন জনাব?

জঙ্গ বলেন, নিশ্চয়ই। দিল্লী যখন এসেছি, গান্নার মুখে গজল না শুনে ছাড়ব? তবে আজ নয়। দিল্লীতে তো থাকব অনেক দিন। আর একদিন এসে শুনব। আজ আমি এখনি উঠব।

আলিকুলি বললেন, সে কি! এখনি!

হাসলেন সফদর জঙ্গ। বললেন, তুমি কবি, আমি সৈনিক। তুমি শিল্পী আমি কুটনীতিজ্ঞ, আমাদের আর কতক্ষণ মিশ খাবে বল। কে আমাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে? বলছে চল চল চল। জানতো কোথায় যেতে হবে আমাকে?

আলিকুলি একটু মধুর করে হাসলেন। উঠে দাঁড়ালেন সফদর জঙ্গ। গান্নার চিবুকে হাত রেখে বললেন তিনি, উঠি আম্মা, আবার আসব। তিনি পঞ্চাশটি আসরফি রাখলেন আম্মার হাতে।

আলিকুলি বললেন, একি?

সুবেদার হাসলেন, আম্মাকে নজরানা দিচ্ছি। আসরফি কয়টি হাতে গুঁজে দিয়ে আলিকুলিকে বললেন, যেও আমাদের ওখানে। সুজাউদ্দৌলা এসেছে, ওর আম্মা এসেছেন।

আলিকুলি বললেন, নিশ্চয়ই যাব জনাব।

সফদর জঙ্গ বিদায় নিলেন।

॥ চার ॥

দিল্লী ব্যস্ত। ভয়ানক ব্যস্ত। ইরাণী তুরাণীদের রাজনীতির চাল চলছে। আমির খাঁ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; ক্ষমতায় তিনি আসবেনই। সফদর জঙ্গকে ভর করে তিনি উঠবার চেষ্টা করছেন। সফদর জঙ্গ আমিরখাঁর মাধ্যমে রাজনৈতিক জগতে পরিচিত হতে চাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠা তাঁরও আকাংখা। এই ব্যস্ততার দিনেও দিল্লী এসে তিনি আলিকুলি বা তার কন্যার কথা ভুলতে পারেননি। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি স্নেহ প্রবণ ছিলেন। শত্রুকেও কখনো কখনো ঔদার্য্য দেখিয়ে তিনি নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। এই সফদর জঙ্গ দোষে গুণে মানুষ। তার গুণের দিক, স্নেহ প্রবণতা আকৃষ্ট করেছিল আলিকুলিকে। তাই তিনি সফদর জঙ্গকে ভালবেসেছিলেন। দিল্লীতে রাজনৈতিক অস্তিত্বতা একটা থাকলেও তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। অন্তর-চিন্তাই ছিল তাঁর প্রথম অবলম্বন। তার খেলা তার কাব্যের সঙ্গে। একক থেকেও তাই তিনি সঙ্গীহীন ছিলেন না, অতীতের কোন বিচ্ছেদ বেদনা তাকে বিমর্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দান করলেও, ধীরে ধীরে তা অবচেতন মনের মধ্যেই স্থির হয়ে যাচ্ছিল যেন। বুলবুলকে নিয়ে তিনি স্বতন্ত্র একটি জীবনের গণ্ডি তৈরী করেছিলেন। গান্না তার মধ্যে মধুর এক নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছিল। তাই দিল্লীর ওমরাহদের দলভুক্ত হয়েও তাদের সঙ্গে মিশতেন না আলিকুলি। ওমরাহরাও তাকে নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিবাদ লোক বলে ধরে নিয়ে, তাকে রাজনৈতিক আবহাওয়ার বাইরেই রেখেছিলেন। এই স্থিরচিত্ত কবিকেও সফদর জঙ্গ আকর্ষণ করেছিলেন তার ব্যক্তিত্বের জোরে। সামাজিক জীবনের নিয়ম কানুনকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে না দেখলেও তিনি সফদর জঙ্গের নিমন্ত্রণকে অস্বীকার করতে পারলেন না। একদিন

সত্যি গান্নাকে নিয়ে তিনি দারা শিকোর প্রাসাদে অযোধ্যার স্থবেদারের সঙ্গে দেখা করতে চললেন।

সেটা সম্ভবতঃ বিশে জুন তারিখ হবে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন। প্রাসাদে পৌঁছেই দেখলেন স্থবেদার কোথায় যাবার জন্য একটু ব্যস্ত হয়েছেন। হঠাৎ সেই অবস্থাতে আলিকুলিকে দেখে তিনি বললেন, এই যে তুমি এসেছ ? এই যে আম্মা তুমিও ?

কিন্তু তাকে কেন একটু ব্যস্ত দেখিয়েছিল। এই মুহূর্তে প্রিয়জনের জন্যও সময় দেবার মত সময় তাঁর হাতে নেই। তিনি যেন একটু অস্বস্তিতে পড়লেন।

অস্বস্তির হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে আলিকুলিই এগিয়ে এলেন। আপনি কোথাও যাচ্ছেন ?

সফদর বললেন, হাঁ দরবারে বিশেষ প্রয়োজন।

আলিকুলি বললেন, বেশতো আমরা আবার আসব।

না, সে কি। তোমরা বোস। আমি না থাকলেই কি লোক নেই। স্থজা রয়েছে, তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তৎক্ষণাৎ তিনি বান্দাকে দিয়ে স্থজাকে ডাকিয়ে পাঠালেন। অযোধ্যা ছেড়ে কয় দিনের জন্য তরুণ স্থজাও দিল্লীতে এসেছিল। এ সময় তার বয়স বছর ষোলর বেশী হবে না। পিতার কথা শুনে স্থজা এল। অপূর্ব্ব স্থন্দর যুবক। তিন চার বছরে তার বাড়ন্ত দেহ যৌবনের দ্বার দেশে এসে পৌঁচেছে যেন। তার সমস্ত দেহে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য। পুরুষের অঙ্গে এত রূপ যেন বিশ্বাস করা যায় না এক দৃষ্টিতে। তাকিয়ে থাকলেন আলিকুলি। সফদর জঙ্গ বললেন। আমার ছেলে স্থজাউদ্দৌলা।

আশ্চর্য্য ভাবটা চোখে মুখে রেখেই আলিকুলি বলেছিলেন, হ্যাঁ তিন বছরে অনেকটা বড় হয়েছে।

ঐব্যস্ততার মধ্যেই দুটো কথা বললেন সফদর জঙ্গ। হ্যাঁ, অনেকটা বড় হয়েছে। কিন্তু আমার গুণ ও বেশী পাবে না বরং তোমাদের

খাঁচ। গজল ভালবাসে, কবিতা লেখে। আলাপ কর আনন্দ পাবে। আমি আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।

গজল ভালবাসে, কবিতা লিখতে পারে শুনে, নবকিশোরী গান্না- একটা স্বাভাবিক কৌতুহল নিয়ে তাকিয়েছিল সুজাউদ্দৌলার দিকে। সুজার সমস্ত মনে প্রাণে তখন শেষ কৈশোরের বেদনাময় আকাংখার এক চেতনা। যে অকাংখার অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে সেও তাকিয়েছিল গান্নার দিকে। অপূর্ব্ব! যেন চোখ ফেরান যায় না। একটা নিশা শেষে কুঁড়ি, এই চোখ মেলল বলে। তাকালেই লুব্ধ ভ্রমরের মতন তার বুকে বসা যাবে।

সেই দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন সফদর জঙ্গ। তারপর সোহাগ করে তিনি গান্নার চিবুক স্পর্শ করলেন। আসি আম্মা। আবার এসো।

আলিকুলিকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন তিনি। দরবারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মির অতিসের পদ নতুন করে আবার বিলি করবেন সম্রাট। সম্রাট মানে সম্রাটকে দিয়ে বিলি করাচ্ছেন আলি খাঁ। সে পদ সফদর জঙ্গকেই দেবার কথা। মির অতিসের পদ নিতান্ত গুরুত্ব পূর্ণ। সম্রাটের ব্যক্তিগত পার্শ্বচর হতে হয় মির অতিসকে। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার। ফলে সম্রাটের ব্যক্তি, পরিবার আর ধনভাণ্ডারের উপর অধিকার আসে মির অতিসের। সাদুদ্দিন খাঁর মৃত্যুর পর এই পদ উজির কামরুদ্দিন স্বপক্ষ পুষ্ট করবার জন্য তার পুত্র হাকিউদ্দিনকে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমির খাঁ সে পদ সফদর জঙ্গকে দিতে চান। তাই দরবার আজ বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। সফদর জঙ্গ তার কবি অতিথি ও তার কন্যাকে—পুত্র সুজাউদ্দৌলার হাতে দিয়ে দরবারে চললেন।

একজন ক্ষমতাশালী সুবেদাদের পুত্র, ব্যবহারে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত। সুজাউদ্দৌলার অহংকার নেই। অনুগত ব্যক্তির মতই অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কি করবে তাই

যেন ভেবে পাচ্ছেনা। তা দেখে একটু হাসলেন আলিকুলি, তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না। এস এখানেই বসা যাক, বলে তিনি প্রাসাদের উদ্যানেই বসলেন। মিষ্টি সুরে বললো সুজাউদ্দৌলা, আপনি ভেতরে এসে বসুন। —না, না, এখানেই বেশ।

—না, না, ভেতরে চলুন। না হলে, আম্মাজান গোঁসা করবেন। আবার হাসলেন আলিকুলি, না, গোঁসা করবেন না। তোমার আম্মাজান আমাকে জানেন। তিনি জানেন আমার যোগ্য স্থান কোথায়। দেখে শুনে তিনি সন্তুষ্টই হবেন। এস তুমি আমার পাশে বোস। আর যেন কথা বলতে পারল না সুজা। কিন্তু ঠিক বসতে পারল না কারণ গান্না তখনও দাঁড়িয়েছিল। এক দৃষ্টিতে দুটো ময়ূরের খেলা দেখছিল সে।

ওকে যে কি বলবে সেটা ভেবে ঠিক করতে পারলনা সুজা। গান্নার বয়েস অল্প, ওর চেয়ে অনেক ছোট। তথাপি গান্নার সর্বাঙ্গ জুড়ে এখন এমনি ভাবে থাকে অপরিণত বয়স বলে ঠেলে দেয়া যায় না। সম্ভবত উত্তরাধিকারী সূত্রে গান্না এ গাম্ভীর্য পেয়ে থাকবে। সুজা একটু ইতস্তত করে গান্নার দিকে তাকালে। সৌজন্যে সেই মুহূর্তে গান্নাও ফিরে তাকাল তার দিকে। কেন কে জানে একটু রক্ত যেন সুজার কলিজার মধ্যে ছলাৎ করে উঠল। একটা লজ্জা জড়ান ভাব নিয়ে সুজা বলল, আপনি বসুন। শুনে হাসলেন। একটু উচ্চ শব্দ করেই হাসলেন আলিকুলি। বললেন, তুমি ওকে আপনি করে বলছ।

আলিকুলির কথা শুনে যেন আরো লজ্জা পেল সুজা। আলিকুলি বললেন, তুমি ওকে "তুমি" বলেই ডাকবে। গান্না তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

গান্নার অপরিণত মনেও সেই মুহূর্তে সুজার ফুটে উঠা ভাবটি ভাল লেগেছিল। সে কিন্তু অবার আয়ত চোখ দুটি মেলে সুজার সুকুমার মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকল। এবার সুজা বলেই বসল, বসবে না তুমি?

কোন দ্বিরুক্তি না করে আব্বাজানের পাশে গান্না বসে পড়ল। সুজাও বসল। আসন গ্রহণ করবার পর গান্না আবার উদ্যানের সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকল। আলিকুলি কথা বলতে লাগলেন সুজার সঙ্গে। বললেন, তোমার আব্বাজান বললেন, তুমি তার গুণ পাওনি। তা ঠিকই তুমি খুব লাজুক।

মুখ খুলল সুজা, আব্বাজনের পথ আমার ভাল লাগে না। আব্বাজানের একমাত্র সঙ্গী অস্ত্র, একমাত্র খেয়াল সৈন্যবাহিনী। দেশ-বিদেশ থেকে টাকা দিয়ে ভাল ভাল সৈন্য ভাড়া করবেন আর তাদের কদমে চালিয়ে ভাল লাগে তাঁর।

আলিকুলি বললেন, সুবেদারের সেই তো যোগ্য কাজ। শক্তি না থাকলে শাসন চলবে কি করে?

—তাই বলে জীবনটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে?

একটু আশ্চয্য হয়ে তাকালেন আলিকুলি সুজার মুখের দিকে। বললেন,—তুমি বুঝি এ সব ভালবাস না?

—না।

—কি ভালবাস তুমি?

একটু যেন লজ্জায় রঙিন হল সুজা। বলল, আমি!....আমি ভালবাসি নির্ভাবনা হয়ে ঘুরে বেড়ান। আমি গান শুনতে ভালবাসি। আমি কাব্য পড়তে ভালবাসি।

প্রশ্ন করলেন আলিকুলি, কবিতা ভালবাস? কার কার কবিতা পড়েছ তুমি?

হাফিজ, ফেরদৌসী সব।

নিজের কবিতার কথা শুনতে ইচ্ছে হল আলিকুলির। বললেন, মসনভি-ই-ওয়ালা সুলতান পড়ান?

—হ্যাঁ।

—কেমন লাগে।

খু-উ-ব ভাল।

যেন একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন আলিকুলি। ঠিক সেই মুহূর্তে গান্না বলে উঠল, বাঃ কি সুন্দর!

আলিকুলি কন্যার দিকে ফিরে তাকালেন, কি আম্মা?

—ঐ দেখ, বলে হাত তোলে গান্না।

আলিকুলি আর সুজা দেখলেন,—ময়ূর পেখম তুলেছে।

সুজা বলল, হ্যাঁ, ময়ূরটা বেশ, খুব পেখম তুলে নাচে।

আমাদের অযোধ্যায় আরো অনেক ময়ূর আছে।

এক দৃষ্টে সেই নৃত্যরত ময়ূরটির দিকে তাকিয়ে থাকল গান্না।

গান্নাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেই যেন বলল সুজা, ময়ূর বুঝি তোমার খুব ভাল লাগে।

—হ্যাঁ।

—তোমাদের ময়ূর নেই?

—আছে।

—পেখম তুলে না?

—তোলে, কিন্তু সে সুন্দর করে নয়! আর এত বড়ও নয় আমাদের ময়ূরটি।

এ যেন মনের মত কাউকে সন্তুষ্ট করবার বিরাট সুযোগ। সুজা বলল, নেবে আমাদের ময়ূর?

গান্না আম্মাজানের দিকে তাকাল।

আলিকুলি বললেন, না। ওর তো রয়েইছে।

সুজা বলল, তাতে কি, এটাও নিক্ না।

এবার গান্নাই বলল, না।

শেষ কৈশোরের কম্পমান আবেগের কাছে যেন এ প্রত্যাখ্যান নিষ্ঠুর মনে হল।

এবার কুলি বললেন, উঠি তা হলে। আর একদিন আসব।

—সেকি, একটুখানি সরবৎ....

—কিচ্ছু প্রয়োজন নেই, আবার আসব।

সুজা জেদ ধরল, না। আম্মা সরবৎ তৈরী করতে বলে দিয়েছেন। এখনি বাঁদী নিয়ে আসবে। না খেলে আম্মা গোঁসা করবেন।

অগত্যা বসতে হল আলিকুলিকে। গান্না এতক্ষণ অন্য কোথাও ছিল যেন। বসরার দুটো বড় গোলাপের উপর একটি প্রজাপতির সোহাগ লক্ষ্য করছিল সে এতক্ষণ। ফুল তার বড় প্রিয়। ঐ প্রজাপতির ফুলের উপর তারও বড় লোভ। সে সুজাকে বলল,

ঐ গোলাপটি আমাকে দেবেন?

—নিশ্চয়ই।

তৎক্ষণাৎ সুজা নিজেই এগিয়ে গেল ফুলটির কাছে। বান্দাদের মধ্যেও কাউকে ডাকল না সে। নিজে হাতে ফুল দেওয়াতে যেন একটা বিরাট কৃতিত্ব।

ফুল নিয়ে আসবার মুখে বাঁদীকেও পানীয় নিয়ে আসতে দেখা গেল। সুজা বিরাট একটি রক্ত গোলাপ এনে দিল গান্নার হাতে। সেই সঙ্গে বাঁদী সেলাম জানিয়ে পানীয় রাখল অতিথিদের পাশে।

আলিকুলি নিজেও পানীয়ের চেয়ে মুগ্ধ চোখে ঐ রক্ত গোলাপটির দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, বাঃ চমৎকার। সেই ফেলে আসা ইস্পাহানের কথা মনে পড়ল তার। সেখানেও তার বাগিচায় এমনি রক্ত গোলাপ ফুটত। মাদ্রাসার পথে কতদিন খাদিজা সুলতানকে সে নিজের হাতে ফুল তুলে দিয়েছে। সে কথা মনে পড়তে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল আলিকুলির। সেই স্মৃতিকে ভুলবার জন্যই যেন তিনি তাড়াতাড়ি পানপাত্রটিকে মুখের কাছে তুলে ধরলেন। কিন্তু নাঃ কিছুতেই ভোলা গেল না। মনের মণিকোঠা থেকে পাক্ খেয়ে খেয়ে যেন স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল।

সেদিন এই সুজার মতই তিনি সুন্দর আর স্বপ্নময় ছিলেন।

হঠাৎ সুজাকে প্রশ্ন করলেন তিনি, মসনভি-ই-ওয়ালা সুলতানের কোন্ কবিতাটি তোমার ভাল লাগে বল দিকি?

তৎক্ষণাৎ সুজা উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাল :

"তুমি বলছ কাব্যে তব রেখ না'ক আমার নাম—
কাব্যে কিসের মূল্য যদি তোমার নামই নাই দিলাম ?"

সে আবৃত্তি শুনে হারানো দিন যেন জীবন্ত হয়ে ফিরে এল আলিকুলির। আর সেই মুহূর্তে সুজাকে খুব ভাল লাগল তার। কিশোরী গাম্মারও খুব ভাল লাগল। জন্মসূত্রে কাব্য চেতনা তার সমস্ত সত্ত্বাতে জড়ানো। বিস্ময়ভরা চোখে সে সুজার দিকে তাকাল। তার সেই দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সুজার যেন মনে হল সে তার পুরস্কার পেয়েছে। পানপাত্র নিঃশেষ করে আলিকুলি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেগম সাহেবাকে আমার সালাম রইল। আজ আসি। আবার আসব।

সুজা যেন নিতান্ত কৃতার্থ হয়ে বলল, নিশ্চয়ই! আবার আসবেন।

আলি কুলি বললেন, তুমিও যাবে কিন্তু ?

এত তার বহু আকাংখিত নিমন্ত্রণ। সুজা বলল, নিশ্চয়ই যাব। আলিকুলি কন্যার হাত ধরে বাইরে অপেক্ষারত তাঞ্জামের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল সুজা।

॥ পাঁচ ॥

সুজার মনে একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল গান্না। গান্না অপরিণত বয়সের কিশোরী। তার সঙ্গে প্রেম সম্ভব নয়। কিন্তু তথাপি তার সমস্ত মন প্রাণ সুজা যেন দিয়ে দিল তাকে। নব যৌবনের জোয়ারে তার কবি মন হয়তো কল্পনা দিয়ে তাকে আরো তীব্র করেছিল। তার প্রথম চোখে একটা রংয়ের প্রলেপ মেখে দিয়েছে গান্না। তার স্বপ্ন আর জাগরণ সবই রঙিন হয়ে গিয়েছে যেন। গান্নাময় হয়েছে সুজার মন। একটা চুম্বকের মত সেই ছোট্ট মেয়েটা তাকে টেনেছিল। সেখানে না গিয়ে থাকা যেন অসম্ভব ছিল সুজার। আলিকুলি নিমন্ত্রণ করেছিলেন, ভাল। না করলেও যেতে হত তাকে। ধৈর্য্য ছিল না সুজার।

রাজকার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যেও সফদর জঙ্গ একদিন যখন প্রস্তাব করেছিলেন—আলিকুলির ওখানে যাবি সুজা?

সুজা তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানিয়েছিল। এবং একদিন সফদর জঙ্গ আর সুজা আলিকুলির ওখানে এসেছিলেন।

তাদের দেখেই আলিকুলি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, এই যে আসুন জনাব, কী সৌভাগ্য।

সফদর জঙ্গ বললেন, সে দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। দরবারে না গিয়ে উপায় ছিল না।

আলিকুলি বললেন, বেশ হয়েছে। আমরা কিছু মনে করিনি জনাব। আপন জনের সঙ্গে অত রীতি মাফিক্ চলতে গেলে চলে!

'আপন জন' এ কথাটা যেন মনে লাগল সফদর জঙ্গের। বললেন, —বেশ বলেছ, আপন জন। সত্যিই তুমি আমার আপন জন। প্রথম দিন দেখেই তোমাকে আমি আপন করে নিয়েছি। যেন কত দিনের পরিচয়। তা' সেদিন কোন····

—কিচ্ছু না। সুজা এতটুকু যত্নের ত্রুটি রাখেনি। জানেন····

কৌতুহল ভরে সফদর জঙ্গ আর সুজা উভয়েই তাকালেন আলি-কুলির দিকে। আলিকুলি বললেন, সে দিন গান্না ফিরে এসে সুজার খুব প্রশংসা করেছিল। শুনে তৎক্ষণাৎ সুজার মুখ আরক্তিম হয়ে উঠল। সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করেছিলেন কি বলছিল, গান্না? আলিকুলি বলেছিলেন, গান্না বলেছিল, ছেলেটি খুব ভাল না আব্বাজান? গান্নার খুব পছন্দ হয়েছে সুজাকে।

দশ বছরের মেয়ের পছন্দের মধ্যে কোন কিন্তুর অবসর নেই। কিন্তু তা শুনেও সুজা ঘেমে উঠল যেন। তার মনে হল তার অন্তরের কিশোরী নয় যৌবনবতী গান্নাই বুঝি একথা বলেছে! সফদর জঙ্গ এবার ব্যস্ত হয়ে বলেছিলেন, কৈ ডাক আমার আম্মাকে, তাকে দেখি। তার জন্যই যে আসা।

আলিকুলি অপেক্ষারত বাঁদীকে হুকুম করেছিলেন গান্নাকে নিয়ে আসবার জন্য।

গান্না অবশ্য সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রস্তুত করছিলেন যিনি তিনি শিল্পী। গান্নার রূপ দাত্রী জননী, বুলবুল।

দীর্ঘ করে বেণী বেধে দিয়েছিলেন কন্যার। জাফরাণী রঙের সালোয়ার আর কামিজ পরিয়ে দিয়েছিলেন। হাতে মেখে দিয়েছিলেন মেহেদী পাতার রং।

অপরূপ বেশে সেজে গান্না এল সফদর জঙ্গের কাছে। ঐ ছোট্ট মেয়ে খাঁ সাহেবকে এমন করে 'সালাম আলেকুম' বলে নমস্কার জানাল যে দেখে সফদর জঙ্গ কৌতুক বোধ করলেন। কিন্তু ঐ একটুকরো কথা যেন সঙ্গীতের শেষ ভাগের মত মনে হল সুজার কাছে। সুজা ঘেমে উঠলেও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগল গান্নাকে। সফদর জঙ্গ চিবুক ধরে আদর করলেন তাকে। পাশে বসালেন। আজ তোমার কাছেই এসেছি আম্মা, আবার তোমার গজল শুনব। তোমার আম্মা তোমাকে নাচতে শিখিয়েছেন তাও দেখব।

নাচ গান দেখাতে ও শোনাতে গান্নাও অরাজি নয়। ভাল লাগল তার। নেপথ্যে দুটি কালো চক্ষুও একটু খুসীর জোয়ার অনুভব করল নিজের মধ্যে।

সরবৎ এল, সিরাজী এল, আঙ্গুর এল সফদর জঙ্গের জন্য। আর তবলচি আর সারেঙি এল। গান্না যেন সম্পূর্ণ অন্য জগতে গিয়ে গজল আরম্ভ করল। সত্যি অপূর্ব! সুর যেন নিজে গান্নার কণ্ঠে খেলে বেড়াচ্ছে। আলিকুলির নিজের রচনা গজল সেই সুরের মধ্যে বিষাদের এক স্নিগ্ধ অন্ধকার বিস্তার করছে। শুনলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। গান শেষ হলে প্রচুর তারিফ করলেন সফদর জঙ্গ। কিন্তু বললেন, একি করছ আলিকুলি, আমার ফুলের মত আম্মাকে বিষাদের গান শিখিয়েছ!
ওকে জীবনের গান শেখাও।

একথা শুনে নাচতে লাগল গান্না। তার আম্মা তাকে নাচ শিখিয়েছে। নাচের মধ্যে কি করে জীবন ফোটাতে হয়, তা শিখিয়েছে। নাচ দেখে সন্তুষ্ট হলেন সফদর জঙ্গ।

নৃত্য শেষে গান্না যেন একবার স্বীকৃতির জন্য তাকাল সুজার দিকে। কি বলবে সুজা! নিজে শুধু একটু অপ্রস্তুত হল সে। তার রূপসী প্রিয়া এত গুণের আধার! কে জানত তা। সুজার যেন আজকে অহংকারের সীমা নেই।

ঠিক এই চিন্তার মুহূর্তে মহল থেকে বাঁদী এসে সালাম জানাল।

আলিকুলি জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

বাঁদী বলল, বেগম সাহিবা একবার নবাবজাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। নবাব জাদা অর্থ সুজাউদ্দৌলা।

আলিকুলি সফদর জঙ্গের দিকে তাকালেন। সফদর জঙ্গ বললেন, নিশ্চয়ই। তিনি সুজাকে বললেন, যাও, ভেতরে তোমাকে আম্মা ডাকছেন। দেখা করে এস। তারপর একটু জোর দিয়ে, কাউকে শুনিয়েই যেন বললেন, বেগম সাহিবার অনেক গুণ ছিল জানি। তার

নাচের তুলনা ছিল না, তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। গান্নাকে দেখে আন্দাজ করে নিতে পাচ্ছি। বেগম সাহিবাকে আমার ধন্যবাদ রইল।

সুজা যেন একটা অপ্রস্তুতি আর লজ্জার মধ্যে পড়ে গেল। গান্নাই যেন সে লজ্জা ভেঙে দিল তার। কৈ আসুন।

গান্নার পাশাপাশি সুজা একটা কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে ভেসে চলল।

হারেমে পৌঁছে যেন সে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ঐশ্বর্য নয়, তার অপূর্ব্ব সজ্জা সত্যিই বিস্ময়কর। অযোধ্যা প্রাসাদে ধনরত্নের অভাব নেই। কিন্তু একটি শিল্পী মনের অভাবে যেন তা সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। ভাবছে, এমন সময় এক অতি মধুর কণ্ঠ তাকে ডাকল, এস।

ফিরে তাকিয়ে সুজা মুগ্ধ হয়ে গেল। ছবিতে দেখা মেহের উন্নিসার মত অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী রমণী। তার কপালে, চিবুকে, চোখের কোণে অপূর্ব সৌন্দর্য্যের স্বাদ। গান্না বলল,—আমার আম্মা।

সালাম জানাল সুজা, আর মনে মনে ভাবল, এমন আম্মা না হলে গান্নার জন্ম কি সম্ভব! আবার সেই রমণী কণ্ঠ অনুরোধ করল সুজাকে, বোস!

অনুরোধ যেন আদেশ। সুজা আর দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়ল। সেই রমণী, আলিকুলির বিবি বুলবুল, এখন বুলবুল বেগম, কথা বললেন, গান্না তোমার কথা খুব বলছিল এসে।

সুজার কপাল দিয়ে যেন ঘাম বেরুতে থাকল। মনের মধ্যে কি এক ভাব যেন গোপন রেখে বেগম বললেন, গান্নার গান, নাচ, তোমার কেমন লাগল?

সুজা লজ্জিত দুটি চোখ তুলে শুধু বলল, এমন কখনো শুনিনি, দেখিনি। তার কপালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে কি যেন পড়ে দেখলেন বেগম, তারপর বললেন, মাঝে মাঝে এস।

ঘাড়কাৎ করে সম্মতি জানালো সুজা। বেগম বললেন, এই

পাশেই তো দারাশিকোহর মহল, মনে হয় যাব একদিন, তোমার আম্মার সঙ্গে............

কথাটা যেন লুফে নিল সুজা, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই যাবেন। বলুন কবে যাবেন, আমি আপনাকে নিয়ে যাব। আম্মাও খুব খুসী হবেন।

গান্না বলল, তাই চল, ওদের বাগিচায় দুটো ময়ূর আছে।

এবার প্রত্যক্ষ ভাবে গান্নাকেই বলল, যেও এবার তোমাকে ময়ূর দুটো দিয়ে দেব।

বেগম হাসলেন। বললেন। তুমি বুঝি সব জেনে ফেলেছ? গান্নার ময়ূরের বড় শখ। যদিও আমাদের দুটো ময়ূর রয়েছে, গান্না বলে তোমাদের মতন নয়। তোমাদের ময়ূর দুটি ওর মনটা কেড়ে নিয়েছে।

কি বলবে আর ভেবে পেল না সুজা। মনে মনে ভাবল, যদি ময়ুয়ের মত সে নিজেই গান্নার মনটা কেড়ে নিতে পারত!

আরো অনেক কথা হল। খুটিয়ে নাটিয়ে বেগম সুজার পারিবারিক কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর এক সময় নিজেই বললেন, যাক এবার এস। তোমার আব্বাজান বাইরে অপেক্ষা করছেন।

সালাম জানিয়ে উঠে পড়ল সুজা। এতক্ষণ কিভাবে তার কেটে গিয়েছে সে বুঝতেই পারেনি। বাইরে এলে তার মনে হল যেন স্বর্গে ছিল সে এতক্ষণ। অবশ্য গান্না নিজে তারই সঙ্গে বাইরে এল।

সফদর জঙ্গ গান্নার চিবুক ধরে আদর করে উঠে দাড়ালেন।

—আসি আম্মা।

—আবার আসবেন জনাব। মিষ্টি সুরে বলল গান্না। সফদর জঙ্গ হেসে বললেন, নিশ্চয়ই, আম্মাকে দেখতে আসব না! ওরা চলে গেলেন।

গান্নাকে নিয়ে আলিকুলি এলেন ভেতরে। বুলবুল, আলিকুলি, গান্না সবার মুখেই হাসির ছটা। আলিকুলি বুলবুলকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখলে সুজাকে।

—হ্যা, সত্যি সুন্দর ছেলেটি।

—কিন্তু ওর আব্বাজানের মতন মোটেই নয়।

—হ্যাঁ, ওর আব্বার মতই।

একটু আশ্চর্য হয়ে আলিকুলি বুলবুল বেগমের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টির মধ্যে কোন্ প্রশ্ন লুকানো আছে সেটা বুঝে নিয়ে বুলবুল বলল,—হ্যাঁ, তুমি সুবেদার সাহেবকে বুঝতে পারনি।

—মানে ?

—তুমি তার বাইরের দিকটা লক্ষ্য করেছ। তার অন্তর দেখনি। আমি তার সম্ভাষণ শুনেই বুঝতে পেরেছি—ওঁর অন্তরটা শিল্পীর। বাইরেরটা নকল সাজ মাত্র। সুজা ওর আব্বাজানের গুণই পেয়েছে।

একটু যেন ভাবলেন আলিকুলি। বললেন, তা বোধহয় ঠিক। বাইরে মানুষটা কঠিন হলেও, অন্তরটা ওর খুব নরম।

বুলবুল বলল, গান্নাকে ভালবেসে ফেলেছেন খাঁ সাহেব।

গান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আলিকুলি। তারপর কন্যাকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, আমার আম্মাকে কে না ভালবেসে থাকতে পারে বল !

গান্না যেন নিজের প্রশংসায় আরক্তিম হল একটু। বুলবুল কন্যার সেই সলজ্জ ভাবের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের মধ্যেই কি ভেবে যেন একটু গর্ব্ববোধ করল। হঠাৎ সে আলিকুলির দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমার কি মনে হয় জান ?

—কি ?—আলিকুলি বেগমের মুখের দিকে তাকালেন। বুলবুল বলল, আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি, তা মিথ্যে নয়।

অন্তরের মধ্যে আলিকুলি কিসের স্বপ্ন দেখেছেন তা তাঁর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। বুলবুলের দিকে তিনি আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য তাকালেন।

বুলবুল বলল,—গান্নাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখাই আমাদের স্বপ্ন। তা বুঝি সার্থক হতে চলল।

—যেমন ?

—গান্নার নসিবে হয়তো সুখ আছে।

—বল।

—চেষ্টা করলে অযোধ্যার বেগম হওয়া ওর অসম্ভব নয়।

গান্না লজ্জা পেল। কিন্তু সে দিকে তার আব্বা বা আম্মা কেউ তাকালেন না। ফলে গান্না শ্রবণটা ওদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিটা বাইরে ছড়িয়ে ছিল।

আলিকুলি বললেন, তোমার কি মনে হয়, সফদর জঙ্গ সেই উদ্দেশ্যেই এখানে আসছেন ?

বুলবুল বলল, সেটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য না হলেও একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই। তোমাকে সফদর জঙ্গ স্নেহ করেন। তোমার কন্যাও তাকে বেঁধে ফেলেছে।

—কিন্তু তাই বলে........

—হ্যাঁ। তুমি দেখে নিও সুবেদার সাহেবই একদিন প্রস্তাব করবেন।

—'আল্লা জানেন।' আলিকুলির মুখে একটা প্রসন্ন দীপ্তি ফুটে উঠল।

বুলবুল বলল, তুমি তো জান, দিল্লীর এখন কি অবস্থা। সুবেদার সাহেবের এখন এমন অবস্থা নয় যে রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত অন্য কোন দিকে এতটুকু নজর দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি এখানে আসছেন। আর জান....

—বল ?

—সুজাও গান্নাকে ভালবেসেছে।

গান্না যেন একটা বেতস পাতার মত কেঁপে উঠল। ভালবাসার স্বরূপ তখনো তার বোঝা সম্ভব নয়। তথাপি ওড়নাবৃতা লজ্জাবতী এক নববধুর রূপ সে কল্পনা করতে পারে। সেখানেই তার রোমাঞ্চ। তাছাড়া সুজা সুন্দর। খুবই সুন্দর। এরকম বর........

আলিকুলি একটু হেসে বললেন, কেমন করে বুঝলে।

বুলবুল বলল, আমি মেয়ে মানুষ, পুরুষকে দেখলেই চিনতে পারি।

ঠাট্টা করলেন আলিকুলি, সুজা যে এখনো ঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি।

এবার একটু কটাক্ষ করল বুলবুল। স্বামীর অতীত জীবনের সমস্ত কথাই সে জেনেছে। সেই কথা মনে রেখে বলল, 'মসনভি ই ওয়ালা সুলতান, তুমি কবে লিখেছিলে? একটু লজ্জা পেলেন আলিকুলি।

বুলবুল বলল, সুজারও এখন সেই সময়। গান্নার যদি নসিব থাকে....কিশোরী গান্নার পক্ষেও যেন ওখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু শোনা সম্ভব ছিল না। এক পা দু পা করে সে বাইরে চলে গেল। ভাব খানা এমন করল যেন ওদের আলোচনা ওর বাইরে যাবার কারণ মোটেই নয়।

আলিকুলি তা দেখে বললেন, দেখলে গান্নাও লজ্জা পেয়েছে। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল শুধু বুলবুল। তারপর একটু নীরবে কাটল। কিছুক্ষণ। বুলবুলই আবার বলল, তবে অবশ্য গান্না বড় না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছু করতে রাজি নই। সাদী ব্যাপারটাকে আমি তোমাদের সামাজিক প্রথামত নিতে রাজি নই। বিয়েটা নিজের ইচ্ছের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিৎ।

আলিকুলি বললেন, যেমন তোমার আমার?

চোখ দুটোকে সোহাগে একটু বড় করে বুলবুল স্বামীর দিকে তাকালো।

—কেন তুমি সন্তুষ্ট হও নি?

—তাই তো বলছি। আমার মত বেছে নিতে পারলে, গান্না আর ঠকবে না।

একটু ঠাট্টা করল বুলবুল, বলল, খাদিজা সুলতানের কথা ভুলতে পারনি বুঝি?

ভুলতে পেরেছেন কিনা আলিকুলি, কে জানে! কিন্তু খাদিজাকে ভুলে থাকতে তার ভাল লাগে। তার নাম শুনলে হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে। ও নাম আর তিনি শুনতে চান না। তাই হঠাৎ আবেগে তিনি বুলবুলকে জড়িয়ে ধরলেন। একটু ব্যস্ত হল বুলবুল, ওকি!—

করুণ অথচ তীব্র দুটি চোখ রাখলেন আলিকুলি বুলবুলের উপর।

উজির কামরুদ্দিনের দলভুক্ত লোক সাদুদ্দিন খাঁকে সে পদ দেওয়া হয়। কিন্তু মির অতিসের পদ গুরুত্বপূর্ণ পদ। সম্রাটকে রক্ষা ও পাহারা দেবার দায়িত্ব তার। এমন কি সম্রাটের হারেম, অর্থভাণ্ডার সমস্ত রক্ষার ভার তার। এ অবস্থায় সম্রাটের উপর মির অতিসের প্রভাব থাকা সম্ভব। আমির খাঁ এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে উজির কামরুদ্দিনের প্রভাবকে সর্বতোভাবে দুর্ব্বল করে দেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এই অবস্থায় তারই দলভুক্ত লোক সাদুদ্দিন খাঁ মির অতিস হোক তা তিনি চাইলেন না। তিনি চাইলেন তার সমর্থিত সফদর জঙ্গ মির অতিস হন এবং লালকেল্লার মধ্যে তিনি থাকুন। সম্রাটের উপর চাপ দিয়ে তিনি ১১ই মার্চ মির অতিসের পদ সফদর জঙ্গের জন্য আদায় করলেন। সাদুদ্দিন খাঁকে বরখাস্ত করা হোল। সেই কারণেই ১১ই মার্চ মধ্য রাত্রিতে সফদর জঙ্গ পরিবার সহ লালকেল্লার মধ্যে যান। এ সমস্তই রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে, এবং সফদর জঙ্গের উন্নতির পরিচায়ক। সফদর জঙ্গ নিজেও ঘটনার এতটা দ্রুততা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। সম্ভবত তাহলে তিনি আলিকুলি খাঁকে সে সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত দিতেন। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করবার অল্পকাল পরই তিনিই আলিকুলির কথা ভেবেছেন। আলিকুলি দারা স্থকোহর প্রাসাদে তার খোঁজ করে ফিরে যেতে পারেন। এ ভয়ও তার হয়েছে। তাই দুর্গে প্রবেশ করে পরদিনই আলিকুলিকে সংবাদ দেবার জন্য চেষ্টা করলেন। সম্ভব হলে আলিকুলিকে তিনি দুর্গেই আনতে বলতেন। কিন্তু দুর্গের অবস্থা সম্পূর্ণ না বুঝে তিনি তাকে আনতে বলতে পারলেন না। সুজাকেই তিনি খবর দেবার জন্য পাঠালেন।

দুর্গ সুজারও খুব ভাল লাগছিল না। তার মন তখন এমনিতেই অস্থির। পাষাণ দেয়ালের বন্ধন যেন তাকে অস্থিরতর করে তুলল। বাইরে বিশেষ করে আলিকুলির ওখানে যাবার জন্য তার মন ছটফট করছিল। গাম্মা তার সমস্ত কল্পনা লুণ্ঠন করে নিয়েছে। গাম্মার

আত্মা ও তার ব্যবহারে যেন তাকে জয় করে নিয়েছে। এই মুহূর্তে সফদর জঙ্গ নিজে তাকে আলিকুলির ওখানে যেতে বললে যে যেন স্বর্গ হাতে পেল। এবং বেরিয়ে এল আলিকুলির প্রাসাদের দিকে।

ওদিকে আলিকুলি বাসায় ফিরে এসেছেন। হঠাৎ তাকে ফিরে আসতে দেখে যেন একটু আশ্চর্য হল বুলবুল বেগম, বলল, একি, যাওনি?

চিন্তার ভাবটা আলিকুলির মুখ থেকে তখনো যায় নি, সে বলল, ওরা ওখানে নেই।

—কি বলছ?

—হ্যাঁ!

চিন্তার হাওয়া পড়ল বুলবুলেরও মুখে, কি হল বলতো? কোথায় গেলেন?

আলিকুলি বলল, জানি না। তবে শুনলুম, মধ্য রাতে লালকেল্লায় গিয়েছেন।

—হঠাৎ!

—সেটাই তো বুঝতে পাচ্ছি না।

—কেন, কোন বিপদ হয়েছিল?

আলিকুলি বললেন, বুঝতে পাচ্ছি না। তবে বিপদ হবার তো কথা নয়। কারণ সফদর জঙ্গের সঙ্গে দশ হাজার বাছাই সৈন্য রয়েছে। তাছাড়া আমির খাঁর প্রতাপ এখন দিল্লীতে উজিরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বুলবুল প্রশ্ন করল, সেদিন যখন এসেছিলেন, তিনি তো লালকেল্লার কথা তোমাকে কিছু বলে যান নি।

আলিকুলি বললেন, হয়তো বলবার সময় পান নি। হয়তো এমন কোন কিছু হয়েছে যা তিনি নিজেও আন্দাজ করতে পারেন নি। যা হোক, জানবার চেষ্টা করতে হবে।

—হ্যাঁ, তাই কর। যতক্ষণ না জানতে পাচ্ছি, শান্তি নেই।

ওরা যখন সফদর জঙ্গ সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছিলেন ঠিক সেই সময় বাঁদী এসে দাঁড়াল। বুলবুল বলল, কি খবর ?

—সুবেদার সাহেবের ছেলে এসেছেন।

—সুবেদার ? কোন সুবেদার।

—অযোধ্যায় সুবেদার।

বুকটা যেন কেমন করে উঠল বুলবুলের। আলিকুলিরও।

বুলবুল বলল, আর কে এসেছেন ?

—আর কেউ নয়।

—একা ?

—হ্যাঁ। একা।

বুলবুল আর আলিকুলি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন বাইরে। হতবুদ্ধি গান্না কি করবে বুঝতে না পেরে দাড়িয়ে থাকল।

বুলবুল আর আলিকুলিকে দেখে 'সালাম' জানান সুজা।

—এই যে, কি খবর ? বলে এগিয়ে গেলেন আলিকুলি।

বুলবুল বলল, সত্যি তোমরা আমাদের চমকে দিয়েছ। হঠাৎ কোথায়....

কথা শেষ করতে দিল না সুজা, বলল, আপনারা গিয়েছিলেন বুঝি ?

আলিকুলি বললেন, না গিয়ে থাকতে পারি ? তোমরা....

বুলবুল বলল, যাক, ভেতরে চল, আগে বসা যাক।

ভেতরে এল ওরা তিনজন। গান্না ঠিক তেমনি দাড়িয়ে ছিল ওখানে। সুজার তৃষ্ণার্ত চোখ দুটি প্রকৃতপক্ষে যার অনুসন্ধান করছিল সেই ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে যেন তৃপ্ত হল। গান্নাও তার কিশোরী মন দিয়ে কল্পনা করা সুজাকে দেখে নিল। মর্ত্যে সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। প্রণয় যিনি সৃষ্টি করেছিলেন সেই বিধাতাও বুঝি তা দেখে না হেসে থাকতে পারতেন না।

বুলবুল সুজাকে বলল, বোস।

ওরা তিন জনেই বসল।

এবার বুলবুল বলল, তোমাদের খবর বল।

সুজা বলল, হঠাৎ গতরাত্রে আব্বাজানকে লালকেল্লায় যেতে হয়। জানিয়ে যেতে পারেন নি তিনি। আপনাদের জানাবার জন্যই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

—কেন? ব্যাপার কি, বলত?

—কাল হঠাৎ আব্বাজানকে মির অতিসের পদ দেওয়া হোল কিনা! জানাবার আর সময় পাননি।

বুলবুল বলল, ও তাই বল। আমরা ভেবে সারা।

সুজা সেই ফাঁকে আর একবার গান্নার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, —আব্বাজান নিজেই আসবেন। আপনাদেরই হয় তো লাল কেল্লায় নিয়ে যেতেন। কিন্তু এখনো............

আলিকুলি বললেন, ঠিক আছে। অন্তরের টান থাকলে........। সুবেদার সাহেবকে আমাদের সালাম জানিও। তার সাফল্য কামনা করছি আমরা।

সুজা একটা কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাল। বলল, এত ব্যস্ততার মধ্যেও আব্বাজান আপনাদের কথা ভোলেননি। বারবার বলছিলেন।

বুলবুল বলল, সুবেদার সাহেবের অনেক করুণা।

সুজা এবার জিজ্ঞেস করল, আপনারা বুঝি দারা—সুকোহর প্রাসাদে গিয়েছিলেন?

আলিকুলি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। আমি আর গান্না গিয়েছিলাম। গান্না তো তোমাদের না দেখে ভেঙেই পড়ল। বিশেষ করে ওর দুঃখ হয়েছিল ময়ুরটির জন্য।

সুজা একটু হেসে গান্নার দিকে তাকাল। যেন একটা অভিমান আছে দৃষ্টিতে, এমনি ভাবে গান্নাও তাকাল তার দিকে। সুজা বলল, ঠিক আছে, গান্নার জন্য ময়ুর দুটো পাঠিয়ে দেব।

এবার বুলবুল বলল, তা লালকেল্লা কেমন লাগছে?

সুজা বলল, আমার ভাল লাগছে না।

—কেন ?—

প্রথমটা উত্তর দিল না সে।

বুলবুল আবার প্রশ্ন করল, কেন বলতো ?

সুজা বলল, লালকেল্লা যেন একটা মাকড়সার জাল। প্রথম দিনেই আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। বাদশার কাছে হলেও ভয় ওখানে সব চেয়ে বেশী। আব্বাজান বলছিলেন, এবার আমাদের সাবধানে চলতে হবে।

—কেন ?

—জাবিদ খাঁকে তিনি সন্দেহ করেন। জাবিদ খাঁ আব্বাজানের পদোন্নতিকে গ্রহণ করতে পারলেন না।

—হুম্। তা বাদশার খবর কি ? তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন তো ? সুজা বলল, জানিনা। তবে রাত্রেই আব্বাজানকে ডেকেছিলেন। তিনি মহলের চাবি তাঁহার হাতে তুলে দেন। বাদশা বোধ হয় আব্বাজানের উপর অসন্তুষ্ট নন।

বুলবুল বলল, আল্লা ভাল করুন। তোমার আব্বার আরো উন্নতি হোক। লাল কেল্লায় গিয়েছে শুনে বড় ভাল লাগল।

—কিন্তু আমার ভাল লাগে না। ওর চেয়ে দারা সুকোহর প্রাসাদ অনেক ভাল। ওখানে বেশ শান্তির স্পর্শ আছে। মনটা হাঁফিয়ে উঠে না।

আলিকুলি বললেন, হবে। দারা সুকোহ শিল্পী ছিলেন। কিন্তু লাল কেল্লা অন্য পদার্থে গড়া। তুমিও শিল্পী। তোমার বাবার মত নও। তোমার কেল্লা ভাল লাগবে না।

বুলবুল বলল, যখনি ভাল লাগবে না, তুমি আমাদের এখানে চলে আসবে।

নীরবে সম্মতি জানাল সুজা। তার সেই নীরব সম্মতি লক্ষ্য করে

বুলবুল বলল, তুমি এখানে আসবে, গান্না তোমাকে গজল শোনাবে কেমন ?

সুজা মুখ তুলে গান্নার দিকে তাকাল। গান্না যেন একটা লজ্জার সঙ্কোচে আম্মার আরো কাছে সরে এল।

বুলবুল জিজ্ঞেস করল, কি, গান শোনাবি ?

সে এক ভারি অপ্রস্তুত অবস্থা। কিশোর মনেরও সে অপ্রস্তুতি থেকে রেহাই নেই। গান শোনাবার তার ইচ্ছা। কেউ প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকাক, এটা গান্নারও ইচ্ছা। সমস্ত কিছু না বুঝলেও ঐ প্রশংস দৃষ্টিটুকু সে বুঝতে পারে তাই গান শোনাতে তার দ্বিমত নেই বুলবুল তার মনের সে খবর রাখে। তাই সে সুজাকে বলল, কি গজল শুনবে তুমি ? এ যেন চাঁদের হাতে থেকে আসা। কিশোরী মেয়ের সঙ্গে ভাবের আদানে প্রেম সম্ভব নয়! কিন্তু প্রেম বড় একরোখো, একবার নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হলে উৎস মুখ শুখিয়ে না গেলে ফেরান দায়। সাগর চাক্ না চাক্, নদী চলবেই। দয়িতা যে হোক সে হোক, তাকে নিয়ে মন স্বপ্ন দেখবেই। সুজা তখন গান্নার স্বপ্নে মসগুল। তার জাগ্রত যৌবনের স্বপ্ন ঐ ছোট্ট মেয়ে গান্নাকে ঘিরেই মৌমাছির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এতটুকু প্রসাদ লাভ করে সে ধন্য। একটু গানের সুর তো তার কাছে আশাতীত প্রাপ্য। বুলবুলের প্রশ্নে সুজা বলল, আমি নিশ্চয়ই আসব! আমি নিজেকেই ধন্য মনে করব।

বুলবুলের হুকুমে বাঁদী সেতার নিয়ে এল। গান্না আলিকুলির লেখা গজলই গাইতে আরম্ভ করল।

সুজা উঠন্ত যৌবনের কি এক আবেগে সেই কিশোরী কন্যার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকল। আর নিজের কল্পনাকে কন্যার কণ্ঠে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতে দেখে আলিকুলি আত্মহারা হলেন। বুলবুল একবার সুজা আর আলিকুলি, আর একবার কন্যার কৃতিত্বের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে কিসের গর্ব বোধ করতে থাকল। তার নিজের

কিশোরী জীবনের কথা মনে পড়ল। কিন্তু তার সে দিনের চেয়ে এ দিন কত পৃথক। সে ছিল নর্তকী আর এ সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। তার ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর গান্নার উজ্জ্বল। আর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সুজা তার সামনে বসে। কি এক ভাললাগায় যেন নিজের মধ্যে দুলে দুলে উঠতে লাগল বুলবুল।

॥ সাত ॥

অদৃষ্ট বলে একটা জিনিষ আছে। অদৃশ্য জীবনের ঘুটি পরিচালনা করে সে। তাই মানুষ অজ্ঞাতসারে যা ভাবে তা সব সময় সার্থক পরিনতি লাভ করতে পারে'না। অদৃশ্য তার ভাগ্য চিন্তার বিপরীত একদিকে তাকে নিয়ে যায়। সফদর জঙ্গ আর সুজার জীবনে এবং আলিকুলির পরিবারের উপরও সেই অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস তাই হঠাৎ নেমে এসেছিল। লালকেল্লায় প্রবেশ করে যে মুহূর্তে সফদর জঙ্গ নিজস্ব ভঙ্গিতে তার বাস্তব উন্নতির কথা ভাবছিলেন ঠিক সেই সময় তার ব্যক্তিচিন্তার উপর হস্তক্ষেপ করেছিল রাজনীতি। উন্নতি মানসিক এবং বাস্তব দুদিক থেকে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বাস্তব উন্নতি সফদর জঙ্গের হয়েছে। এইবার তার মানস-স্বপ্নকে সফল করবার কথা ভাবছিলেন সফদর জঙ্গ—ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটে গিয়েছিল। লালকেল্লার মধ্যেই বাদশা তাকে ডেকেছিলেন। ঘন ঘন বাদশার সান্নিধ্য পাওয়া সৌভাগ্য বইকি! সেইজন্যই সফদর জঙ্গ দুর্গের ভিতরে এসেছিলেন। উৎফুল্ল মনেই তিনি বাদশার কাছে গিয়েছিলেন। বাদশা সন্তুষ্ট চিত্তেই তাকে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু বাদশা নয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমির খাঁ আর ইশাক খাঁ। সকলেই সিয়া সম্প্রদায়ের লোক। ইরাণী দলভুক্ত। সফদর জঙ্গকে সবাই স্বাগত জানালেন। বাদশাকে কুর্নিস জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন মির অতিস সফদর জঙ্গ। ওদের হাবভাবে মনে হল সুখবর আছে কিছু। বেশ ভাল লাগল সফদর জঙ্গের। বাদশা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বসুন।

আসন গ্রহন করলেন নব নিযুক্ত মির অতিস।

মুহাম্মদ শা স্বয়ং বললেন, আপনাকে একটা সুসংবাদ দিতে চাই।

হুকুম করুন, গদগদ ভাবে বলেছিলেন সফদর জঙ্গ।

বাদশা বলেছিলেন, এই আমার প্রিয়তম বন্ধু ইশাক খাঁ, ইশাক খাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন তিনি।

ইশাক খাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকলেও সফদর জঙ্গ চিনতেন তাকে। ব্যক্তিগত পরিচয় হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি। বাদশার দরবারে গন্য মান্য আমিরকে অভিনন্দন জানালেন সফদর জঙ্গ।

বাদশা জানালেন, ইশাকের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হোক এই চাই আমরা

—সেত নিশ্চয়ই।

বাদশা একবার ইশাক, আর একবার আমিরের মুখের দিকে সহাস্য ভাবে তাকালেন। এ যেন এক কৌতুকের ব্যাপার। সফদর জঙ্গও উপভোগ করলেন।

এবার বাদশা আসল প্রস্তাব আনলেন, শুনুন ! আপনাকে আমার একটি অনুরোধ আছে।

তৎক্ষণাৎ সফদর জঙ্গ কুর্নিস জানালেন বাদশাকে। স্বয়ং বাদশা তাঁর অনুরোধ ! যেন অন্যায় করে ফেলেছেন এমনি ভাবে বললেন সফদর জঙ্গ—হুকুম করুন জাহাপনা।

—আপনার ছেলেকে আমাদের প্রয়োজন !

—নিশ্চয়ই। সে জাহাপনার একজন বান্দা।

বাদশা বললেন, ইশাক আমার পুরাতন বন্ধু। আপনিও। আপনাদের দুজনের দোস্তি জোরদার হোক এই চাই আমি।

কি যেন একটু সন্দেহ হল সফদর জঙ্গের। এইবার একটু সন্দেহের চোখে তাকালেন তিনি সকলের দিকে। বাদশা, ইশাক, আমির খাঁ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। বিরাট এক রহস্য।

বাদশা অবশ্য তৎক্ষণাৎ সে রহস্যের আবরণ খুলে দিলেন। বললেন —ইশাকের বোনের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

নত হলেন শুধু একটু সফদর জঙ্গ।

বাদশা বললেন, বাহু, বাহু রূপে, গুণে জেনানা মহলের ঈর্ষার বস্তু।

কোন কথা যেন বলতে পারলেন না সফদর জঙ্গ। বাদশা বলে চললেন, —সুজা উদ্দৌলার সঙ্গে তার সাদী হোক এটাই আমরা সকলে চাচ্ছি। বাদশা সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ততক্ষণ বুকের ভেতরটা অনেকটা যেন শুকিয়ে এসেছে সফদর জঙ্গের। এ প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু যেন····। সফদর জঙ্গ সেই লোক যিনি রাজনীতি এবং ব্যক্তি সত্বাকে পৃথক করে রাখতে চান। রাজনীতির উর্ধে ব্যক্তি ইচ্ছার একটা অবকাশ আছে তার। নিজের একটু স্বপ্ন আছে—তা আঁকড়ে ধরে থাকতে ভালবাসেন তিনি। কিন্তু···· সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক অনুমোদনের চিহ্নটা যেন খুঁজে পেলেন না মুহাম্মদ শাহ, বললেন, জনাবের এতে কি অমত আছে ? আপনি কি অন্য কোথাও····

বাদশার অনুরোধ মানে আদেশ। ব্যক্তিগত খেয়াল যতই থাক, তাঁর কথা ঠেলে দেওয়া যেতে পারে না। সুতরাং সফদর জঙ্গকে বলতে হ'ল—না, না, অমত কেন, এত আমার সৌভাগ্য। আর অন্যত্র কোথাও কথা দিইনি আমি।' মুখে একটা কৃত্রিম হাসি দেখাতে চাইলেন সফদর জঙ্গ।

বাদশা বললেন, এতে আমাদের সবারই সুবিধে হবে।

দোষস্খালনের ভঙ্গিতে বললেন সফদর, সেকি খোদাবন্দ, এ বান্দাকে যা আপনি হুকুম করেছেন এতেই আমি ধন্য। আপনি ফরমাস করুন আমাকে কি করতে হবে।

বাদশা তখন ইশাকের দিকে তাকালেন, তোমার কি মত ?

ইশাক জানালেন, আপনাদের মতই আমার মত।

বাদশা বললেন, বেশ! এবার তোমরা হলে আত্মীয়। আমরা যেন পর। তোমরা নিজেরা মিটমাট করে নাও।

বাদশার এ ইঙ্গিতের অর্থ কি তৎক্ষণাৎ ধরে ফেললেন সফদর। তিনি উঠে ইশাককে সালাম জানালেন। ইশাকও প্রত্যভিবাদন করবার পর উভয়ে কোলাকুলি করলেন।

এবার কথা বললেন আমির খাঁ, আমার একটা বক্তব্য আছে।

সফদর জঙ্গ বললেন, বলুন।

—'সাদীটা খুব শিগ্‌গীর সেরে ফেলতে হবে এবং দু-এক দিনের মধ্যেই।' কেন দু-এক দিনের মধ্যে সাদী হওয়া দরকার ইশাক জানেন। সফদর জঙ্গ তা না জানলেও, কোন একটা গুরুত্ব আছে এটা বুঝে নিয়ে ইশাক খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, খাঁ সাহেবের মেহের বাণী।

ইশাক উত্তর দিলেন, মেহেরবাণী আপনার। আমি হুকুম তামিল করতে সব সময় প্রস্তুত।

সফদর জঙ্গ আমির খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি ওর সঙ্গে পরামর্শ করে কালই জানিয়ে দেব।

বাদশা বললেন, আমার আর কিছু বলবার নেই। এবার আপনারা যেতে পারেন। শুধু দেখবেন সাদীর রাতে আমারও যেন নিমন্ত্রণ হয়।

জিব্ কাটলেন সফদর জঙ্গ, আর কুর্ণিস করলেন বাদশাকে। শুধু সফদর জঙ্গ নয়, ওরা দুজনও কুর্ণিস জানালেন বাদশাকে। তার পর সবাই বিদায় নিলেন।

বাইরে এসে আমির খাঁ ইশাককে বললেন, সালাম জনাব। আজ তা হলে আসি। শিগ্‌গির আবার দেখা হবে।

—জনাবের মেহেরবাণী। সালাম, বলে চলে গেলেন ইশাক।

আমির এবার সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাকালেন। দেখলেন, মির অতিসের মুখে চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমির খাঁ বললেন, চলুন খাঁ সাহেব আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

—চলুন।

মির অতিসের আস্তানার দিকে ওরা এগুতে লাগলেন। যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন আমির খাঁ, খাঁ সাহেবকে যেন খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে?

—হ্যাঁ, ভাবছি।

কিন্তু আমার মনে হয় ভাবনার কিছু নেই এ সাদী ইরাণী দলকে শক্তিশালী করবে। বাদশা আমাদের উপর সন্তুষ্ট না হলে নিজে তিনি এ সাদীর ব্যবস্থা করতেন না। শুধু ইরাণী দল নয় সিয়া সম্প্রদায়ের এতে ভাল হবে।

সফদর জঙ্গ কোন কথা বললেন না।

আমির খাঁ আবার বললেন, এ কথাটা গোপন রাখতে হবে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সাদীটা সেরে ফেলতে হবে। উজির কামরুদ্দিনকে সাদীর আগে কিছু জানতে দেওয়া হবে না।

আমির খাঁ সফদর জঙ্গের হিতৈষি। তিনিই অযোধ্যা থেকে তাকে দিল্লী এনেছেন। শুধু দিল্লী আনা নয় তিনি তাকে মির অতিসের মত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছেন। সফদর জঙ্গ আজ আমির খাঁর জন্যই গন্যমান্য আমিরদের মাঝে একজন। আমির খাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া যায় না। কৃতজ্ঞতারও তো একটা প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া এ সাদী সফদর জঙ্গকেও শক্তিশালী করবে। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ না হলেও এ সাদীর লক্ষ্য তারই মঙ্গল। সুতরাং সফদর জঙ্গ আমির খাঁকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বললেন, বেশ, জনাবের ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ হবে।

—কাল বাদ পরশুই তবে সাদীর দিন ঠিক করুন।

—বেশ। তাই হবে।

—আচ্ছা চললাম আমির খাঁ চলে গেলেন।

—আলিকুলি সালাম। প্রতি অভিবাদন জানালেন সফদর জঙ্গ।

ধীরে ধীরে তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন। এসেই দেখলেন সুজা কোথায় বাহিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রশ্ন করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

সুজা বলল, আলিসাহেবের কাছে।

—না। ফের। নিতান্ত গম্ভীর ভাবে বললেন সফদর জঙ্গ। কিছু বুঝতে না পেরে নীরবে ভাবতে লাগল সুজা।

আলিকুলি দম্পতির কাছে সুজা অতিথি। শুধু অতিথি নয়, প্রিয় অতিথি। তার জন্য স্বামী, স্ত্রী, কন্যা, প্রত্যেকেরই সাগ্রহ অপেক্ষা। দিন দিন সুজা প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়েছে তাদের কাছে। সুজা শুধু সুপুরুষ নয়, জবরদস্ত সুবেদারের পুত্র নয়, সে গুণী। সুবেদারের পুত্র হয়েও সে শিল্পী। তাই আলিকুলি আর বুলবুলের কাছে সে প্রিয়। সুজা নিজে গাইত পারে, কাব্য সমালোচনা করতে পারে, কাব্য সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা দিতে পারে। তাছাড়া সে তাদের ভবিষ্যতের এক রঙিন স্বপ্নের উৎস হয়ে দাড়িয়েছে। সুজার মধ্যে তারা তাদের একমাত্র আত্মজার সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে, সুজা তাই তাদের কাছে আত্মীয় প্রতিম।

সফদর জঙ্গ লালকেল্লা যাবার পর, সপ্তাহ খানেক প্রায় প্রতিদিন সুজা আলিকুলির ওখানে এসেছে। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে ব্যস্ত থাকায় সফদর জঙ্গ নিজে আসতে পারেন নি। কিন্তু পুত্রের মারফৎ তিনি প্রত্যেক দিন জানিয়েছেন যে তিনি সময় পেলেই আসবেন। ভোলেননি তিনি কুলিদম্পতির কথা, তাদের একমাত্র স্নেহ পুত্তলি গান্নার কথা। গান্না সফদর জঙ্গের প্রিয়। তাকে আম্মা সম্বোধন করেছেন সফদর জঙ্গ।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাই গাড়ীর অপেক্ষা করছিলেন আলিকুলি আর বুলবুল, সুজার জন্য। সে আসবেই। সে আসবে তার নিজের কারণে। কারণ ওরা বুঝতে পেরেছেন ছোট হলেও সেই ছোট মেয়ে গান্নার প্রেমে পড়ে গিয়েছে সুজা। সেই প্রেম ব্যতিরেকে আলিকুলি আর বুলবুলের সঙ্গে সৌহার্দ্দও আকর্ষণের অন্যতম কারণ। সেই আকর্ষণ আর স্নেহ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সুজা তবু এল না। সন্ধ্যার প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হল, তবু তাকে দেখা গেল না। আলিকুলি আর বুলবুল একটা গভীর আগ্রহ নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এমনকি সেই মুহূর্তে কিশোরী গান্নাও যেন কিসের অভাব বোধ করেছিল।

হঠাৎ অদূরে কোলাহল শোনা গেল। শানাই বাজল। বাজি ফাটবার আওয়াজও হল। আগুনের ফুলকি হারে আসমান ছেয়ে গেল। হঠাৎ দিল্লীতে একি ব্যাপার হল যেন বুঝে উঠতে পারলেনা আলিকুলি আর বুলবুল। মনে হল যেন কোন আমির ওমরার সাদী উৎসব। কিন্তু দিল্লীতে কোন খানদানী বংশে সাদী হলে আলিকুলি জানতেন না কি? পদমর্য্যাদায় তিনি খুব ছোট নন। কবি হিসাবেই তার খ্যাতি হলেও, তিনি বাদশার দ্বিতীয় মির তুজুক। সুতরাং তাকে অনিমন্ত্রিত হয়তো কেউ রাখতেন না। সর্বোপরি বড় কথা এই যে আলিকুলি ইরাণী তুরাণী সবারই প্রিয়। তিনি অজ্ঞাত শত্রু। তাই হঠাৎ এ আনন্দ উৎসবের কারণ অবিস্কার করতে না পেরে তিনি আশ্চর্য্য হলেন খানিকটা। কৌতুহলের সঙ্গে আগত আনন্দ উৎসবের দিকে তাকাল বুলবুলও। সর্বাপেক্ষা বেশী আগ্রহ নিয়ে তাকাল গান্না। ওরা তিনজনই রাজপথের দিকে তাকিয়ে থাকল। উৎসবের উম্মাদ সাড়া তখন এগিয়ে আসছে। আসমানে আগুনের খেলা চলছে। বাতাসে পটকার কর্ণবিদারী শব্দ শানাই একটানা বেজে চলেছে। বুলবুল আলিকুলিকে জিজ্ঞেস করল, কি বলতো?

আশ্চর্য্য হয়ে আলিকুলি বললেন, তাই ভাবছি।

বুলবুল বলল, নিশ্চয়ই কোন আমিরের সাদী হবে।

আলিকুলি উত্তর দিলেন, কিন্তু তাহলে কি আমরা জানতুম না?

—তবে?

—আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কি?

—ভাবছি ইরাণীরা বিজয়োৎসব করছেনা তো?

—কি রকম?

আলিকুলি বললেন, সফদর জঙ্গ মির অতিস হয়েছেন। উজির কামরুদ্দিনের লোক সাদুদ্দিন খাঁ গদিচ্যুত হয়েছেন। আমির খাঁর এ এক বিরাট জয়।

বুলবুল বলল, কিন্তু তাই বলে............

আলিকুলি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সত্যি যদি তা হয়ে থাকে, তবে বিরাট ভুল করলেন আমির খাঁ। এটা তার অহংকার। এর ফলে নিজের পতনের সঙ্গে তিনি মোগল সাম্রাজ্যেরও বিপর্য্যয় ডেকে আনবেন।

সেই মুহূর্তে উৎসব কোলাহল নিকটবর্তী হল। বাজী পোড়ানোর শব্দ আরো প্রবল হল। রাস্তার উপর আলো দেখা গেল। বাতাস কেটে আসমানের দিকে আলো ছুটল। আকাশে আগুনের ফুলকি হার হল।

গাম্মা চেঁচিয়ে বলল, আম্মা, দুলা।

আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখলেন আলিকুলি আর বুলবুল, সত্যি বর যাত্রী চলেছে। তাঞ্জাম চলেছে নানা রঙে সেজে। কাহারা দ্রুত ছুটে আসছে। সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ। স্বামী, স্ত্রী কারো মুখে যেন কথা ফুটল না। কার সাদী! তারা এতটুকু জানতে পারলেন না। একজন বান্দা উৎসুক হয়ে রাস্তায় উঁকি দিচ্ছিল। বুলবুল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বান্দা সালাম জানিয়ে বলল, ফরমাস করুন মেহেরবান।

বুলবুল প্রশ্ন করল, কার সাদী হচ্ছে রে?

—তা জানিনে মেহেরবান।

—জানতে পারিস?

—জরুর।

—যাতো, জেনে আয়।

তৎক্ষণাৎ বান্দাটি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

একটা প্রচণ্ড কৌতুহলে আলিকুলি আর বুলবুল অপেক্ষা করতে লাগলেন সংবাদের জন্য।

উন্মাদ জনস্রোত দেখতে দেখতে রাজপথ অতিক্রম করে গেল। কিন্তু ওরা ঠিক ঠায় দাড়িয়ে থাকল। ঐ উৎসবের চেয়েও কৌতুহল উদ্দীপক সংবাদ অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য। ওরা দেখল বান্দা

ফিরে আসছে। জনস্রোত, আর এত জাঁকজমক দেখে সে খুব খুসী। সে কাছে এসে দাঁড়াতেই বুলবুল অধৈর্য্য প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল,

—কার সাদী রে ?

—অযোধ্যার নবাবজাদার।

নিজের কাণকে যেন বুলবুল বিশ্বাস করতে পারল না। আলিকুলি বিশ্বাস করতে পারলেন না। আবার প্রশ্ন করল বুলবুল, কার কথা বললি ?

—অযোধ্যার নবাব জাদার।

—ঠিক শুনেছিস ?

—আজ্ঞে মেহেরবান।

—ঠিক ?

—হাঁ বেগম সাহিবা। ওরা বলল অযোধ্যার সুবেদার মির অতিস সফদর জঙ্গের ছেলে নবাবজাদা সুজাউদ্দৌলার সাদী হচ্ছে।

আর যেন শুনতে পারল না বুলবুল, থর থর করে কাঁপতে লাগল বুলবুল। আলিকুলিও যেন বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি বান্দাকে বললেন, কার সঙ্গে সাদী জানিস ? বান্দা জানাল, নাজমুদ্দৌলা ইশাক খানের বহিন বাহুন্নিসার সঙ্গে।

না, আর অবিশ্বাস নেই। এত যখন জেনে এসেছে, তবে নিশ্চয়ই সব সত্য। কিছু আর বলবার নেই। আলিকুলি বান্দাকে বললেন, —তুই এবার যেতে পারিস।

বান্দা চলে গেল। আলিকুলি বুলবুলের দিকে, বললেন—আশ্চর্য !

বুলবুল ক্লান্ত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, আজব দুনিয়া।

সফদর জঙ্গের প্রতি ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় বুলবুলের অন্তরটা দগ্ধ হতে থাকল।

সেই মুহূর্তে বুলবুল আর আলিকুলির মধ্যে যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা অবর্ণনীয়। সেই ভাব দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল গান্না। আসল বিপর্য্যয়ের সে কতটুকুই বা বোঝে, কিন্তু মা বাবার মধ্যে তার

যতটুকু প্রতিফলন সে দেখেছিল তাতেই যেন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কন্যার সেই ভয়চকিত অবস্থার দিকে চোখ পড়তে, বুলবুল হঠাৎ তাকে টেনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। বলল, খোদা মেহেরবান। খুব ভাল করেছেন। আল্লা মেহেরবান গাম্না, আল্লা মেহেরবান।

একটা দুর্বোধ্য রহস্যে কেবল হতবাক্ হয়ে থাকল গাম্না।

॥ নয় ॥

সাদী হল। জাঁক জমকও হল খুব। বাদশা খুসী হলেন। আমির খাঁও। ইশাকও অসন্তুষ্ট হলেন না। কিন্তু সফদর জঙ্গ আর সুজা? ওদের অন্তরের অবস্থা ওরা দুজনেই বুঝলেন শুধু। সফদর জঙ্গ দিল্লী সুদ্ধো আমিরদের নিমন্ত্রণ দিলেন। কিন্তু আলিকুলিকে ডাকতে পারলেন না। সফদর জঙ্গ বা সুজা কেউ তার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে পারলেন না। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হল সুজা। সাদী হবার পরও সে বুঝতে পারছিল না যে একটা স্বপ্ন না সত্য। তখনো তার সমস্ত স্মৃতি আর চেতনা জুড়ে ছিল গান্না। এবং সেই আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে সে বাহুকে দেখতেই পায়নি যেন। আর তা ছাড়া তার ভাববার ক্ষমতা সেই মুহূর্তে লোপ পেয়েছিল। এবং তাকে আরো বিভ্রান্ত করে দিয়ে ছিলেন সফদর জঙ্গ নিজে। বিবাহ শেষে যেন তিনি নিষ্ঠুর ভাবে আদেশ করেছিলেন সুজাকে, আর একমুহূর্ত দিল্লীতে নয় তুমি অযোধ্যা চলে যাও। তাঁর ভাবখানা এমন হল যেন সেই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী। হতবুদ্ধি সুজা কিচ্ছু বলবার অবকাশ পর্যন্ত পেল না যেন। সে বিনা প্রতিবাদে আব্বাজানের কথা মেনে নিল। না নিয়ে উপায় ছিল না, কারণ সফদর জঙ্গ রাশভারি লোক, তার কথা অমান্য করলে হয় তো পুত্রকেও ক্ষমা করবেন না তিনি। কিন্তু সেই মুহুর্তে সুজার দিল্লী ত্যাগ করে যাবার ইচ্ছা ছিল কি? একবার শেষ বারের মত আলিকুলির সঙ্গে দেখা না করে যাবার তার ইচ্ছে ছিল না। গান্নাকে আর একবার না দেখলে যে সে আজীবন অতৃপ্ত থাকবে! বুলবুল বেগমকে একথা অন্ততঃ জানিয়ে যাবার তার ইচ্ছে ছিল যে এটা তার অনিচ্ছাকৃত। হয়তো তার মনের মধ্যে একটু দুর্বল আশাও উঁকি দিয়ে থাকবে। হয় তো তখনো তার জানিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল যে, মুসলমান সমাজে এক বিবাহ তো শেষ নয়। সুতরাং....

তার নবযৌবনের আবেগে অন্য কিছু বিচার করবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু অনেক কিছুই বিচার করেছিলেন তার আব্বাজান সফদর জঙ্গ। সফদর জঙ্গও যে সুজার মনের গতির সন্ধান না রাখতেন তা নয়। এবং এই বয়সে আবেগে কোন পথে যেতে পারে তাও তিনি জানতেন। সেই মুহূর্তে আলিকুলি আর বুলবুলের সামনে সুজার যাবার অর্থ কি, এবং অতিথিকে তারা কেমন করে গ্রহণ করবেন সফদর জঙ্গ সব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করে দেখেছিলেন। যদিও আলিকুলিকে মৌখিক কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি, তথাপি গোপনে যে একটা কিছু ঘটেছিল তা অস্বীকার করা যাবে কি? সেই গোপন মনের দান করা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে নিজেকে যেন অপরাধী মনে করেছিলেন তিনি। তাই এই সাবধানতা। বিবাহের পর সুজাকে তিনি মুহূর্ত মাত্র বিশ্বাস না করে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সময় হলে তিনি নিজে যাবেন আলিকুলির কাছে, ক্ষমা ভিক্ষা করবেন। এবং একথাও ঠিক যাকে তিনি স্নেহ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছেন সেই গান্নাকেও সহজে ভুলতে পারবেন না। কিন্তু অন্ততঃ বর্তমানে তেমন কিছু করবার অবস্থা নেই। সুতরাং সুজাকে চলে যেতে হল। সাদী যে জীবনে অভিশাপ নিয়ে আসবে একথা ভাবতে পেরেছিল সুজা জীবনে? সাদী তার জীবনে বিপর্যয় নিয়ে দেখা দিল যেন। তাই নবপরিণীতা বধুকে নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করবার মুহূর্তে সে শুধু এক ফোঁটা চোখের জল আর একটা দীর্ঘশ্বাস রেখে গেল দিল্লীর জন্য।

অপর দিকে সফদর জঙ্গও আত্মপ্রবঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য রাজকার্যে মনোনিবেশ করলেন। দিল্লীতে তখন আমির-চক্রান্ত চূড়ান্তরূপ গ্রহণ করেছে। উজির কামরুদ্দিন সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে লেগেছেন আমির খাঁ আর ইরাণী দলের বিরুদ্ধে। এই নব বিবাহ কামরুদ্দিনকে আরো বিচলিত করে তুলেছে। ইরাণীদের রীতিমত ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছেন তিনি। এই সময় আমির খাঁর নিজের কতকগুলি ত্রুটি শুধু তাঁর নয়, ইরাণীদেরও বিপদ ঘনিয়ে নিয়ে

এল। সেই বিপদের চাপে নবনির্বাচিত মির অতিস সফদর জঙ্গও পদচ্যুত হবার উপক্রম হলেন। সুতরাং বাঁচবার জন্যই তিনি ক'মুদ্দিন রাজনীতিতে নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে থাকলেন।

আমির খাঁ একদিন অপমানিত হয়ে দিল্লী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এই অপমান তাকে করেছিল কামরুদ্দিন। কামরুদ্দিনের সাহস হয়ে ছিল তার ভাই নিজাম উলমুল্‌ক আসফ খাঁর জন্য। আসফ খাঁ তখন তাঁর বাহিনী নিয়ে সদলবলে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। আমির খাঁ তুরাণীদের কাছে মাথা নীচু করে ফিরে এসেছিলেন এলাহাবাদে। কিন্তু মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছিলেন, দিল্লীতে আবার তিনি ফিরবেনই। এটাও তিনি বুঝেছিলেন দিল্লীতে ফিরতে হলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন। কামরুদ্দিনের সাফল্যের কারণ, তার ভাই আসফ খাঁ, দাক্ষিণাত্যের সামরিক দক্ষতা সম্পন্ন সুবেদার। আমির খাঁরও অনুরূপ সমর্থন লাভের প্রয়োজন আছে। সেই সমর্থন তিনি পেলেন সফদর জঙ্গের কাছে। সফদর জঙ্গ সামরিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোক। উচ্চাকাঙ্খাও রয়েছে তার। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যের বিপদের দিনে তিনি সফদর জঙ্গকে নিয়ে দিল্লী ফিরলেন। সঙ্গে এল সফদর জঙ্গের সুশিক্ষিত দশহাজার সৈন্য বাহিনী। আসফ খাঁ তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যস্ত। দিল্লীতে আসা সম্ভব হল না তাঁর। তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিলেন আমির খাঁ। তুরাণীদের তিনি চোখ রাঙিয়ে শায়েস্তা করবার চেষ্টা করলেন। তাদের একের পর এক গুরুতর রাজপদ থেকে বরখাস্ত করতে লাগলেন। এমনি একটি ঘটনা সফদর জঙ্গের মিরঅতিস হওয়া। এর পর তিনি উজির কামরুদ্দিনের বন্ধু আওনা আর বানগড়ের সুবেদার আলি মুহাম্মদ খাঁ রোহিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাদশাহী ফৌজ পাঠালেন।

বাধ্য হয়ে নিজের দলের সম্মান এবং উজিরের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করবার জন্য সফদর জঙ্গও এতে যোগদান করলেন। অবশ্য নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত

নয়, কারণ সফদর জঙ্গ এই সাধারণ অভিযানের মধ্যে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। মির বকসি, তখন দাক্ষিণাত্যে অনুপস্থিত। তার প্রতিনিধি হিসেবে পুত্র গাজিউদ্দিন দিল্লীতে থাকেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা বিচার করে সফদর জঙ্গকেই দায়িত্ব দেওয়া হোল। সফদর জঙ্গই সম্রাটকে বুঝিয়ে এ ব্যবস্থা করলেন। উজির কামরুদ্দিনের সঙ্গে পরামর্শ পর্য্যন্ত করা হোল না, কারণ উজির আলিমুহম্মদ রোহিলার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তা ছাড়া বৈবাহিক সূত্রেও আত্মীয়তা ছিল দুজনের মধ্যে। কিন্তু উজির একথা যখন জানতে পারলেন, প্রকাশ্যে কিছু বললেন না। কিন্তু গোপনে যাতে সফদর জঙ্গের পরাজয় ঘটে তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। সফদর জঙ্গ একথা পূর্ব্বেই জানতেন। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে উজিরকে দিল্লীতে রেখে গেলে বিপদ। তাই তিনি স্বয়ং মুহাম্মদ শাহকে এই অভিযানে নাম মাত্র নেতৃত্বে স্বীকার করলেন। কারণ স্বয়ং বাদশা যদি যুদ্ধ যাত্রা করেন সৌজন্যের খাতিরেও উজিরকে তার সঙ্গে যেতে হবে। সুতরাং কামরুদ্দিনের দিল্লাতে থেকে কোন ক্ষতি করার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ অভিযান শেষ পর্য্যন্ত সফদর জঙ্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারল না। এটা একটা বিরাট অভিযান নয়। নাদিরের মত কোন দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ নয়। বাণগড়ের সামান্য একজন তালুকদারের বিরুদ্ধে এ অভিযান। কিন্তু সামান্য হলেও স্বয়ং বাদশা, উজির আর মির অতিসের পুরো তিন মাস লাগল এ বিদ্রোহ দমন করতে। প্রকৃত পক্ষে আলি রোহিলাকে অস্ত্র দিয়ে নয় বুঝিয়েই নতি স্বীকার করান হোল। ফলে সফদর জঙ্গ তথা মোগলদের দুর্বলতাই প্রকাশ পেল।

যুদ্ধকালে উজির কামরুদ্দিন একপ্রকার নিরপেক্ষই ছিলেন। তিনি নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে তার নিজের শিবিরে বসে থেকে সফদর জঙ্গের বিপর্য্যয় দেখতে লাগলেন।

দিল্লী থেকে বাণগড়ের দূরত্ব একশত দশ মাইল। কিন্তু এই পথ

অতিক্রম করতে দিল্লীবাহিনীর সময় লাগল তিন মাস। প্রথম থেকেই কতকগুলো অসুবিধে দেখা দিতে লাগল। ওরা যে রাস্তার মধ্যে বিরাট ঝড় উঠল। সেই ঝড়কে ছুতা করে আলি দিল্লীতে পালিয়ে আসলেন। ১৭ই মে, কাইম জঙ্গ—বাণগড় আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন কিন্তু তিন মাইল অগ্রসর হয়েই ফিরে আসলেন। অসহ্য উত্তাপ আর পানীয় জলের অভাবে তারা অগ্রসর হতে পারলেন না।

১৮ই মে, বাদশা বাহিনী বাণগড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে কুপ খনন করল, দেয়াল তুলল। এবং বুরুজ তৈরী করল। কিন্তু প্রকৃত আক্রমণ করা হোল না।

২০শে তারিখ দু মাইল লম্বা পরিখা খনন করা হোল। কিন্তু গোলা-গুলি বিনিময়ের পরেই মোগল আমিরেরা পরিখায় ফিরে আসলেন। অবশেষে শেষদিন রাত্রিতে বাণগড়ের রোহিলারাই বাদশাহী শিবির আক্রমণ করল। কিন্তু তারা ফিরে আসতে বাধ্য হল।

এর পর ধীরে ধীরে প্রকৃতি বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে যেতে লাগল। হিন্দুস্থানে বর্ষার পূর্বাভাব দেখা দিল। সুতরাং উজির কামরুদ্দিনকেই এগিয়ে আসতে হল বাদশার জন্য। তিনি তার ব্যক্তিগত প্রাধান্য খাটিয়ে আলিমুহম্মদকে সম্রাটের কাছে নতি স্বীকার করালেন। রোহিলা বলপূর্বক অধিকৃত জায়গীরগুলি ছেড়ে দিলেন। বাণগড়ের দুর্গ ভেঙে দিতেও তিনি রাজি হলেন। বাদশা তাকে চার হাজারী মনসবদার করে সারহিন্দে ফৌজদার করে পাঠালেন। কিন্তু তার দুই পুত্রকে দরবারে জামিন হিসেবে রাখা হল। দিল্লী বাহিনী দিল্লী ফিরে আসল। সফদর জঙ্গ প্রকৃত পক্ষে পরাজিতই হলেন।

আমির খাঁ কিন্তু তবু নতি স্বীকার করলেন না। তাঁর স্থির লক্ষ্য উজিরের পদ পাওয়া। তিনি বাণগড় অভিযানের পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ ভাবেই বলতেন যে মুহাম্মদ শা ফিরে আসলেই উজির হবেন। এই অভিযান ব্যর্থ হলেও তিনি দমলেন না। তিনি উজির পদের দিকে লক্ষ্য রেখেই এগিয়ে চললেন। তার ঔদ্ধত্য এতটুকু কমল না। মুহাম্মদ

শা ফিরে আসলে প্রকাশ্য দরবারেই তিনি এমন ব্যবহার করতে লাগলেন, যেন বাদশা তার হাতের পুতুল। বাদশার ব্যক্তিগত বন্ধু মহম্মদ ইশাককেই তিনি প্রকাশ্য দরবারে তিরস্কার করলেন। বাদশা নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন। আমির খাঁর ব্যবহার চরমে উঠল রজ আফজুনকে বরখাস্ত করা নিয়ে। প্রকাশ্য দরবারে আমির খাঁর ব্যবহার ভাল লাগেনি তার। একদিন সে তাই প্রতিবাদ করেছিল। রজ আফজুন ছিল বাদশার বিশ্বস্ত ভৃত্যদের মধ্যে অন্যতম। তৎক্ষণাৎ আমির প্রকাশ্য দরবারে তার বরখাস্তকরণ দাবী করলেন। এবং রজ আফজুনের বদলে তার নিজস্ব ভৃত্য রাখবার দাবী জানালেন। এ ব্যবস্থায় সম্মত হওয়া মানে সম্পূর্ণভাবে আমিরের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়া। বাদশা বিচলিত এবং অসন্তুষ্ট দুইই হলেন এবং আমির খাঁকে সরানো প্রয়োজন মনে করলেন। বাদশা রজ আফজুনকে নিয়ে পরামর্শ করলেন যে আমিরকে হত্যা করতে হবে। আমির খাঁর বিরুদ্ধে এই সময় অসন্তুষ্ট ব্যক্তিদের অভাব ছিল না। বাদশার প্ররোচনায় এবং আফজুনের প্রচেষ্টাতে আমির খাঁরই একজন ব্যক্তিগত বান্দাকে পাওয়া গেল। আমিরের উপর সে ভয়ানক ভাবে অসন্তুষ্ট ছিল। তাই ২৫শে ডিসেম্বর ১৭৪৬, খৃষ্টাব্দ আমির যখন দেওয়ানী-আমে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তাকে ছুরিকাঘাত করা হোল। আমির আর উঠতে পারলেন না। ইরাণীরা একটু ভীত হয়ে পড়ল। বাদশা কৃত্রিম বিষাদের ভান করলেন। চতুর সফদর জঙ্গ তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। তিনি নিজে সম্পূর্ণ সচেতন হলেন। কারণ তিনি জানতেন, আমিরের পর ইরাণীদলের নায়ক তিনিই। এবং তারই উপর উজির আর বাদশার ক্রোধ এসে পড়বে। এ ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে হলে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে চলতে হবে। সুতরাং ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁর যদি কোন ব্যক্তিগত সাধ আকাঙ্ক্ষা থেকেও থাকত, তা' পূরণ করবার কোন সম্ভাবনাই থাকল না। এই

বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আলিকুলির কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে ভোলেন নি। কিন্তু যাবার উপায় ছিল না। উপায় ছিল না দুটি কারণে। প্রথমতঃ তিনি নিজেকে আলিকুলি দম্পতির কাছে অপরাধী মনে করতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। ভাবছিলেন অবসর হলে নিশ্চয়ই দেখা করবেন। শুধু অবসর নয় সুদিনের অপেক্ষাও করছিলেন তিনি। তিনি তখনই দেখা করবেন যেদিন আলিকুলির জন্য কিছু একটা করতে পারবেন। কিন্তু আলিকুলির জন্য স্বাধীনভাবে একটা কিছু করতে হলে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

অপর পক্ষে আলিকুলিও বসেছিলেন না। তিনি এবং বুলবুল গান্নার ভবিষ্যতের জন্য নতুন করে তৈরী হচ্ছিলেন। ভবিষ্যতের যে প্রথম রঙিন স্বপ্ন তাঁদের আত্মজার জন্য তাঁরা দেখেছিলেন তা শেষ হল। আল্লা মেহেরবান। গান্নার মনের মধ্যে কোন ছায়াপাত করবার মত হয় নি তা। গান্নার যদি বয়েস হোত তবে হয়তো কাঁদতে হত তাকে। কিন্তু তখন সে কিশোরী। মদনের খেলা তখনো তার মধ্যে শুরু হয় নি। তাই গান্না রক্ষা পেল। যাতে ভবিষ্যতে গান্না আর কোনদিন বিপদের মধ্যে না পড়ে তারই জন্যে প্রস্তুত হলেন আলিকুলি আর বুলবুল।

আলিকুলি রাজকার্যে একজন মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও প্রথম শ্রেণীর ওমরাহদের মতন নন। বুলবুল কবিপত্নী হলেও প্রথম আমিরদের হারেমের বিবির সম্মান তাদের নেই। সেকথা যেন সফদর জঙ্গ আরো বেশী করে প্রমান করে দিলেন। সুজার সাদীতে দিল্লী শুদ্ধো গণ্যমান্য আমিরদের নাওয়াত হয়েছিল কিন্তু আলিকুলির হয়নি। কেন? সফদর জঙ্গের মনের কথাটা বিচার করবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ওরা ভাবলেন সম্ভবতঃ তাদের সামাজিক সম্মানের মানের নিম্নতার জন্যই তা হয়নি। এ অপমান। আবেগ পরিচালিত শিল্পীর মনের কাছে এ অপমান বড় বেদনাদায়ক ছিল। তাই আলিকুলি,

বিশেষ করে ঠিক করেছিলেন যে গান্নাকে এমন করে প্রতিপালন করতে হবে যে ভবিষ্যতে গান্নাকে যেন কেউ অমর্য্যাদা করতে না পারে। গান্নার রূপের অভাব নেই। বাদশা আমিরের হারেমেও এমন রূপসী খুঁজে পাওয়া ভার। অগ্নিতে যেমন হাওয়া যুক্ত হলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেমনি রূপের সঙ্গে গুণের সমন্বয় হলে তার আকর্ষণী ক্ষমতা বাড়ে। গান্নার মধ্যে সেই গুণের সমাবেশ করতে হবে।

মৌলভি হাফিজ মহম্মদ, আবার গান্নাকে সম্পূর্ণ ভাবে তার দায়িত্বের উপরই ছেড়ে দেওয়া হোল। বুলবুল নিজে তার নৃত্য ও সঙ্গীত শেখাবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। পিতামাতার চোখে অসীম স্বপ্ন। তাদের জীবনের অপরিপূর্ণ দিক পূরণ করবে গান্না।

॥ দশ ॥

ভারতবর্ষ থেকে শান্তি যেন বিতাড়িত হয়েছে। হিন্দুস্থানে আর শান্তি নেই। কে বলবে এই মোগল সাম্রাজ্য সেই মোগল সাম্রাজ্য, যার প্রতিষ্ঠাতা আকবর। দিল্লীর বাদশা নিজ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রাখতেও অপারগ। নাদির শা কি যে আঘাত দিয়ে গেলেন, সে ঘা সেরে দিল্লী যেন আর উঠতে পারল না। গভীর ক্ষত চিহ্নই এঁকে দিয়ে গেলেন না নাদির, তিনি হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে খুলে দিয়ে গেলেন। আর সেই পথে একের পর এক লুণ্ঠকেরা আসতে লাগল ভারতবর্ষে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ চিরকাল হিন্দুস্থানের অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছে। 'শক হুনদল পাঠান মোগল' এ পথেই ভারতবর্ষে এসেছে। মোগলদের পর আবার সেই সীমান্ত প্রদেশ খুলে গেল। নাদির শার ভারত আক্রমণের পর কাবুল, সুবা পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং সিন্ধু নদ এর পশ্চিমে অবস্থিত অংশটুকু তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এছাড়া তিনি শিয়ালকোট, গুজরাট, ঔরাঙ্গবাদ এবং শাশরুরের জন্য বাৎসরিক কুড়িলক্ষ টাকা পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এই কুড়িলক্ষ টাকার বিনিময়ে দিল্লীর বাদশা পারস্য আক্রমণের ভয় থেকে অব্যহতি পান। নাদির নিজে তৈমুরের বংশধর মোগলদের শ্রদ্ধার চোক্ষে দেখতেন। তৈমুরকে তিনি এতটা শ্রদ্ধা করতেন যে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার সময় তিনি তৈমুরের আত্মকাহিনীটিও সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক ঘুর্ণীবাত্যায় এতটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন যে, ধীরে ধীরে তিনি নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ হয়ে দাড়ান। এ অবস্থায়ও তিনি মোগল বাদশাদের মাঝে মাঝে উপহার পাঠাতেন। মোগল বাদশাও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চারটি মহলের জন্য নাদিরকে দেয় রাজস্ব নির্দ্ধারিত সময়ে পাঠিয়ে দিতেন।

কিন্তু নাদিরের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে পারস্যের আমিরেরা বিদ্রোহ করতে থাকে। এদের মধ্যে কিজিবাস বংশের আমিরেরা একদিন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই জুন মধ্যরাত্রে নাদিরকে তার শিবিরে হত্যা করেন। এই হত্যার পর ক্ষমতা গিয়ে পড়ে আহম্মদ শা আবদালির উপর। এই অবদালি বংশ ছিল হিরাতে। আহম্মদের পিতা ও প্রপিতামহ যুদ্ধে নিহত হলে আহম্মদ কান্দাহারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির কান্দাহার জয় করলে তিনি আহম্মদকে তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে নিয়ে যান। তিনি হিরাতের সমস্ত আবদালি বংশকেই হিরাণ থেকে কান্দাহারে নিয়ে স্থাপন করেন এর ফলে কান্দাহার আবদালিদের আবাস হিসাবে পরিচিত হয়। নাদির শাহের অধীনে কাজ করবার সময় আহম্মদ সুনাম অর্জন করেন এবং ক্রমশ তার প্রধান সেনাপতি হন। নাদির প্রকাশ্য দরবারেই তার প্রশংসা করে বলতেন "ইরাণ তুরান আর হিন্দুস্থানে আহমদের মত কর্ম আর চরিত্রবান লোক আমি দেখনি।" গল্প আছে একদিন নাদির যখন সান্ধ্য অবসর যাপন করছিলেন আহম্মদ তাঁর পাশে দাড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ নাদির চিৎকার করে তাকে আরো কাছে ডাকলেন, আহম্মদ আবদালি, কাছে এস। আহম্মদ সম্মানের দুরত্ব বজায় রেখে নাদিরের কাছে এলেন। নাদির বললেন, আরো কাছে এস। আহম্মদ আরো কাছে এলে নাদির বললেন, মনে রেখ আমার মৃত্যুর পর তুমি শাহ হবে। তখন আমার পরিবারকে তুমি যত্ন করো।

ভয় পেয়ে আহম্মদ বলেছিলেন, আমার জীবনের প্রয়োজন হয় যদি বলুন। আমাকে হত্যা করতে চান, আমি হাজির। আপনি কেন একথা বলছেন ?

নাদির তেমনই আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, আমি জানি তুমি একদিন সম্রাট হবে। তখন আমার পরিবারকে দেখো।

নাদিরের কথা মিথ্যা হয়নি।

নাদিরের মৃত্যুর পর আহম্মদ কিজিবাসদের আক্রমণ থেকে

আবদালি অনুচরদের রক্ষা করেন। তিনি তাদের নিয়ে কান্দাহারের দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে আফগানরা আহম্মদকে তাদের সেনাপতি নির্ধারিত করে। কান্দাহার পৌঁছে আহম্মদ নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করেন। কান্দাহারে কিছুদিন কাটিয়ে নাদির আফগানিস্থান জয় করবার জন্য আসেন জয়ও করেন। কাবুল থেকে তিনি পেশোয়ারে অভিযান প্রেরণ করেন। পেশোয়ার রক্ষার দায়িত্ব ছিল নাসির খানের। আবদালি বাহিনী থেকে তিনি পেশোয়ার ত্যাগ করে লাহোরে পালিয়ে আসেন। আবদালি বাহিনী পেশোয়ারে এসে হিন্দুস্থান আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হন। লাহোরের দিল্লীর বাদশার সীমান্ত প্রহরী ছিলেন হায়াতুল্লা তিনি তৎক্ষণাৎ রাভি নদীর তীরে আহম্মদকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এবং বাদশা মুহাম্মদশাহ আবদালিদের কথা জানিয়ে আরো সাহায্য প্রেরণের জন্য লিখে পাঠালেন। কিন্তু বাদশা মুহাম্মদ শাহ দুর্ভাগ্য বশত কোন সাহায্য পাঠালেন না। ফলে আহম্মদ শাহ অধিকার করে নিলেন। লাহোর জয়ের পর গর্ব্বস্ফীত আহম্মদ দিল্লী আক্রমণের উদ্দেশ্যে সারহিন্দের পথে বারো হাজার সৈন্য দলের এক বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন।

আহম্মদের এই আক্রমণের মুখে দিল্লীর বাদশা কিন্তু নিতান্ত লজ্জাকর মনোবৃত্তির পরিচয় দিলেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই, বাদশা মুহাম্মদ শা, আবদালির কথা জানতে পেরে ছিলেন।

আহম্মদ লাহোরের পথে আসছে শুনেও তিনি দ্রুত ব্যবস্থা করতে পারলেন না। অগ্রবর্ত্তী একটি বাহিনীকে নামমাত্র লাহোরের পথে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি স্বয়ং যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তিনি নিজে ১৪ই ডিসেম্বর, অর্থাৎ অগ্রগামী বাহিনীর তিনসপ্তাহ পর দিল্লী ত্যাগ করবেন স্থির করলেন। দীর্ঘ ২৮ বছর বাদশা থাকাকালিন মুহাম্মদ শাহ কদাচিৎ দিল্লী ছেড়ে দূরে গিয়েছেন। বিলাস আর আলস্যেরই জীবন ছিল তাঁর। সুতরাং তিনি টাল বাহানা করে দেরী করতে

লাগলেন। ইতিমধ্যে অসুস্থই হয়ে পড়লেন। হেকিমের পরামর্শে নড়াচড়া বন্ধ হল তার। সমস্যা দেখা দিল, অভিজ্ঞ সেনাপতিরা বললেন, বাদশা স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রা করুন। অনভিজ্ঞ যারা তাঁরা আহম্মদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে বললেন, আহম্মদকে তাড়াবার জন্য মহামান্য বাদশার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন নেই। যে কোন একক আমীরের পক্ষেই যথেষ্ট।

অভিজ্ঞ উজির কামরুদ্দিন বললেন, বাদশার স্বয়ং যাওয়াই শ্রেয়। তিনি যদি যুদ্ধক্ষেত্রে নাও যেতে পারেন অন্ততঃ পাণিপথ কিম্বা কার্নালে থেকে যুদ্ধের তদারক করা আবশ্যক।' বাদশা এ প্রস্তাবে গর রাজি হলেন না। কিন্তু নানা অজুহাতে তিনি যুদ্ধ যাত্রার দিন পিছিয়ে দিতে লাগলেন। ২২শে ডিসেম্বর বাদশা জানতে পারলেন যে আহম্মদ পেশোয়ার থেকে লাহোর আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ফলে ৬০ লক্ষ টাকা ব্যায় করে বাদশা উজির কামরুদ্দিনের অধীনে এক বাহিনী পাঠালেন লাহোরের দিকে। সঙ্গে গেলেন সফদর জঙ্গ, ঈশ্বরী সিংহ, আমির খান। অবশেষে বাদশা বাহিনী দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে যাত্রা করল আহম্মদের বিরুদ্ধে। দিল্লী থেকে ১৬ মাইল উত্তরে নারেলা পৌঁছেই উজির শুনতে পেলেন যে, আহম্মদ লাহোর দখল করেছেন। তিনি এতটা ভয় পেয়ে গেলেন যে আর অগ্রসর না হয়ে বাদশাকে শাহজাদা আহমদকে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে পাঠালেন। উপায়ন্তর না দেখে বাদশা রাজি হলেন। ৩১শে জানুয়ারী শাহজাদা আহমদ দিল্লী থেকে রওনা হলেন। সোনা পাথর ঘাটে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি কার্ণাল অতিক্রম করে সারহিন্দের দিকে গেলেন। সেখানে লুধিয়ানার কাছে নদী অতিক্রম না করতে পেরে, সারহিন্দ ও লুধিয়ানা সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে বাদশাহী ফৌজ মাদ্দিয়ারার কাছে নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলেন।

অপর পক্ষে আবদালিরা ১৯শে ফেব্রুয়ারী লুধিয়ানার কাছে সাতলেজ (শতদ্রু) অতিক্রম করে সারহিন্দে পৌঁছুলেন এবং দুর্গ দখল করে নিলেন।

সারহিন্দের সংবাদ ২রা মার্চ এসে শাহজাদা আহমদের শিবিরে পৌঁছুল। কিন্তু উজির কামরুদ্দিন সহসা এ সংবাদে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি সঠিক সংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে সুযোগের অপব্যবহার করলেন তিনি। সংবাদ পৌঁছুলে হিন্দুস্থানী আমীরেরা একটা ভয় পেলেন যে, যুদ্ধ না করেই সরে পড়তে চাইলেন। শাহজাদা আহমদ দ্রুত ফিরে চললেন সারহিন্দের দিকে এবং মানুপুরের কাছে তাঁর ছাউনি ফেললেন। আহম্মদ আবদালিও কাছেই অবস্থান করছিলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ। ১১ই মার্চ। সকাল বেলা যুদ্ধ আরম্ভ হোল। উজির হাতীর পিঠে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল। ফৈজিরের নামাজ শেষ করে কেবল তিনি উঠতে যাবেন এমন সময় শত্রু পক্ষের কামানের গোলাতে তিনি ভয়ানক ভাবে আহত হলেন। আঘাত সাংঘাতিক হল। মৃত্যুপথ যাত্রী উজির তার পুত্র মৈনুদ্দিনকে ডেকে বললেন, আমার শেষ সময়। তুমি বাদশার পাশে দাড়াও। আমার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার আগেই তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাও। যুদ্ধ শেষ না করে ফিরো না। আমার কথা পরে ভাববে।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে মুইন তৎক্ষণাৎ পিতার আদেশ রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করলেন।

উজিরের মৃত্যু প্রকৃত পক্ষে সফদর জঙ্গের সৌভাগ্যের পথ প্রশস্ত করল। এবার তিনি হবেন উজির। ভাগ্য তাঁর প্রতি আরো সুপ্রসন্ন হল যখন তিনিই এ যুদ্ধ উজিরের মৃত্যুর পর মুখ্য ভুমিকা গ্রহণ করলেন। মুইনের পাশে সফদর জঙ্গের বন্দুক ধারী সেপাহিরা এমন প্রচণ্ড ভাবে আফগানদের আক্রমণ করল যে—আবদালিদের পালাবার পথ থাকল না। রাত্রির অন্ধকারে তিন হাজার সঙ্গী নিয়ে আহম্মদ আবদালি রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। লাহোর গেলেন তিনি। দুদিন পর বিজয়ী বাদশা বাহিনী তাকে অনুসরণ করে চলল লাহোরের দিকে। কিন্তু পথি মধ্যে শাহজাদা আহমদ, বাদশা মুহাম্মদ

শাহের কাছ থেকে দ্রুত দিল্লী ফেরবার আদেশ পেলে—তিনি আর অগ্রসর হতে পারলেন না। সংবাদ পাবা মাত্র শাহজাদা মুইনকে লাহোর এবং নাসির খানকে কাবুলের সুবেদার নিযুক্ত করে ১২ই এপ্রিল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দিকে ফিরলেন। শাহজাদার সঙ্গে ফিরলেন সেনাপতি সফদর জঙ্গ। পাণিপথের কাছে এসে যখন শিবির গড়লেন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সংবাদে চমকে উঠলেন। বাদশা মুহাম্মদ শাহের মৃত্যু হয়েছে। সফদর জঙ্গ শাহজাদার দেহ রক্ষী। তিনি আর বিলম্ব করলেন না। তৎক্ষণাৎ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তৎক্ষণাৎ শাহজাদা আহমদকে তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে বাদশা বলে ঘোষনা করলেন—"জাহাপনা আমি আপনাকে বাদশা হিসেবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

তরুণ বাদশাও সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন সফদর জঙ্গকে। বললেন, জনাবকেও আমি উজির বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আহমদ শা তৎক্ষণাৎ সফদর জঙ্গকে উজির বলে গ্রহণ করলেন। কিন্তু উজিরের পদ সহজ নয়। অনেক প্রতিযোগী আছে। সর্বপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিযোগী হল দাক্ষিণাত্যের নিজাম আসফ খাঁ। সুতরাং গৃহযুদ্ধের ভয়ে সফদর জঙ্গের নতুন নিয়োগকে সাময়িক ভাবে গোপন রাখা হোল। নতুন বাদশা আর তার উজির এলেন হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীতে।

॥ এগার ॥

ইতিহাস জাতি, দেশ, জাতির প্রতিনিধিকে নিয়ে আলোচনা করে। তার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু যে একক ব্যক্তি, জাতি ও সমষ্টিকে গঠন করে, ইতিহাস তার কথা লেখবার সময় পায় না। কিন্তু ইতিহাসে সে কথা লিপিবদ্ধ না হলেও ব্যক্তি-জীবন রুদ্ধ হয়ে থাকেনা। সে তার আপন পথেই চলতে থাকে। তাই পতনোন্মুখ বাদশাহী সাম্রাজ্যের চতুর্দিকে রাজনৈতিক বিপর্য্যয়, যুদ্ধের উন্মাদনা, ষড়যন্ত্রের করাল ছায়ায়ও আলিকুলি বুলবুল আর গান্নার জীবন থেমে থাকেনি। রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হলেও এই যুদ্ধ বিগ্রহের বাইরে তাদের স্বতন্ত্র জীবনের স্বাদ আছে। পৃথক ধ্যান ধারণা আছে। কবি দম্পতি আলিকুলির সে পৃথক স্বপ্ন তাদের একমাত্র কন্যা গন্নাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছিল। তিন বছর আগে সফদর জঙ্গের স্নেহের ছায়ায় তারা গান্নাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার বিবাহ তাদের সে স্বপ্নকে ছিড়ে দিয়েছে। শুধু ভাগ্যের কথা, সে ব্যথা গান্নার বুকে বসতে পারেনি। কারণ গান্না তখনও ছোট কিশোরী মাত্র। সেই গান্না আজ পঞ্চদশী হতে চলেছে। কুঁড়ি, শতদল মেলে বিকশিত হচ্ছে যেন। সেদিন সুজা যাকে দেখেছিল সে অনাঘ্রাত মুদ্রিত কলি গান্না কিন্তু আজ প্রস্ফুটিত। আজ সে গন্ধ বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে। এ গান্নাকে নিয়ে আজ আলিকুলি আর বুলবুলের নতুন স্বপ্ন।

মৌলভি হাফিজ রহমত। গান্নাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। মুসলমান জাতের সমস্ত সংস্কৃতি তিনি সমাবেশ করেছেন আলিকুলির আদরের কন্যার মধ্যে। তিনি দেহে জীবনের সঞ্চার করেছেন। পুষ্পে আঘ্রাণ যুক্ত করেছেন। গান্না আজ বিদূষী রমণী। শুধু এই নয় জ্ঞানের উপর প্রতিভা যুক্ত হয়েছে। আলিকুলির কবি প্রতিভার উত্তরাধি-কারিনী হয়েছে গান্না। সে নিজে কবিতা রচনা করতে পারে। দোঁহা

গাঁথে। সে দোঁহায় সুর সংযোজনা করতেও সে শিখেছে তার মার কাছ থেকে। বুলবুল দিয়েছে তাকে সুকণ্ঠ। শুধু কণ্ঠ নয়, ছন্দ দিয়েছে তাকে। নাচতে জানে গান্না। বিদ্যা, বুদ্ধি, শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে গান্নার মধ্যে। হিন্দুস্থানে এমন অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অপূর্ব গুণের সমাবেশ আর নেই।

গান্না তার পিতামাতার গৌরব। পিতামাতার তৃপ্তি। কিন্তু তাঁদের চিন্তারও কারণ। এইযে রূপ, এইযে গুণ, এইযে শিল্প, তাকে কোন্ পাত্রে অর্পণ করবেন তাঁরা ?

আলিকুলি বললেন, একমাত্র পাত্র শাহজাদা আহমদ।

বুলবুল বলল, আহমদ লম্পট, দুর্বল, ভীরু, মুর্খ। গান্নার পদনখকনার যোগ্য নয়।

—তবে এ হিন্দুস্থানে আর যোগ্যতম ব্যক্তি কে আছে ?

কে আছে সেকথা আর বলতে পারেনা বুলবুল, থেমে যায় সে। নীরব হয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনা নেত্রে ভেসে উঠে সুজার মুখখানা। বড় আশা করেছিল সে। কিন্তু না, তৎক্ষণাৎ এক যন্ত্রণা মোচড় খেয়ে উঠে বুকের মধ্যে। সফদর জঙ্গের বিশ্বাস ঘাতকতার কথা মনে পড়লে ক্রোধে দিশেহারা হতে হয়।

তার নীরবতা দেখে আবার প্রশ্ন করেন আলিকুলি, কই বল, কে হবে তবে গান্নার তুলা ?

—খুঁজে বের করতে হবে।

—কি রকম ?

বুলবুল বলে, সে জ্ঞানী হবে, গুণী হবে, বীর হবে। বাদশা আমীর দের মধ্যে কেউ হবে নিশ্চই।

আলিকুলি ঠাট্টা করে বলে, বাদশা আহমদকে তো তোমার পছন্দ নয় ? তবে বাদশার আশা নিশ্চয়ই ছাড়তে হোল।

—কেন ?

—শাহজাদা আহমদই তো বাদশা হবেন।

বুলবুল বলে, অন্য কেউ তো হতে পারে ?

ঠাট্টা করেন আলিকুলি, বাদশা কেন সামান্য ঘরের মেয়ে নেবেন বল ?

—কিন্তু মেয়ে তো আমার সামান্য নয়! গান্নার মত হিন্দুস্থানে কে আছে বল ?

সে গৌরব আলিকুলিরও, তিনিও তাই ভাবেন। তাই তো তাঁর চিন্তা। আলিকুলি তাই আর কথা বলেন না। সফদর জঙ্গের কথা, সুজার কথা মনে পড়ে তার। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি বলেন,—তাই তো ভাবছি কে নেবে আমার গান্নাকে।

বুলবুল বলে, সে নিশ্চই আসবে। আল্লা পাঠাবেন তাকে। তুমি দেখে নিও, গান্না আমার হিন্দুস্থানের প্রধানা বেগম হবে। আমরা অন্যায় করিনি, পাপ করিনি। আমাদের স্বপ্ন ব্যর্থ হবেনা। গান্নার সুখ হবে। গান্না খানদানি বংশে যাবে। গান্নার নাম সারা হিন্দুস্থানে ছড়াবে।

বুলবুলের সে স্বপ্নকে অলক্ষ্যে বিধাতা কি ভেবেছিলেন কে জানে। বিধাতা যাই ভাবুন তিনিই জানেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আলিকুলি আর বুলবুল জানতে পেরেছিলেন একটি কথা, একটি সংবাদ। সে সংবাদ বাদশার মৃত্যুর সংবাদ। শাহজাদা আহমদের বাদশা হবার সংবাদ। তারো বেশী সফদর জঙ্গের উজির হবার সংবাদ। শুনে প্রথমটা খুবই উল্লাসিত হয়েছিলেন আলিকুলি। বলে উঠেছিলেন, আল্লা মেহেরবান।

তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেছিল বুলবুল, কেন ?

—আমাদের খাঁ সাহেবের ভাগ্য ফিরল।

একটা নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলেছিল বুলবুল, খাঁ সাহেবের ভাগ্য কি ফেরা উচিত ?

যেন আহত হয়েছিলেন সরল আলিকুলি, বলেছিলেন, ভুলে যাও সে কথা। খাঁ সাহেবতো নিজে খারাপ লোক নন। তা ছাড়া

তিনি আমাদের সঙ্গে কথার খেলাপ করেন নি। তিনি তো কোন কথা দেননি আমাদের।

সেটাইতো আরো যন্ত্রণার। কথা না দিয়ে যে মনে মনে স্বপ্নের সৃষ্টি করা, তাইতো আরো ব্যথার। এর চেয়ে কথা দিয়ে কথা খেলাপ করলেও বুঝি ভাল করতেন সফদর জঙ্গ। দীর্ঘ দিন তিলে তিলে রচনা স্বপ্নকে এমন ভাবে ধুলিসাৎ হতে হত না। বুলবুল চুপ করে থাকে।

সফদর জঙ্গ আবার বলেন, খাঁ সাহেবকে গিয়ে একদিন অভিনন্দন জানিয়ে আসতে হবে।

এবার বুলবুল জবাব দেয়—, না।

—কেন ?

—তিনি আমাদের প্রতারণা না করতে পারেন, কিন্তু তিনি আমাদের অসম্মান করেছেন।

—কি রকম ?

—তিনি সুজার সাদিতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন নি।

হ্যাঁ, সেকথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন আলকুলি। আবার মনে পড়ে গেল। ঠিকই, এটা সফদর জঙ্গ অন্যায়ই করেছেন। সে ঘটনার পর থেকে সফদর জঙ্গের কাছে আর যাওয়া যেতে পারে না। সুজার বিয়েতে সমস্ত দিল্লী নগরী নিমন্ত্রিত হয়েছিল, শুধু হয়নি আলিকুলি। কেন ? তিনি পতিত ? মর্য্যাদায় ছোট ? কিন্তু পতিত হবার তো কথা নয়। তিনি পারস্যের অভিজাত বংশের ছেলে। রাজনৈতিক মর্য্যাদায়ও তিনি অন্যান্য আমীরদের চেয়ে খুব ছোট নন। তবে ? বুলবুলকে সাদি করবার জন্য এমন হয়েছে নাকি ? বুলবুল নর্ত্তকী। দশজনের মনোরঞ্জন করা ছিল তার ব্যবসা। তাকে গৃহে স্থান দিয়েছেন বলে কি আলিকুলি সমাজচ্যুত হয়েছেন ? কিন্তু সে কথা যদি সত্য হয়, তবে মৃত বাদশা মুহাম্মদ শাও তো সমাজে ঠাঁই পাবার যোগ্য নন। তার হারেমের প্রধান বেগম সেও তো নর্ত্তকী ছিল। আর আজ তিনি নতুন বাদশা হলেন, তাঁরই বা মর্য্যাদা

কোথায় থাকে, তিনি তো উধম বাঈয়ের পুত্র। হিন্দুস্থানের সর্ব প্রথম মহিলা আজ, বাদশা জননী উধম বাঈ। সুতরাং নর্ত্তকীকে সাদি করার জন্য তার অপরাধ হতে পারে না। তবে? এটা অবশ্য সমস্যার মতন মনে হল তার কাছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এ সমস্যার কোন মীসাংসা হয়নি।

সেকথা মনে করেই বুলবুল বলল, বল, যদি তিনি মনে মনে কোন অন্যায়ই না করে থাকেন তবে, একমাত্র আমাদেরই তাঁর পুত্রের বিবাহে বাদ দেবেন কেন?

আলিকুলি বললেন, জানিনা, আল্লা জানেন। একমাত্র আল্লা আর সফদর জঙ্গ ব্যতীত একথার উত্তর আর কেউ জানেনা।

হ্যাঁ, সফদর জঙ্গ জানেন। এবং এ কাজের কৈফিয়ৎ তিনি একদিন দেবেন বলেই ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু যোগ্য সময় না হলে বলা যায় না। এই দীর্ঘদিন সফদর জঙ্গ যে আলিকুলির পরিবারকে একেবারে ভুলে ছিলেন, তা নয়। যুদ্ধ, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের মধ্যেও তাঁর মনে বারে বারে উকি দিয়েছে একটি সুকোমল মুখ। সে মুখকে নিয়ে তিনিও কি কম স্বপ্ন দেখেছিলেন! তাঁরও কি কম আশা ছিল? সে স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ায় তার মনের মধ্যেও ব্যথা কি কম? সে স্বপ্ন ভঙ্গের জন্য দায়ী কে? সফদর নিজে তো নন! কিন্তু সে কথা বুলবুল জানে না। আলিকুলি জানে না। সুজার সাদিতে দিল্লী নগরী নিমন্ত্রিত হয়েছিল, হয়নি শুধু আলিকুলি খাঁ। তাঁরা কি ভেবেছেন ওরা জানে না। কিন্তু সফদর জঙ্গ তো জানতেন এর কারণ সামাজিক নয়, কারণ মানসিক। দিল্লী নগরীতে সবচেয়ে যাকে তিনি ভালবাসতেন তাঁকে না নিমন্ত্রণ করা অপরাধ। সফদর জঙ্গ জানেন তার অপরাধ হয়েছে। কিন্তু এ অন্যায়ের উত্তরও তিনি একদিন দেবেন একথা তিনি জানতেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা করেছিলেন। আজকে তাঁর সেই সময় হয়েছে। সফদর জঙ্গ আজ যুদ্ধ বিজয়ী। নতুন বাদশা তাঁর হাতের পুতুল। হিন্দুস্থানের উজির তিনি। বাদশার পর তিনিই তার প্রথম

মাননীয় ব্যক্তি। আজ ইচ্ছে করলে মোগল সাম্রাজ্য কেটে তরমুজের মত টুকরো টুকরো করে বিক্রি করতে পারেন। তাই দিল্লী ফিরে তিনি ঠিক করেছেন যে, তার প্রিয়তম ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম দেখা করবেন। রাজধানীতে ফিরে প্রথম যে কাজ তিনি করেছিলেন তা তাঁর প্রিয়তম ব্যক্তির উন্নতির জন্যই। তিনি বাদশাকে দিয়ে তার পদোন্নোতি ঘটিয়েছিলেন। মিরতুজুক থেকে তার উন্নতি হল। জাফর জঙ্গ পদবী থেকে তিনি 'খান-ই-জামানে' উন্নীত হলেন। সেই সুসংবাদ নিয়ে দিল্লী ফিরেই তিনি দেখা করতে এলেন পুরাতন প্রিয়পাত্র আলিকুলির সঙ্গে।

সেই মুহূর্তে সফদর জঙ্গের কথা নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল বুলবুল আর আলিকুলির মধ্যে। দীর্ঘ তিনবছরেও সফদর জঙ্গকে তারা ভুলতে পারেনি। সফদর জঙ্গের অযাচিত ভালবাসা, আবার হঠাৎ অবজ্ঞা, তাদের কাছে রহস্য হয়ে ছিল এতদিন। তখনো সেই রহস্যের কথা ভাবছিলেন আলিকুলি। হঠাৎ বান্দা এসে খবর দিল—উজির সাহেব দেখা করতে এসেছেন আপনার সঙ্গে।

হঠাৎ 'উজির সাহেব' কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলেন আলিকুলি। সেই মুহূর্তে তার মানস চক্ষে যে মূর্তি ফুটে উঠেছিল তা উজির কমরুদ্দিনের। কিন্তু আহম্মদ আবদালিকে বাধা দিতে গিয়ে তিনি তো প্রাণ দিয়েছেন। হঠাৎ যেন নবনিযুক্ত উজির সফদর জঙ্গের কথা মনে করতে পারলেন না তিনি। নিসঃন্দেহ হবার জন্য তাই জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে ?

—উজির সাহেব।

—উজির সাহেব !

—হ্যাঁ উজির জনাব সফদর জঙ্গ বাহাদুর।

যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলেন তিনি এতক্ষণে। পুরানো বাদশার মৃত্যু হয়েছে, পুরানো উজিরেরও। এখন নতুন বাদশা, নতুন উজির। একথা যেন খেয়ালই ছিল না তাঁর।

সফদর জঙ্গের নাম শুনে ভ্রূকুঞ্চিত হল বুলবুলের। আলিকুলি খাঁও কিছুটা চমকে গেলেন যেন। এতদিন পরে হঠাৎ কেন তিনি! কিন্তু …………উঠে দাঁড়ালেন আলিকুলি। বুলবুলের চোখের দিকে তাকালেন। বুলবুল বলল, যাও, উজির যখন—অভ্যর্থনা করতেই হবে। আলিকুলি সদরখানার দিকে আসলেন। সফদর সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম জানালেন তিনি আলি কুলিকে। 'আলিকুম্ সেলাম' আলিকুলি তার অতিথিকে স্বাগত জানালেন, তা, এ বান্দাকে তলব করলেই তো পারতেন জনাব! আপনি কষ্ট করে কেন এলেন?

সফদর জঙ্গ মধুর হেসে বললেন, প্রিয় ব্যক্তির তলব করতে নেই। তার কাছে নিজেকেই আসতে হয়।

বিনীত ভাবে বললেন আলিকুলি, জনাবের মেহের বানী।

সফদর জঙ্গ এবার আলিকুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, কবি নিশ্চই এ কয়দিন হিন্দুস্থানের রাজনৈতিক খবর রেখেছ?

সফদর জঙ্গ কি বলতে চান, তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন আলিকুলি। বললেন,—জানি জনাব। আমরা আনন্দিত যে আপনি উজির হয়েছেন। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

উজির বললেন, তুমিও আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর। বাদশা আহমদশা তোমাকে 'খান-ই-জামান' করছেন।

নত হয়ে বাদশার উদ্দেশে কুর্নীস জানাল আলিকুলি। সফদর জঙ্গ আলিকুলিকে পাশে বসিয়ে বললেন, অনেক দিন পর দেখা, না?

উত্তরে একটু অভিমানের সুর ফুটে উঠল আলিকুলির। বলল, খোদাবন্দের মর্জি।

সফদর জঙ্গ একটু ম্লান হাসলেন, বললেন, জানি তোমরা অভিমান করেছ। সেই অভিমান ভাঙাতেই তো এসেছি আমি আজ! আজ তোমাদের সব কথা বলব। মনে রেখ, এই দীর্ঘ দিন একদিনও আমি তোমাদের ভুলতে পারিনি।

—জনাবের মেহের রানী।

—কিন্তু এই দীর্ঘ দিন মুহূর্তের জন্য তোমাদের ভুলতে না পারলেও কেন যে তোমাদের সঙ্গে দেখা করিনি, তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি।

—কৈফিয়ৎ! সে কি জনাব! আপনি কৈফিয়ৎ দেবেন কেন? আমরাই কসুর করেছি। আপনি কোন অন্যায় করেন নি।

সফদর জঙ্গ গম্ভীর ভাবে হাসলেন। বললেন, না আমিই অন্যায় করেছি। আমি কথার খেলাপ করেছি।

—সে কি জনাব, আপনি কোন্ কথার খেলাপ করলেন?

—তোমরা জাননা। কিন্তু মনে মনে আমি তোমাদের কথা দিয়েছিলাম, আমি গান্নাকে…………

সফদর জঙ্গের মনের কথা আলিকুলিদেরও কথা। সুতরাং তিনি কি বলতে চান বুঝে নিয়ে আলি বললেন, যাক্, জনাব। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর দুঃখ করে লাভ নেই।

সফদর জঙ্গ বললেন, না, আমাকে বলতে হবে। একথা এতদিন বলবার জন্যই আমি মনে মনে পুষে রেখেছি। শোন আমি স্বইচ্ছায় তোমাদের দূরে রাখিনি। বাধ্য হয়ে তোমাদের কাছে কথা রাখতে পারিনি।

আশ্চর্য হয়ে আলিকুলি তাকালেন সফদর জঙ্গের দিকে, মানে?

—মানে, সুজার সাদি আমি দিতে বাধ্য হয়েছি।

বুঝতে না পেরে সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন আলিকুলি।

সফদর জঙ্গ সব কাহিনী ভেঙে বলতে লাগলেন। বললেন, শোন এ সাদির জন্য দায়ি বাদশা মুহাম্মদ শা আর আমির খাঁ। ইরাণীদের দলপুষ্ট করবার জন্য তারা এ ব্যবস্থা আমাকে না জানিয়েই করেছিলেন। হঠাৎ তারা আমাকে গোপন বৈঠকে ডেকে এমন ভাবে আদেশ করলেন যে, আমার আর অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। কিন্তু…………

একটা সমবেদনার ভঙ্গী নিয়ে সফদর জঙ্গের দিকে তাকালেন

আলিকুলি। সফদর জঙ্গ বলতে লাগলেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সাধ আহ্লাদ কি কিছুই ছিল না? আমি কি আমার পুত্র বধূ........। কি একটা আবেগে যেন কিছুকাল কথা বলতে পারলেন না সফদর জঙ্গ। কিছুটা থেমে তার পর আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু সে যাই হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—কথার খেলাপ আমি করেছি।

বাধা দিলেন আলিকুলি, কার কাছে কথার খেলাপ করলেন?

দৃষ্টির মধ্যে কি একটা বিহ্বলতা নিয়ে সফদর জঙ্গ তাকালেন আলিকুলির দিকে, তারপর বললেন, তোমার কাছে।

—আমার কাছে!

—হ্যাঁ। সে কথা না বললেও তুমি জান। তোমার গান্না বানুকেই আমি চেয়েছিলাম।

এবার আলিকুলি আর কোন কথা বললেন না। সফদর জঙ্গ বললেন,—নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হল। তাই মনে মনে ঠিক করলাম এ মুখ আর তোমাকে দেখাব না, যদি না তোমার জন্য কিছু করতে পারি। শুধু সেই কারণেই—আমার একমাত্র পুত্রের সাদিতে দিল্লীর সকলকে নিমন্ত্রণ করলেও তোমাকে করা হয়নি। আমি জানি, তা তোমাকে এবং আমাকে ব্যথা দিত। নিমন্ত্রণ না করে তোমাকে যতটুকু না অপমান করেছি, নিমন্ত্রণ করলে তার চাইতেও বেশী অপমান বোধ করতে তুমি।

একটু বিনয় দেখাবার চেষ্টা করল আলিকুলি, না, না।........

সফদর জঙ্গ বললেন, তুমি না না করলে কি হবে, আমি বুঝতে পারি। আমার বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে। সে যাই হোক সেই থেকে মনে মনে ঠিক করেছিলাম—তোমার জন্য কিছু না করতে পারলে তোমাকে আর মুখ দেখাব না। আজ সেই দিন এসেছে।

সঠিক বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল শুধু আলিকুলি খাঁ।

সফদর জঙ্গ বললেন, আজ আমার সে ক্ষমতা এসেছে, আজ আমি মোগল সাম্রাজ্যের উজির। আমার ইচ্ছা মত অনেক কিছুই হতে

পারে। আমি তোমাকে—খান-ই-জামান নিয়োগ করেছি। নত হয়ে সালাম জানালেন আলিকুলি, জনাবের মেহের বানি।—

মেহের বানি নয়। আমি যে অন্যায় করেছিলাম, তার কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র।

হঠাৎ এই সময় সফদর নিতান্ত আবেগ ভরেই যেন একটি কাজ করে ফেললেন। আলিকুলির দুটো হাত ধরলেন তিনি, আমাকে মাপ কর ভাই।

আলিকুলি কি করবেন ভেবে পেলেন না যেন। লজ্জায় আরক্ত হয়ে বললেন,—আমাকে শুধু শুধু লজ্জা দেবেন না জনাব।

সফদর জঙ্গ তার হাত ছেড়ে দিলেন। দুইয়ের মধ্যে কিসের একটা প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকল যেন। কিছু সময়। সফদর জঙ্গ একটা জড়িত ভঙ্গিতে বললেন, আমার আম্মাকে কি একবার দেখতে পারি না?

উজিরের হৃদয়টা একমুহূর্তে যেন আন্দাজ করে নিয়ে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

আলিকুলি তৎক্ষণাৎ হারেমের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাদশার মহল নয়। সামান্য আমীরের প্রাসাদ। এখানে অন্দর মহল খুব দূরে নয়। গায় গায় লাগান। বাইরের কথা ভেতরে শোনা যায়। বাইরের জিনিস পর্দার ওপাশ থেকে দেখা যায়। বুলবুলও তখনও সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করছিল। তার হৃদয়ও শিল্পীর হৃদয়। কোন দিনের অভিমানে তার মনে সফদর জঙ্গের জন্য কোন অভিমান হয়ে থাকলেও আজকের ঘটনার পর মুহূর্তে তা উড়ে গিয়েছিল। গান্নার জন্য তার মনের আকুলতা বুলবুলের মাতৃহৃদয় বুঝতে পেরেছিল। তৎক্ষণাৎ সে গান্নাকে বাইরে পাঠাবার জন্য ডেকেছিল। বুলবুলের ডাক শুনে গান্না এসে দাড়িয়ে ছিল পাশে,—কেন আম্মা?

বাইরে যাও একবার?

সে কি! আশ্চর্য্য হয়ে ছিল গান্না। তার দেহে এখন শেষ

কৈশোর। তার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। বুলবুল তাকে পর্দানসীন মহিলার মত কিছুদিন থেকেই ঘরে রেখেছে। এমন কি মৌলভি সাহেবের সঙ্গেও তার দেখা বন্ধ এখন। আম্মা বলেন, বয়েস হলে পুরুষ মানুষকে এড়িয়ে চলতে হয়। যুবক বৃদ্ধ সকলকেই। দৃষ্টির আড়ালে নিজের সৌন্দর্য বাঁচিয়ে চলাকেই মুসলমান রমণীর আভিজাত্য বলা হয়। সেই আম্মা হঠাৎ তাকে বাইরে যেতে বলাতে কিছুকাল গান্না যেন কিছু বুঝতে পারলনা। সে স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকল।

বুলবুল বলল, যাও।

—আব্বাজান ডেকেছে ?

—না, মানে, হ্যাঁ, তুমি যাও।

গান্না আরো আশ্চর্য্য হল। তবে যেতে হবে এ কথা সে বুঝল। আরো বুঝল কোন একটা প্রয়োজন আছে। শুধু সে দেহবাস পরিবর্তন করে যাবে কিনা সেকথাই ভাবছিল। বলল, এভাবেই যাব ?

—হ্যাঁ, এ ভাবেই যাও।

গান্না আর দ্বিরুক্তি না করে বাইরের দিকে এগিয়ে চলল। আজ এই প্রথম সে অনুভব করল কি একটা সঙ্কোচ যেন তাকে জড়িয়ে ধরছে। কি যেন দুটো চরণকে বাধো বাধো করে দিচ্ছে। সে মুক্ত গতি আর নেই! সেই বাইরের মুক্তির জন্য পর্দ্দার অন্তরালে যে স্বপ্ন দেখেছে, সে বাহির আজ যেন তত আকর্ষণীয় নয়। ধীরে ধীরে সে তবু এগিয়ে চলল। সেই মুহূর্তে আলিকুলি গান্নার জন্য অন্দর মহলে আসছিলেন। কিন্তু তাকে বেশী দূরে যেতে হল না। দুপা এগুতেই দেখতে পেলেন—গান্না আসছে।

—এই যে এসেছিস্—আলিকুলি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলেন।
—কি আব্বাজান ? গান্না প্রশ্ন করল। সে প্রশ্নের সুর যেন বুলবুলের মধুর শিষের মত মনে হল সফদর জঙ্গের কাছে। আলিকুলি সফদর জঙ্গকে দেখিয়ে গান্নাকে বললেন, সেলাম কর। অপরিচিত একজনের দিকে তাকিয়ে একটু জড়িত ভঙ্গিতে সালাম জানাল গান্না।

আলিকুলি বললেন, চিনলি?

অনেক দিন আগে দেখলেও ভুলতে পারেনি গান্না তাকে। মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারল। সেই মুহূর্তে গান্নাকেও দেখলেন সফদর জঙ্গ।

বহুদিন আগে একটি ফুলের কুঁড়িকে দেখেছিলেন সফদর জঙ্গ। সেই কুঁড়ি আজ দল মেলে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য ধারণ করেছে। উজ্বল নক্ষত্রের মত চোখ। গাঢ় অন্ধকারের মত কেশ। নীল আকাশের মত প্রশান্তি ভরা মুখ। সফদর জঙ্গ কিছু কাল তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর সহসা স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে বললেন, আমায় চিনতে পেরেছ আম্মা।

ঘাড় কাত করে গান্না চেনার ভঙ্গি করল। সফদর জঙ্গ তাকে বসতে বললেন। গান্না বসল। আলিকুলি এবার কন্যার প্রশংসা করল, গান্না অনেক গুণের অধিকারিণী হয়েছে জনাব।

সফদর জঙ্গ বললেন, হবেই তো, ওর আব্বা-আম্মা যে বহু গুণের অধিকারী। পর্দার ওধারে কেউ হয় তো একটু লজ্জায় রঙিন হলেন। আলিকুলি বললেন, ও বোধ হয় ওর আব্বা-আম্মাকেও অতিক্রম করবে।

—কি রকম?

—আমরা যা শিখিনি ও তা শিখেছে। মৌলভি হাফিজ রহমান ওকে ইসলামী সাহিত্যে সুপণ্ডিত করে তুলেছেন।

সফদর জঙ্গ বললেন, আল্লা মেহের বান।

আলিকুলি বললেন, ও নিজে কবিতা লিখতে পারে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

সফদর জঙ্গ এবার প্রশংসার একটা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন গান্নার দিকে। গান্না যেন একটু লজ্জা পেল।

আলিকুলি বললেন, সে দিন যে বয়াত লিখেছিস্, জনাবকে শুনিয়ে দে। 'বলব কি?' যেন এমনি একটি প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে গান্না তাকাল সফদর জঙ্গের দিকে।

সফদর জঙ্গ বললেন, শোনাও দেখি।

গান্না সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করল:

"দুনিয়ার দিগন্তে নত নীল আসমান
আমি মুসাফির মেঘ তার বুকে ভাসমান
শুনেছি আসমানী নীলে দরিয়ার কান্না
একথা বলেছে শোন দীন বান্দু গান্না।"

মুগ্ধ হয়ে শুনলেন সফদর জঙ্গ।

আলিকুলি বললেন, ও গাইতেও জানে। অপূর্ব্ব গজল গায়।

নাচতে বলেন তো তাও পারে।

—আল্লা রহিম। গান্নার ভাল হোক। যিনি গান্নাকে এ গুণের অধিকারিনী করেছেন আল্লার কাছে তারও শুভ কমনা করছি।

—জনাব কি গজল শুনবেন?

একদৃষ্টে গান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সফদর জঙ্গ, বললেন আজ নয়। একদিনে নয়। ধীরে ধীরে আমি আমার আম্মার কাছ থেকে শান্তি চেয়ে নেব। এক দিনে সব নিতে গিয়ে বঞ্চিত হতে চাই না। আজ তুমি এস আম্মা।

গান্না উঠে দাড়াল। যাবার চেষ্টা করতেই ডাকলেন সফদর জঙ্গ—

—একটু দাড়াও আম্মা।

গান্না দাড়াল।

নিজের হাতের বহু মূল্যবান মুক্তার আংটী খুলে গান্নার হাতে পরিয়ে দিলেন উজির। বললেন, তোমার অক্ষম ছেলের অতি সামান্য উপহার আম্মা।

গান্নার লজ্জায় কোন কথা বলতে পারল না।

সফদর জঙ্গ বললেন, আজ তুমি এস। আবার দেখা হবে।

গান্না চলে গেল। তার চলার পথে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া লক্ষ করলেন সফদর জঙ্গ, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটি। ফিরে তাকালেন তিনি আলিকুলির দিকে। তারপর কি একটা আবেগে আবার তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, আমায় একটি কথা দেবে কবি?

—ফরমাস করুন জনাব।

—ফরমাস নয়, অনুরোধ, শোন! গান্নার সাদি দেবার দায়িত্ব তুমি আমাকে দাও। আমি ওকে অনেক বড় করে দেখতে চাই।

শুধু একটু কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে বললেন আলিকুলি, জনাবের মেহের বানি। বান্দার প্রতি অশেষ দয়া।

কিসের একটা তৃপ্তি যেন সেই মুহূর্তে লাভ করলেন সফদর জঙ্গ। তারপর উঠে দাড়ালেন।

আলি কুলি বললেন, চললেন জনাব?

আমি আবার আসব।

চলে গেলেন সফদর জঙ্গ।

॥ বার ॥

আবার সফদর জঙ্গের সঙ্গে নতুন করে জীবন সুরু। নতুন করে আত্মীয়তা গড়ে উঠল। আজ সফদর জঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধ শুধু স্নেহের, ভালবাসার। একদিন যেমন এর মধ্য দিয়ে স্বার্থ উঁকি দিয়েছিল আজ তার বিন্দুমাত্র নেই। সেই স্বার্থকে কেন্দ্র করে যেটুকু মনোমালিন্যের সূচনা হয়েছিল তাও নেই আর। বুলবুল আর আলিকুলি সফদর জঙ্গকে চিনতে পেরেছেন। রাজনীতিবিদ হলেও সফদর জঙ্গ সৈনিক, সৈনিক হলেও হৃদয় তার সাধারণ মানুষের মতই স্নেহ প্রবণ, কোমল। বরং সাধারণ মানুষের চেয়ে হৃদয় তার একটু বেশীই কোমল। তাই তাঁর মত মর্য্যাদা সম্পন্ন পদে থেকেও তিনি গান্নার ভালবাসার কাছে ধরা পড়েছেন। উজির তার বাদশাহী মর্য্যাদা ত্যাগ করে সাধারণ মানুষের মত এসেছেন আলিকুলির গৃহে।

আলিকুলির প্রতি সফদর জঙ্গের প্রীতি আজ দিল্লী বিশ্রুত। অনেক আমীরেরা তাই আলিকুলিকে ঈর্ষা করে। কিন্তু সফদর জঙ্গের প্রীতির জন্য আলিকুলির যে রাজকীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি, তার জন্য মোটেই গর্ব্বিত নয় আলিকুলি। স্বার্থের বাইরে এক অদৃশ্য আকর্ষনের জন্যই আজ তিনি সফদর জঙ্গের কাছে বাধা পড়ে গেছেন। লোক নিন্দা, অপরের ঈর্ষা, কিছুই সফদর জঙ্গের প্রতি তার শ্রদ্ধাকে টলাতে পারেনি। সফদর জঙ্গ আর আলিকুলি যেন এক পরিবারের লোক। তাদের জীবনের গতি যেন আজ একই দিকে প্রবাহিত। সফদর জঙ্গের মিত্র আজ আলিকুলির মিত্র, সফদর জঙ্গের শত্রু আজ আলিকুলির শত্রু। অল্পদিনের মধ্যে কিন্তু তাদের এই সৌহার্দ্দ পরীক্ষার দিনও ঘনিয়ে এল।

সফদর জঙ্গ ইরাণী দলের লোক ছিলেন। আমির থাঁর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়েছিল তাঁর উপর। সুতরাং আহমদ শা তাকে উজির

নিযুক্ত করলে তুরাণী দলের সমস্ত আক্রোষ এসে পড়ল তার উপর। বিশেষ করে উজিরের পদ এত দিন তাদের হাতেই ছিল। তা ছাড়া দিল্লীর অন্যান্য সকলে সফদর জঙ্গকে বিশেষ সুনজরে দেখতেন না। তাদের মতে সফদর জঙ্গ ভুঁইফোড়। দিল্লীর অন্য আমীরদের মত তার বংশের অভিজাত্য নেই। তাছাড়া কামরুদ্দিনের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে, বিশেষ করে তার পুত্রদের তরফ থেকে সফদর জঙ্গ বিরোধীতার সম্মুখীন হলেন। কামরুদ্দিনের পুত্র ইনতিজাম উদ্দৌলা পিতার উজিরী পদ তিনিই পাবেন বলে আশা করেছিলেন। কামরুদ্দিনের ভ্রাতা আসফের পুত্র গাজিউদ্দিন সাদি করেছিলেন ইনতিজামের ভগ্নিকে। তারা দুজনে মিলে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে দল গড়ে তুললেন। গজিউদ্দিনের ব্যক্তিগত আক্রোষও ছিল। তার পিতা নিজাম আসফখা ছিলেন বাদশার মির বক্সী। কিন্তু সে পদ সফদর জঙ্গ তাকে না দিয়ে স্বীয় দলভুক্ত সলাবত খাঁকে দিলেন। গাজিউদ্দিন অসন্তুষ্ট হলেন। এই আক্রোষ ছাড়া জাতীয় আক্রোষও কাজে লাগল। সফদর জঙ্গ ছিলেন ইরাণী মুসলমান। তাঁর প্রতি পক্ষ ছিলেন তুরাণী। ধর্মীয় বিরোধও ছিল। সফদর জঙ্গ ছিলেন সিয়া ওরা ছিলেন সুন্নি। সুতরাং বিরোধ বেশ তীব্র ভাবে ঘনিয়ে এল। সফদর জঙ্গের দুর্ভাগ্য যে, তার বিরুদ্ধে আর এক প্রভাবশালী ব্যক্তি এসে জুটলেন। তিনি জাবিদ খাঁ। আহমদ শা ও তার মাতা উধম বাঈয়ের উপর ছিল তার প্রভূত ক্ষমতা হারেম পরিদর্শক ছিলেন তিনি। সফদর জঙ্গকে ঈর্ষা করতে লাগলেন জাবিদ খাঁ। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে এরা সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না। ইনতিজাম তখনও মাত্র দ্বিতীয় মির বক্সী। মুইন (কামরুদ্দিনের আর এক পুত্র) পাঞ্জাবে আহম্মদ আবদালির বিরুদ্ধে নিজের সুবা রক্ষা করতে ব্যস্ত। সুতরাং তাদের একমাত্র আশার স্থল ছিল দাক্ষিণাত্যের নিজামের পুত্র নাসির জঙ্গ।

সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধদল মিলে বাদশার মন তাঁর উপর বিষিয়ে

দিল। বাদশা তাদের পরামর্শে সফদর জঙ্গকে আক্রমণ করবার জন্য নাসির জঙ্গকে আমন্ত্রণ করলেন।

এ সংবাদ দেখতে দেখতে দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল। সে দিন সমস্ত দিল্লী নগরী এক চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে কাটাল। তখন আলি কুলির প্রাসাদে স্বামী স্ত্রী দুজনের মধ্যে আলোচনা চলছিল। আবার তারা যেন অনেক দিন পরে খুশীর আলো দেখতে পেয়েছেন। মোগল সাম্রাজ্যের উজির সফদর জঙ্গ তাদের বিশেষ স্নেহ করেন। দিল্লীতে ইরাণীদের প্রাধন্য হয়েছে। পূর্বেও আলিকুলি বাদশার অনুগ্রহ লাভ করলেও তুরাণীদের প্রাধান্যের জন্য একরকম অবহেলিতই ছিলেন। এবার আবার মর্য্যাদা ফিরে পাচ্ছেন। তাই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল।

আলিকুলি বলছিলেন, যাক, আল্লা এবার আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এবার বোধ হয় ইরাণীদের ভাগ্য খুলল। তোমার কি মনে হয়।

পাশে বসে সেতারের তারে মৃদু অঙ্গুলী সঞ্চালন করছিল বুলবুল বেগম। তারা দুজনেই শুধু সেখানে ছিলেন। সন্ধে হয়ে আসছিল। গান্না নেই। হয়তো হারেমের কোন নিভৃতে বসে সে হাফিজ পাঠ করছিল। কিম্বা আলিকুলিরই রচিত কোন গজল গাইছিল গুন গুন করে। এ সমস্তই আজকাল তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলিকুলির প্রশ্ন শুনে তার চলমান অঙ্গুলীগুলিকে থামাল বুলবুল বেগম। তার পর প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলে তাকাল আলিকুলির দিকে। ভাবখানা এইযে, সে শুনতে পায়নি কিছু। আলিকুলি বললেন, তোমার কি মনে হয় না যে এবার ইরাণীদের সুদিন আসবে?

—কেন?

—সফদর জঙ্গ আমির খাঁর চেয়ে শক্তিশালী। বুদ্ধিও বেশী রাখেন। তিনি নিশ্চয়ই এবার ইরাণীদের জন্য একটা কিছু করতে পারবেন।

বুলবুল বলল—আল্লা মেহেরবান। তেমনি হোক। তোমার আশা পূর্ণ হোক। কিন্তু জানতো........

কি প্রশ্ন? একটা কৌতুকের ভাব নিয়ে আলিকুলি তাকালেন বুলবুলের দিকে। রহস্যের উদ্দেশ্য নিয়েই বুলবুল একথা বলেছিল। সে বলল, জানতো আমি ইরাণী নই?—ও হ। আলিকুলি একটু হাসলেন। বললেন; তা হোক, তুমি এখন ইরাণী হয়ে গেছ। আমার পরিচয়ই তো এখন তোমার পরিচয়।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল বুলবুল। বলল,—বেশ, তবে ইরাণীদের ভাগ্যই ফিরুক।

—ফিরুক নয়। বল ফিরল। সফদর জঙ্গ আমাদের নতুন মর্য্যাদা দিলেন।

বুলবুল একটু কটাক্ষ করল, ইরাণীদের না, তোমার নিজের?

—মানে?

—মানে, দেখতে পাচ্ছি, ইরাণী বলতে উজির সাহেব শুধু তোমাকেই বুঝেছেন। না হলে দিল্লী আসবার পর শুধু আলিকুলির গৃহেই তিনি আসবেন কেন? অন্য কোন ইরাণী আমীর নেই কি? এবার একটু কৌতুক করবার সুযোগ পেলেন আলিকুলি। বললেন, আমার জন্য আসবেন কেন।

—তবে?

—আসেন আর এক জনের জন্য।

—শুনি?

—বুলবুল বেগমের জন্য।

ভ্রু' দুটো টানটান করে বুলবুল তাকাল আলিকুলির দিকে, তাই নাকি?—তবে তো সফদর জঙ্গ ইরাণীদের খুব বেহেস্তে তুলছেন। পদন্নোতির নজরানা বুঝি বেগমরা?

আলিকুলি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, হো হো করে হেসে উঠলেন।

বুলবুল বলল, কি, তুমি তোমার বেগমকে কবুল করে এসেছ না কি ?

আলিকুলি তখন বুলবুলকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিলেন। অনেকদিন পরে যেন আবার দুয়ের দেহকে ছাপিয়ে একটা ভালবাসার প্রবাহ উচ্ছল হয়ে উঠল। আলিকুলি বুলবুলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, না, খাঁ সাহেব সত্যি বড় ভাল লোক।

জানি।

নিজের কণ্ঠে একটা আবেগ টেনে আলিকুলি বললেন, জান, উজির সাহেব আমাদের গান্নাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। ছোট্ট করে জবাব দিল বুলবুল, গান্নার নসিব। আলিকুলি বললেন, সেদিন তিনি যে ভাবে যাবার সময় আমার হাত ধরে গান্নাকে চাইলেন যে........

হঠাৎ যেন চমকে উঠল বুলবুল, গান্নাকে চাইলেন মানে ? তিনি কি তার পুত্রের সঙ্গে গান্নার সাদির কথা ভাবছেন ! ইসলামে বহু বিবাহ আইন সম্মত হলেও বুলবুল তাতে সম্মতি দিতে পারবেনা। সে চায় তার গান্নার জীবন প্রেমে সুখী হোক, তার মর্য্যাদার সঙ্গে প্রেমও সম্মান পাক। গান্না কোন পুরুষের এক মাত্র বেগম হবে। তাই সে স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞেস করল আলিকুলিকে,—তিনি গান্নাকে চেয়েছেন মানে ? তিনি সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে তার সাদির কথা ভাবছেন ?

একটু স্মিত হাসলেন আলিকুলি, বললেন, না।

—তবে ?

—তিনি চান, গান্নার সাদির সময় যেন তাঁকে জানান হয়। গান্নার সাদি যেন ছোট ঘরে না হয়। গান্না যেন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ আমিরের ঘরে যায়। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই সে দায়িত্ব নিতে চান।

বুলবুল বলল আল্লা রহিম। গান্নার নসিবে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই করবেন। তবে একথা ঠিক গান্না কখনো ছোট ঘরে পড়বেনা। হিন্দুস্থানের বেগমদের মধ্যে একজন হবে গান্না।

ঠিক সেই মুহূর্তে গান্না এল সেখানে। বড় শান্ত, বড় স্নিগ্ধ, বড় সুন্দর মেয়ে। এমনকি আলিকুলি আর বুলবুলও ক্ষণকাল নিজেদের ভুলে গান্নার দিকে থাকলেন। গান্না ডাকল,—আব্বাজান।

—বল।

—আমি ঠিক এক্ষুণি একটা বয়েত লিখেছি শুনবে?

—বল।

গান্না পাঠ করতে লাগল। বড় খেয়ালী হয়েছে মেয়ে। এমনি যখন তখন তার রচনা আব্বাজনকে শোনায় সে। কখনও কখনও আব্বাজনের সঙ্গে কবিতার ভাব নিয়ে তর্ক করে। বুলবুল তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখে। গান্নাকে দেখে তার মনে হয়, যেন একটি ফুল যৌবনের সঞ্চার হচ্ছে তার। বুকের গন্ধ পাপাড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এই কবিতাই তার সুবাস! গান্না পড়তে লাগল।

"ও হবা তুমি আদমকে ভাল বেসেছিলে?
কিম্বা আদমই ভাল বেসেছিল?
ও হবা কতটুকু প্রেম পেয়েছিলে?
আজ সে কি সকলি হারাল?
ও হবা, আমার বাগিচা ভরে ফুল
তুমি কেন উদাস তা হলে?".................ইত্যাদি

আলিকুলি বললেন, বাঃ চমৎকার, কিন্তু আম্মা।....

গান্না পিতার দিকে তাকাল।

আলিকুলি বললেন, তুমি হবাকে কাঁদালে কেন? গান্নার কণ্ঠে হুরীর মাধুর্য্য ফুটে উঠল। বলল, আচ্ছা আব্বাজান, তুমিই বল: আমার বাগিচায় ফুল ফুটেছে কত রক্ত গোলাপ। কিন্তু হাওয়া দেখছ কেমন উদাস। কেমন হুহুভরা একা বিষণ্ন সুর! মনে হয় যেন কাঁদছে, তাই নয় কি? হুহু উত্তুরে হাওয়া কেমন ম্লান মনে হয় না?

বুলবুল বলল, শীতের সময় তো, এখন হবেই।

গান্না বলল, গত বসন্তেও তো এমনি এ শব্দ শুনেছি আম্মা। আসছে বসন্তে তুমি দেখো........

একটু বিরক্ত হল বুলবুল। গান্নার কবিতায় একটা বিষাদের সুর তার ভাল লাগে না। শুনলেই তার বুকটা যেন কেমন কেঁপে উঠে। মনে হয় এ যেন গান্নারই জীবনের কথা বলছে। এ যেন তার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া। তাই সে প্রতিবাদ করে। তা যা হোক্, তুমি এমন কবিতা লেখ তা আমি চাই না। তুমি লিখিবে জীবনের, আনন্দের বয়াৎ।

গান্না বলল, কিন্তু মৌলভি হাফিজ আমাকে বলেছেন....বুলবুলের কণ্ঠে একটু ক্রুদ্ধ স্বর বেরুল, থাম, তোমার মৌলভি সাহেবের কথা আর শুনতে চাই না। এই মৌলভিরাই যত........

বুলবুল কথা শেষ করতে পারল না। হঠাৎ তাদের প্রাসাদের সম্মুখ পানে কা'দের দ্রুত সঞ্চারমান পদশব্দ শোনা গেল। মনে হল ব্যস্ত হয়ে অনেক লোক যেন কোথায় যাচ্ছে। যেন দৌড়েই যাচ্ছে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। নানা সন্দেহ সেই সময় উঁকি দিল সবার মনে। কিছু দিন হল মারাঠা আর জাঠ দস্যুরা বড় বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে তারা লুণ্ঠন চালিয়েছে। তারাই নয় তো! দিল্লীতে আক্রমণ হয় নি তো! তৎক্ষণাৎ আর এক সন্দেহও হোল। আহম্মদ আবদালি কি হঠাৎ তবে আফগানদের নিয়ে.... ....সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। বুলবুল গান্নাকে বুকের কাছে টেনে নিল। আলিকুলি উঠতে গেলেন। বুলবুল বাধা দিল, একি, কোথায় যাচ্ছ?

—দেখে আসি।

—না, তোমার বাইরে গিয়ে দরকার নেই........

—কিন্তু............

বুলবুল বলল, তুমি আসরাফকে ডাক, সেই জেনে আসুক। আর ওকে বলে দাও, দরওয়াজাটা ভাল করে বন্ধ করে দেয় যেন।

সেই মুহূর্তে আসরাফকেও সেই দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। আলিকুলি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে ? কি হয়েছে ?

আসরাফ হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, উজির সাহেবকে কে বোমা ছুঁড়েছে।

—সে কি !

—হ্যাঁ।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন আলিকুলি, তিনি বেঁচে আছেন তো ?

—তা জানি না।

সেই আনন্দের পরিবেশে দেখতে দেখতে একটা কৃষ্ণ মেঘের ছায়া পড়ল। আলিকুলি কিছু কাল নিসশ্চুপ হয়ে বসে পড়লেন। তারপর আসরাফকে ডাকলেন, আসরাফ।

—হুজুর !

—আমার ঘোড়াটায় জিন লাগাও।

ব্যস্ত হয়ে বুলবুল বলল, কেন ?

—আমি যাব।

—কোথায় ?

—উজির সাহেবের ওখানে।

—সে কি ! না, এখন তোমার গিয়ে দরকার নেই।

আলিকুলি বললেন, সেকি হয়। তাঁর বিপদের সময় আমরা দূরে থাকতে পারি না।

বুলবুল বলল, তবে তুমি আসরাফকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

একটু হেসে বললেন আলিকুলি, আচ্ছা।

কিছু কালের মধ্যেই আসরাফ আর আলিকুলি বেরিয়ে পড়লেন যাবার সময় গান্না বলল, আমার সালাম জানিও খাঁ সাহেবকে।

—আচ্ছা বেটি।

আলিকুলি চলে গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আলিকুলি দারা সুকোহর প্রাসাদে গিয়ে

উপস্থিত হলেন। প্রাসাদ তোরণে পৌঁছুতেই তার বুকটা দুর দুর করে কাঁপতে লাগল। দ্বার রক্ষক, আলিকুলিকে দেখেই কুর্নীস করে এক পাশে সরে দাড়াল। আলিকুলি তাদের কাছে খুবই পরিচিত। সফদর জঙ্গের প্রাসাদের দিকে চলে গেলেন আলিকুলি। হল ঘরের কাছে এসে প্রথমটা ঘাব্ড়ে গেলেন। ভাবলেন, কি দেখবেন কে জানে; আল্লার নাম নিয়ে অবশেষে ঢুকে পড়লেন তিনি। কিন্তু বিরাট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখতে পেলেন যে—সফদর জঙ্গ আমীরদের নিয়ে বসে আছেন। সালাম জানাল আলিকুলি। সফদর জঙ্গ তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, এই যে কি মনে করে?

মৃদু মৃদু হাসছিলেন তিনি। কিন্তু তার সেই হাসির মধ্যেও কিসের একটা ম্লান আভা ছিল। আলিকুলি বললেন, শুনলুম।

আর একটু জোরে হাসলেন সফদর জঙ্গ, তুমিও তাহলে শুনেছ? এস, বস। সেকথাই আলোচনা হচ্ছিল।

আলিকুলি আসন নিলেন। আবার আলোচনা চলল। কথা বললেন, সলাবৎ খাঁ। বললেন, এ তুরাণীদের কাজ। ইনতিজামের কারসাজি। আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না।

সফদর জঙ্গ বললেন, কি করব বল?

সলাবৎ বললেন, আপনি জানিয়ে দিন যে, আমাদের ও শক্তি কম নয়। যেখান থেকে আপনার উপর বোমা ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সে জায়গা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিন।

—তারপর?

—দিল্লীর সমস্ত ইরাণী আমীরদের ডেকে পরামর্শ করুন। এবং আপনার দোস্ত মারাঠা বীর হিঙ্গেকে সব জানান।

সফদর জঙ্গ বললেন, হ্যাঁ, ঘটনাটি গুরুতরই মনে হচ্ছে। কারণ আজও আমি দাক্ষিণাত্য থেকে নাসির জঙ্গের চিঠি পেয়েছি। সে লিখেছে........তৎক্ষণাৎ চিঠিটা বের করলেন সফদর জঙ্গ। লিখেছে,

সালাম আলিকুম আদাব অ-স্তু,—আমি দিল্লী যাইতেছি। শুধু

মারাঠাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই দাক্ষিণাত্যে অপেক্ষা করিতেছি। কার্য্য সমাধা হইলেই দরবারে যাইব। আপনি মেহরবানি করিয়া দাক্ষিণাত্যে আমার সুবাদারী পদটি দেবেন এবং আমি আশা করি আমার আব্বাজান যে মিরঅতিসের পদাধিকারীর ছিলেন, তাহাও আমাকে দেওয়া হইবে। তারপর জনাবের সাহায্যে বাদশাহকে শোধন করিতে হইবে। বালাজি বাজিরাও প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থান পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে আপনি যদি তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে নিতান্ত প্রতারিত হইবেন। সে এক জন প্রতারক। এক মাত্র অর্থ ছাড়া সে আর কিছু চেনে না। আমাকে দয়া করিয়া নিরাপদে দিল্লী পৌঁছুতে দিন, তখন আমি আর আপনি মিলিয়া বালাজিকে তার উদ্ধত্যের জন্য শাস্তি দেব।

আপনার অধান

—নসির জঙ্গ

গোপন সভা কক্ষ একমুহূর্ত নীরব থাকল। সব থম থম করতে লাগল যেন। সফদর জঙ্গ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বললেন, সলাবৎ খাঁ, বললেন এ চিঠি আমি বিশ্বাস কবিতে পারিনা জনাব। নাসির জঙ্গকে দিল্লীতে আসতে দিলে ভুল করা হবে।

সফদর জঙ্গ কি জানি কেন হঠাৎ আলিকুলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মত, আলি?

রাজকীয় পদে থাকলেও রাজনীতিতে মাথা ঘামায় না আলিকুলি। সফদর জঙ্গ তার কাছে আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। তাই হঠাৎ কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, আমার মনে হয় নাসির জঙ্গের বা তুরাণীদের মধ্যেও কারো মারাঠাদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে মারাঠা বীর হিঙ্গেকে ডাকুন। তার কাছে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নেয়া যাবে।

সফদর জঙ্গ বললেন, হ্যাঁ, একথা যুক্তিযুক্ত। শীগ্‌গীরই তাঁর সঙ্গে

দেখা করব। তবে নাসির জঙ্গের দিল্লী আসবার প্রস্তাবটা সন্দেহ জনক।

সলাবৎ বললেন, অন্তত আমার তাই মনে হয়। সমস্ত তুরাণী দলই ক'দিন কেমন থমথমে ভাব নিয়ে রয়েছে। একটা কিছু গোপন পরামর্শ চলেছে বলে আমার ধারণা।

আমার মনে হয় আহম্মদ শার মনও তারা আপনার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিচ্ছে।

কথাটা শুনে সফদর জঙ্গও একটু চিন্তিত হলেন। হয়তো তাই। কারণ ক'দিন বাদশাও নানা অজুহাতে সফদর জঙ্গকে দূরে রাখতে চাইছেন। তুরাণী আমীররা প্রকাশ্যে কেউ দরবারে যাচ্ছেন না। হয়তো গোপনে গোপনে সব কিছুই চলছে। তিনি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হঠাৎ গোপন কক্ষে বান্দা এসে উপস্থিত হল।

কি ব্যাপার? সফদর জঙ্গ তাকালেন বান্দার দিকে।

সালাম জানিয়ে বান্দা বলল, মারাঠা বীর হিঞ্চে এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

হিঞ্চে! হঠাৎ এই সময়! সফদর জঙ্গ ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করলেন। কিছু না বুঝতে পেরে সলাবৎ খাঁর দিকে তাকালেন সলাবৎও কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হল না। বললেন, —ওকে আসতে বলুন।

সফদর জঙ্গ বান্দাকে হিঞ্চেকে নিয়ে আসতে আজ্ঞা দিলেন। সকলে দরবারে একটু আড় ভেঙে বসলেন যেন। একবার মুখে মুখে তাকিয়ে সপ্রতিভ হয়ে নিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই হিঞ্চে এলেন। সালাম জানালেন তিনি উজির সাহেবকে। সফদর জঙ্গও দাড়িয়ে অভিবাদন জানালেন তাকে। এই যে, আসুন মারাঠাবীর হিঞ্চে। বসুন।

হিঞ্চে চতুর। বসতে :বসতে বললেন তিনি, হঠৎ আসাতে একটু চমকে গিয়েছেন বোধ হয়?

চাতুর্য্যে সফদর জঙ্গও কম যান না, বললেন, সে কি কথা। আমার দ্বার আপনার জন্য অবারিত। বলুন কি সমাচার ?

হিঞ্চে বললেন,—সমাচার নিতে এলুম। দিল্লীর কাছেই ছিলুম। হঠাৎ আজকে সন্ধ্যার ঘটনা শুনতে পেলুম। তাই........

সফদর জঙ্গ বললেন, আপনার অশেষ সৌজন্য। তা একটু সামান্য বিপদের মত হয়ে ছিল আর কি।

—কারা নাকি বোমা ছুঁড়েছিল আপনার দিকে ?

—সেই রকমই কিছু একটা হয়েছিল।

—যা হোক গুরুতর নয় নিশ্চয়ই ?

—জানি না। আল্লার দোয়ায় বেঁচে আছি, এই যা।

হিঞ্চে বললেন, যাক নিশ্চিন্ত হলাম , এরই জন্য এলাম।

সফদর জঙ্গ উত্তর দিলেন, খুব ভাল করেছেন। এই সময় আপনার কথাই ভাবছিলাম আমরা।

—আমার কথা! একটু যেন চমকে উঠলেন হিঞ্চে।

—হ্যাঁ, আপনার কাছে কিছু জানবার আছে আমাদের।

আপনার পরামর্শ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

একটা রহস্য অনুমান করে হিঞ্চে সফদর জঙ্গের দিকে তাকালেন। সফদর জঙ্গ বললেন, হায়দ্রাবাদ থেকে চিঠি পেয়েছি। নাসির জঙ্গ আসতে চায়। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুবেদারী পাওয়া, মির অতিসের পদ নেওয়া আর মারাঠাদের বিতাড়িত করা—থামলেন সফদর জঙ্গ শেষ কথায় হিঞ্চের উপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় লক্ষ্য করা তার উদ্দেশ্য। একটু প্রথমটায় চমকে গিয়ে, হো হো করে হেসে উঠলেন হিঞ্চে। সফদর জঙ্গ থেকে আলিকুলি পর্যন্ত সকলেই তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অবশেষে সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন তো ?

হিঞ্চে একটি পত্র বের করে সফদর জঙ্গের হাতে দিলেন। সফদর জঙ্গ পত্রখানি নিয়ে দেখলেন। নাসির জঙ্গের লেখা পত্র। নাসির জঙ্গ তার ভাই গাজিউদ্দিনের কাছে লিখেছেন।

আদাব অন্তে নিবেদন, আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আল্লার দোয়ায় বর্তমানে একটু ভালই আছি। সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে আমার সাহায্য চাহিয়াছেন। আমি তদনুসারে অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী রওনা হইতেছি। আমার ইচ্ছা, বাদশা তুরাণীদের উপর বিশ্বাস রাখুন। সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলাকে দূর করিতে হবে। আর সফদর জঙ্গকে হটিয়ে ইনতিজামকে উজিরী পদে বহাল করতে হবে। আপনাদের মেহের বানি আর আল্লার দোয়া থাকিলে কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

ইতি,—

—নাসির জঙ্গ

পত্র পড়ে তৎক্ষণাৎ সফদর জঙ্গের মুখে এটা বিষাদের ভার নেমে আসল। হিঞ্চে বললেন, দেখুন, এবার নাসির জঙ্গকে চিনুন। তার মত শয়তান লোক সমস্ত হিন্দুস্থানে বর্তমানে নেই।

সফদর জঙ্গ বললেন, হ্যাঁ, এতক্ষণে নাসির জঙ্গকে চিনলাম। ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সলাবৎ খাঁ সফদর জঙ্গের দিকে তাকালেন। সফদর জঙ্গ তাকে পত্র খানা পড়তে দিলেন। হিঞ্চে বললেন, শুধু এই নয়। আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন নাসির জঙ্গ এতক্ষণ দাক্ষিণাত্য ছেড়ে রওনা হয়েছেন।

চমকে উঠেন সফদর জঙ্গ। বললেন, সত্যি ?

—হ্যাঁ।

এমন সময় সলাবৎ পত্র পাঠ শেষ করে বলে উঠলেন, পালাল। সফদর জঙ্গ হিঞ্চেকে বললেন, আমরা এখন কি করব বলুন। আপনাদের সাহায্য আমি নিশ্চয়ই পেতে পারি ?

হিঞ্চে বললেন, নিশ্চয়ই, পেশোয়া সরকার আমাকে সে ভাবেই বলেছেন। পেশোয়া আপনাকে সাহায্য করবেন।

সফদর জঙ্গ বললেন, পেশোয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বলুন আমরা কি করব ?

হিঞ্চে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তো মলহর হোলকারকে নাসির জঙ্গকে বাধা দেবার জন্য লিখে দিতে পারি।

সফদর জঙ্গ বললেন, নিশ্চয়ই। এই মুহূর্তেই। তার জন্যে যে কোন আর্থিক সাহায্য আপনারা পাবেন।

হিঞ্চে বললেন, বেশ তবে আমি নাসির জঙ্গকে বাধা দেবার ব্যবস্থা করব। এরই জন্যে আপনার সঙ্গে দেখা ক'রবার প্রয়োজন ছিল। তিনি উঠে দাড়ালেন। সফদর জঙ্গ বললেন, আপনাকে, ধন্যবাদ। এবং মহামান্য পেশোয়াকে আমার সালাম জানাবেন। আপনারাই আমার একমাত্র মিত্র।

হিঞ্চে বললেন, তুরাণীদের চিনে রাখবেন। জনাব অরক্ষিত ভাবে রাস্তায় বের হবেন না। যদি পারেন দিল্লী ছেড়ে উপকণ্ঠে কোথাও শিবির করে থাকুন। আচ্ছা, আদাব।

হিঞ্চে চলেগেলেন। সফদর জঙ্গ সলাবৎ খাঁর দিকে তাকালেন। সলাবৎ খাঁ বললেন, হিঞ্চের কথাই ঠিক। তুরাণীরা মুসলমান হলেও ওদের কথা বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে। আচ্ছা আমি এখন আসি। আমাকে একবার এখনি কেল্লায় যেতে হবে। আদাব। সলাবত খাঁ চলে গেলেন। আলিকুলিও যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সফদর জঙ্গ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বোস।

—বলুন।

—তোমাদের খবর কি ?

আলিকুলি বললেন। আমাদের আর খবর কি। আপনার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এবার একটু নিশ্চিন্ত।

সফদর জঙ্গ বললেন, আল্লা সহায় থাকলে আমাদের ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু আমাদের সাবধান হয়ে থাকতে হবে। তুমিও সাবধান হয়ে থাকবে। মনে রেখ এ শুধু আমার বিরুদ্ধে নয়, এ হল ইরাণীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। আমি সম্ভবত দু-একদিনের মধ্যেই বাইরে যাব।

যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব। বেগম সাহেবাকে আর গাম্নাকে আমার কুশল জানিও।

আলিকুলি বললেন, আপনার মেহেরবানি আমরা ভুলতে পারবনা। তিনি উঠে দাড়ালেন। সফদর জঙ্গও উঠে দাড়িয়ে তাকে এগিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তারা দুজনে দ্বারের দিকে এগিয়ে চললেন।

॥ তের ॥

সফদর জঙ্গের সেই ঘটনা সমস্ত ইরাণী মহলকে ভায়ানক চঞ্চল করে তুলেছিল। বেশ একটা উত্তেজনার মধ্য দিয়েই দিল্লীর ইরাণী মহল কয়েকদিন কাটালেন। তার পর ধীরে ধীরে উত্তেজনার তীব্রতাটা চাপা পড়তে থাকল। সাধারণ মহলে চাপা পড়লেও ইরাণী উচ্চ মহলে তা নিত্য দরবাবীয় বিষয়ে পরিণত হল। সফদর জঙ্গ ক'য়দিন খুবই ব্যস্ত থাকলেন। তিনি রীতি মত সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং গরম গরম বক্তৃতা দিতে লাগলেন। ফলে তুরাণী দল ভয় পেয়ে গেল। এর মধ্যে সম্রাটও যুক্তি দিলেন। তিনি ঘটনা আন্দাজ করতে পেরে, পূর্বেই নাসির জঙ্গকে ফিরে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। এবার ক্রুদ্ধ উজিরকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। ১৭ই এপ্রিল ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দ। আহমদ শাহ রাজমাতা উধম বাঈকে নিয়ে সফদর জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলেন। অনেকটা বিনয় দেখালেন আহমদ শা। সফদর জঙ্গের প্রতি বন্ধুত্ব পূর্ণ ব্যবহার করা হবে, এরকম প্রতিজ্ঞাও করলেন। সফদর জঙ্গকে তিনি নিজে সঙ্গে করে লালকেল্লাতে নিয়ে আসলেন। ইরাণী মহল তবে কিছু সন্তুষ্ট হল। আলিকুলি বা বুলবুল যখন জানতে পারলেন তারাও উৎফুল্ল হলেন। কিন্তু সফদর জঙ্গ দিল্লীতে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। তা ছাড়া নিজের সুবা অযোধ্যাতে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। রোহিলখণ্ডের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা চলছিল। সুতরাং তিনি নভেম্বর মাসে দিল্লী ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার আগে আলিকুলিকে ডেকে পাঠালেন। শত চিন্তার মধ্যেও আলিপরিবারকে ভুলতে পারেননি তিনি। কি জানি কি এক মায়া পড়ে গিয়েছিল তার আলিকুলির উপর। গান্না যেন তার সমস্ত হৃদয় খানি জুড়ে ছিল। যুদ্ধের উন্মাদনা, ষড়যন্ত্রের নীচতার মধ্যেও শান্তির প্রলেপের মত তাদের স্মৃতি সফদর জঙ্গের হৃদয় জুড়ে থাকত।

অযোধ্যাতে যাবার পূর্বে আলিকুলির পরিবারের সঙ্গে দেখা করে আসবার ইচ্ছা তার খুবই হল। কিন্তু সময় করে উঠতে পারলেন না। গান্নাকে দেখবার জন্য অদম্য ইচ্ছা থাকলেও চেপে যেতে হল। তিনি আলিকুলিকে ডেকে পাঠালেন। আলিকুলি আসলে বললেন, শোন আমি দিনকয়েকের জন্য অযোধ্যা যাচ্ছি। গান্নাকে একবার দেখে যাবার ইচ্ছা ছিল।

আলিকুলি যেন সফদর জঙ্গের হৃদয়ের যন্ত্রণাটা বুঝতে পারলেন। বললেন,—বেশতো আমি গান্নাকে নিয়ে আসছি।

সফদর জঙ্গ হাসলেন, বললেন না, না। আমাকে যদি দেখতে হয়, তবে গিয়ে দেখতে হয়, না হলে তার অপমান হয়। আমিই যাব। তবে এখন নয়। অযোধ্যা থেকে ফিরে আসি। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম।—বলুন।

—তোমরা বেশ সাবধানে থাকবে। মনে রেখ সমস্ত দিল্লীর ইরাণীদের বিরুদ্ধে তুরাণীদের চক্রান্ত চলেছে। সব চেয়ে বেশী ক্রোধ আমার প্রিয় জনদের উপর। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা অনেকেই জেনেছে। ফলে তোমার প্রতিও তাদের আক্রোষ কম নয়।

আলিকুলি বললেন, আল্লার মর্জি, আমরা সাবধান থাকবার চেষ্টা করব।

সফদর জঙ্গ বললেন, হ্যাঁ, আর একটি কথা, কখনো বিপদে পড়লে তোমরা আমার এখানে এসে আশ্রয় নেবে। বেগম সাহেবাকে সব বলে গেলাম। তোমাদের জন্য আমার দ্বার অবারিত থাকল। কৃতজ্ঞতায় যেন আলিকুলি নুইয়ে পড়লেন, অশেষ দোয়া। আমাদের জন্য জনাবকে অনেক তকলিব সহ্য করতে হচ্ছে।

সফদর জঙ্গ হাসলেন, কিছুনা। এই তকলিব সহ্য করাতেই আমাদের আনন্দ। কি মনে করে একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, হ্যাঁ এবার যাও। আমাকে এক্ষুণি প্রস্তুত হতে হবে। বুলবুল বেগমকে আমার আদাব জানিও। আর গান্নাকে আমার স্নেহ, আচ্ছা............

আলিকুলি উঠে দাড়িয়ে সালাম জানালেন। তার পর ধীরে ধীরে বাইরে চললেন। সফদর জঙ্গের জন্য সেই মুহূর্তে তার যেন কি একটা স্নিগ্ধ ভাব মনের মধ্যে জমা হতে লাগল।

আলিকুলি চলে গেলেন তার পর অন্যান্য ইরাণী আমিররা সফদর জঙ্গের সঙ্গে দেখাকরতে এলেন। সলাবৎ খাঁ তাদের মধ্যে অন্যতম। সফদর জঙ্গ সলাবৎ খাঁকে বললেন, সলাবৎ আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সাবধান হয়ে থাকবে। মনে রেখ বাদশা বা তুরাণীরা সবসময় আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। মির বকসির পদ ওরা ইনতি-জামকে কিম্বা গাজিউদ্দিনকে দিতে চায়। ওদের কোন সুযোগ দেবে না।

সলাবৎ খাঁ সালাম জানিয়ে বললেন জনাবের আদেশের অন্যথা হবে না। তবে আপনি শিগ্‌গীরই ফিরে আসবার চেষ্টা করবেন।

—নিশ্চয়ই।

সফদর জঙ্গ একটু নীরব থেকে কি যেন ভাবলেন। বললেন, দেখ সলাবৎ, তুমি আলিকুলির পরিবারের দিকে একটু নজর রাখবে।

—সেকি ? একটু চমকে উঠলেন সলাবৎ ? বললেন আপনি কি আলিকুলিকে সন্দেহ করেন ?

হো হো করে হেসে উঠলেন সফদর জঙ্গ। বললেন, না, সে রকম নয়। ওরা বড় সরল, ওরা আমার আপন জন। ওরা যাতে বিপদে না পড়ে তারই জন্য বলছি। কোন বিপদ আপদ হলে তুমি ওদের আমার প্রাসাদে এনে রেখে যেও।

—ও !—যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন সলাবৎ খাঁ। এই কথা ! নিশ্চয়ই করব।

সফদর জঙ্গ বললেন, হ্যাঁ, আরেক কথা, বাদশার হারেম পরিদর্শক জাবিদ খাঁকে কখনো বিশ্বাস কোর না।

—কেন ?

—সে অনেক কথা, পরে বলব। এবার তুমি যাও আমি প্রস্তুত হব।

—সালাম জানিয়ে উঠে দাড়ালেন সলাবৎ খাঁ। সফদর জঙ্গ হারেমের দিকে চললেন।

॥ চৌদ্দ ॥

সফদর জঙ্গ অযোধ্যাতে কিছুদিন সুবার সুবন্দোবস্ত করা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন। অবশেষে কাজ হলে দিল্লী আসবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। হঠাৎ দিল্লী থেকে সংবাদ এল রোহিল খণ্ডে বিদ্রোহ হয়েছে। উজিরকে সেখানে যেতে হবে। সফদর জঙ্গ আর দিল্লী যেতে পারলেন না, ব্যস্ত থাকলেন রোহিল খণ্ডে। পূর্ণ একবছর ১৭৪৯ থেকে ১৭৫০ পর্য্যন্ত রোহিল খণ্ডে কেটে গেল তাঁর। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ অভিযানে সাফল্য তো তিনি অর্জন করতে পারলেনই না, তারপর পরাজয় বরণ করলেন। আফগান নেতা আহমদ বঙ্গাস সফদর জঙ্গের আলস্য আর বিলেম্বর অবকাশে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টম্বর উজিরকে (সফদর জঙ্গকে) ভয়ানক ভাবে আহত করে, বাদশাহী ফৌজকে পরাজিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে খবর এসে পৌঁছুল। তুরাণীদের আনন্দ আর ধরল না। জাবিদ খাঁও তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। শত্রু পক্ষ সফদর জঙ্গের প্রকৃত অবস্থা জানাবার জন্য কয়দিন অপেক্ষা করল, অবশেষে তাকে মৃত ভেবে নিয়ে দিল্লীর ইরাণীদের উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করল। অক্টোবরের রাত্রে তারা দিল্লীতে গোলমাল বাধালেন। তাদের উদ্দেশ্য হল ইরাণীদের লুঠ করা।

অক্টোবরের সেই রাত্রে শীতের প্রথম স্পর্শে দিল্লী নগরী জুড়ে এক আলস্যের ছায়া নেমেছে। আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কটাবার সময়। আলিপরিবার সেই মুহূর্তে তাদের সান্ধ্য বৈঠকে বসেছিলেন। নিজের রচনা গজল। গাইছিল গান্নাবানু: "আসমান নীল হল আমারি বেদনা পেয়ে বুঝিরে"—বুলবুল অহংকারের আলোজ্বালা দুটো চোখে তাকিয়ে দেখছিল শুধু। গান্না তার গৌরব। গান্না তার অকাংখার তৃপ্ত। সেই গান্নার কণ্ঠে এই অপ্সরা সুরের যোজনা

করছে সে। সমগ্র হিন্দুস্থানে গান্নার মতন বিদূষী মেয়ে আর কয়জন আছে ?

ধীরে ধীরে গান্নার সুর পরিণতির দিকে নেমে আসছিল। সুরের সেই রেশের মধ্যে শীতের বিষণ্ণ বিকেলের একটা ম্লান স্পর্শ ছিল যেন। আলিকুলির মনের গোপন অন্তঃপুরে সেই সুরের সঙ্গে কোথায় একটা গভীর মিল আছে। এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলেন আলিকুলি। গান শেষ হলে বেদনার্ত্ত একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি শুধু বললেন, বাঃ। গৌরব বুলবুলেরও, তবু কিন্তু সে ঠিক যেন প্রশংসার আবৃত্তিতে ভেঙে পড়ল না। চুপ করেই থাকল শুধু। আলিকুলি তার দিকে একটু তাকালেন, তার পর আবার কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, নতুন গজলটা তো বড় সুন্দর হয়েছে আম্মা।

যেন একটা তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল বুলবুল,-না।

—সেকি !

—হ্যাঁ।

গানের চেয়েও নিজের রচনার প্রতি দরদ বেশী গান্নার। সুরের চেয়েও রচনার মধ্যে যেন প্রাণ বেশী আছে বলে মনে হয় তার। গান গাওয়ার চেয়ে লিখতেই যেন ভাল লাগে। সে রচনার মধ্যে যেন নিজের জীবনেরই কি একটা স্বাদ জড়িয়ে থাকে। তার লেখা গজলের নিন্দে হলে যেন ভয়ানক লাগে গান্নার। সে বলল, কেন, আম্মা ভাল হয়নি।

বুলবুল তেমন তীব্রতা নিয়েই বলল, না। মোটেই না।

গান্নার মুখে যেন একটা বেদনার ছায়া নেমে এল। আলিকুলি কন্যার আর্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে যেন ব্যথা পেলেন। শুধু বললেন, কেন ? শব্দ চয়ন গুলি তো বড় সুন্দর হয়েছে।

বুলবুল একটু কটাক্ষ করে যেন বলল, কিন্তু ভাব ?

আলিকুলি বললেন, ভাব তো অপূর্ব।

—তোমার কাছে হতে পারে, আমার কাছে নয়।

—কেন ?

বুলবুল যেন একটু ব্যস্ত হয়েই বলল, কেন ? গানের মধ্যে শুধু বেদনা থাকবে কেন ? ওর জীবনে কী ব্যথা আছে যে, শুধু বেদনার সঙ্গীত ঝরে পড়বে ? আমি আমার মেয়েকে সুখী দেখতে চাই। যৌবন ও জীবনের চাঞ্চল্যে উচ্ছল দেখতে চাই।

আলিকুলি একবার গান্না তার পর বুলবুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কবিরা চিরকালই নিঃসঙ্গই হয়। একটা অভাব বোধ, বেদনা হয়ে, বিষণ্ন সুরে তাদের কাব্যের মধ্যে ঝরে পড়তে চায়।

বুলবুল বলল, তা যদি হয় তবে গান্নার কবি হয়ে কাজ নেই। আমার বড় ভয় করে। মনে হয় ওর গান যেন ওর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে। না, না, সে বড় ব্যথার।

একটু হাসলেন আলিকুলি, মমতা জাগান একটা দৃষ্টি রাখলেন তিনি গান্নার উপর। তার পর বললেন, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে........

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। হঠাৎ বাইরে বহু কণ্ঠের উন্মত্ত চিৎকার শোনা গেল। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার নীরব মুহূর্ত যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। সেই চিৎকারের পৈশাচিক তীব্রতায় একমুহূর্তে থ'হয়ে গেলেন সবাই। উন্মত্ত চিৎকার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একটা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে গান্না পিতার দিকে তাকাল। বুলবুলের দু'চোখেও ভয় চকিত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল। আলিকুলিও সভয়ে সেই কোলাহলের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকলেন।

বুলবুল বলল, ওকি ?

চিন্তিত মুখে আলিকুলি বললেন, বুঝতে পারছি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল বান্দা। ভাতরে এসেই সে হাঁফাতে লাগল। আলিকুলি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, —কি রে ?—

হাঁফাতে হাঁফাতে বান্দা বলল, সর্বনাশ হয়েছে হুজুর, তুরাণীরা উন্মত্ত হয়ে ইরাণীদের আক্রমণ করেছে।

—সেকি !

—হ্যাঁ হুজুর। উজির সাহেব রোহিলখণ্ডে পরাজিত হয়েছেন। এবার ইরাণীদের উপর আক্রমণ হবে। অনেক বাড়ী এর মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে।

শুনে একমুহূর্ত কেউ আর কোন কথা বলতে পারলেন না। ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত যেন থাকল না ওদের। ভয়ে বুলবুল গান্নাকে জড়িয়ে ধরলেন। গান্নার মুখের প্রশান্তি মিলিয়ে গেছে। অবশেষে আলিকুলি বান্দাকে বললেন, দরওয়াজাটা বন্ধ করেছিস? ভাল করে বন্ধ করবি।

বান্দা চলে গেল। বুলবুল বলল, দরওজা বন্ধ করলেই কি ওদের রোখা যাবে?

আলিকুলি হতবুদ্ধি হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বুলবুল বলল, উজির সাহেব তোমাকে কি বলেছিলেন?

—কি?

—বিপদে পড়লে দারা স্থকোহর প্রাসাদে যেতে বলেছিলেন তিনি। চল আমরা সেখানেই যাই।

বাইরে তখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আলিকুলি বললেন, কিন্তু কি করে যাব?

সেই মুহূর্তে দরওয়াজায় কার করাঘাত শোনা গেল। বুলবুল আর্ত চিৎকার করে গান্নাকে জড়িয়ে ধরলেন। আলিকুলি অসহায় ভাবে শুধু সেই শব্দের দিকে কান পেতে থাকলেন।

বুলবুল বলল, কি করব? চল, ওরা এল বলে।

—কোথায় যাব?

—কিন্তু......., বুলবুল পাগলের মত ভাব করতে লাগল।

সাত রাজার ধন এক মানিক—গান্না, তাকে নিয়েই তার ভয়। দুর্বৃত্তেরা তাকে হয়তো কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সে কথা ভাবতেই যেন তার জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল। পাগলের মত গান্নাকে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

আলিকুলি প্রশ্ন করলেন, ওকি !

—আমি যাই।

—কোথায় ?

আর বুলবুল কোন উত্তর দিতে পারল না।

এবার আলিকুলিই বললেন, তুমি এক কাজ কর, ঘরের মধ্যে কোথাও গিয়ে লুকাও। দেখি কি করা যায়। বুলবুল উঠে দাড়াল। ঠীক সেই মুহূর্তে হাঁফাতে হাঁফাতে বান্দা আবার ছুটে এল। ব্যস্ত হয়ে আলিকুলি জিজ্ঞাসা করলেন, কি সংবাদ ?

—সলাবৎ খাঁ এসেছেন আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য। তাড়াতাড়ি চলুন।

—কোথায় ?

—দারা স্বকোহর প্রাসাদে।

আর কোন প্রশ্ন, আর কোন বিচারের অবকাশ না দিয়ে, আলিকুলি আর বুলবুল গান্নাকে নিয়ে দ্বারের দিকে ছুটলেন। সত্যি সলাবৎ কিছু সংখ্যক অস্ত্রধারী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। একটা পাল্কী গাড়া অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। আর কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়ে সলাবৎ বললেন, উঠে পড়ুন তাড়াতাড়ি।

মন্ত্র মুগ্ধের মত আলিকুলি গান্না, আর বুলবুল, গাড়ীতে উঠে পড়লেন। দ্রুত চলতে লাগল গাড়ী। সমস্ত পথের মধ্যে যেন কেমন বিভৎস নীরবতা। মাঝে মাঝে অনেক দূরে পেছন থেকে কাদের উন্মত্ত চিৎকার ভেসে আসছে। সেই মুহূর্তের কথা ভাবতে গান্নার যেন বারে বারে মনে পড়তে লাগল : রোজকেয়ামতের দিন বুঝি এসে গেছে। বুঝি তারা সব শেষ বিচারের জন্য যাচ্ছে।' আরোহীদের মধ্যেও কোন কথা নেই। শুধু বুলবুল গান্নাকে জড়িয়ে ধরে আছে! তার বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দন অনুভব করছে গান্না। নীরব উৎকণ্ঠায় স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন আলিকুলি আর সলাবৎ খাঁ। দ্রুত অশ্বপদ সঞ্চালনের শব্দ

শোনা যচ্ছে শুধু। এই ভাবে দ্রুত বেগে অন্ধকার কেটে কেটে গাড়ী এগিয়ে চলল। বেশী সময় নয়, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা দারা সুকোহর প্রাসাদের কাছে এসে পড়লেন। এবং তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে গাড়ীটা এক সময় থেমে গেল। সলাবৎ খাঁ তৎক্ষণাৎ নেমে পড়লেন। গাড়ীর দরজা খুলে দাড়াল চালক। সলাবৎ গম্ভীর ভাবে বললেন, আপনারা নেমে আসুন। তৎক্ষণাৎ মন্ত্র চালিতের মত আলিকুলি, বুলবুল আর গান্না নেমে আসলেন। বিরাট দরওয়াজা দুটো খুলে গেল। তারা ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রাসাদ নীরব। কি এক আশঙ্কায় গম্ভীর। যেন দারার বিষাদময় পরিণতি-কেই ধরে দাড়িয়ে আছে। সেই গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দাড়িয়ে আছেন এক প্রবীণা মহিলা। বয়সের ভারে ম্লান হলেও সৌন্দর্য্য তখনো তাকে ত্যাগ করতে চায়নি। দেহের মধ্যে একটা সাবলিল ভঙ্গী। বেণীটি দীর্ঘ হয়ে পিঠের উপর শায়িত। স্তনযুগল, নত হলেও একেবারে পরাজিত নয়। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করার বিষয় তার উজ্বল চোখ দুটো। গান্না সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। সেই মহিলাও গান্নার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখলেন। তাঁর মনে হ'ল, যেন এক টুকরো চাঁদের আলো। চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল বর্ণের কন্যা, কিন্তু জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ। এক মুহূর্ত তিনি দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকলেন। তার স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সলাবৎ খাঁ তাকে সালাম জানালেন। বেগম সাহেবা সফদর জঙ্গের মুখ্যবেগম। সলাবৎ খাঁর সালাম গ্রহণ করে তিনি একজন বান্দাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও এদের ভেতরে নিয়ে যাও।

বান্দা সালাম জানিয়ে বুলবুল বেগম আর গান্নাকে ভেতরে যাবার পথ দেখাল। ওরা আর কোন দিকে না তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল। রইলেন আলিকুলি আর সলাবৎ খাঁ। বেগম সাহেবা সলাবতের দিকে তাকালেন। বললেন, শুনেছি ওরা অল্প কিছুকালের মধ্যেই আমাদের এখানে এসে পড়বে। এর পেছনে জাবিদ খাঁ আর ইন্‌তিজামের

হাত রয়েছে। তুমি কামান গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখ। ভাল করে দরওয়াজা বন্ধ করে দাও। আক্রমণ করবার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ কামান দাগবে। প্রাসাদের ত্রিসীমানায় যেন ওরা ঢুকতে না পারে। হারেমের ব্যবস্থা আমি করছি।

সলাবৎ আদাবের ভঙ্গীতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বেগম সাহেবার আদেশ গ্রহণ করলেন। বেগম সাহেবা একটা গম্ভীর ছন্দে হারেমের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সলাবৎ আলিকুলিকে বললেন, বেগম সাহেবা, সফদর জঙ্গের বেগম।

ছোট্ট করে আলিকুলি শুধু বলেন, বুঝতে পেরেছি।

সলাবৎ বললেন, এরই জন্য উজির সাহেবের এত ভাগ্য। বেগম সাহেবার মত তুটি মেয়েছেলে বর্তমান হিন্দুস্থানে নেই। প্রয়োজন হলে যুদ্ধও করতে পারেন ইনি। বিচক্ষণ। সর্ব দিকে নজর আছে। বিপদের আভাষ পেয়েই আপনাদের আনবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আলিকুলি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। একটা কৃতজ্ঞতায় নীরব হয়ে থাকলেন শুধু।

মুহূর্ত মাত্র। সেই নীরবতা ভেদ করে বহুলোকের উন্মত্ত কণ্ঠ আল্লাহু আকবর বলে চিৎকার করে উঠল। দারা সুকোহর প্রাসাদের কাছে সমস্ত রাত্রিটাই যেন কেঁপে উঠল সে চিৎকার। সমস্ত মুখে তৎক্ষণাৎ একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠল সলাবৎ খাঁর। তিনি রুক্ষ দৃষ্টিতে সেই শব্দ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগলেন। কতগুলি কোলাহল যেন হত্যার নেশায় পাগল হয়ে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। প্রতিশোধের এক আগ্নিক্ষরা ভাব ফুটে উঠল সলাবৎ খাঁর মুখে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আলিকুলি মানুষের এক নতুন রূপ দেখলেন। উন্মত্ত জনতা দেখতে দেখতে দারা সুকোহর প্রাসাদ ঘিরে দাঁড়াল। ধ্বনি তুলল, সফদর জঙ্গ মুর্দাবাদ। ইরাণ সব মুর্দাবাদ। তুরাণ জিন্দাবাদ। ইন্‌তিজাম জিন্দাবাদ। জাবিদ খাঁ

জিন্দাবাদ। উত্তেজিত জনতার হাতে মশাল। মশালের আলোতে দারা সুকোহর প্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। সেই মশাল নিয়ে ওরা প্রাসাদের দিকে এগিয়ে আসতে চাইল। চিৎকার উঠল, ভাঙ্ ভাঙ্ কোতল কর। কাফেরদের হঠাও। সলাবৎ খাঁর হাত কামানের উপর নিসপিষ করতে লাগল।

প্রাসাদের অনুচরেরা সলাবৎ খাঁর দিকে তাকাতে লাগল। নির্দ্দেশ পাওয়া মাত্রই তাদের কামান গুলো থেকে অগ্নি উদ্গীরণ হতে থাকবে।

হঠাৎ প্রাসাদের উপর মহল থেকে কামান গর্জ্জে উঠল। সলাবৎ বুঝলেন বেগম সাহেবা কামান দাগবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের অনুচরদের কামান দাগবার আদেশ দিলেন। এক সঙ্গে কামান গুলো গর্জন করে উঠল—গুড়ুম্, গুড়ুম্। মুহূর্তে একটা আর্ত চিৎকার উঠল জনতা থেকে। তার পর ছিটকে দূরে সরে গিয়ে দাড়াল। কামানের পাল্লার বাইরে গিয়ে থ খেয়ে দাঁড়াল যেন সব। তার পর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মশাল গুলো দীর্ঘ শিখাতে এক জায়গায় স্থির হয়ে জ্বলতে থাকল—যেন হতবুদ্ধি হয়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

নিচে সলাবৎ খাঁ বাঘের মতো দুটো জলন্ত চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন তাদের দিকে। বির্ বির্ করে বলতে লাগলেন, মরদের বাচ্চা হসতো এাগয়ে আয়।

কিন্তু জনতা আর এগিয়ে এল না। এ পর্য্যন্ত নির্বিবাদে তারা ইরাণীদের লুণ্ঠন করে এসেছে। কোথাও বাধা পায়নি। হঠাৎ এরকম অভ্যর্থনা যেন তাদের স্বপ্নের অতীত। এর জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুঠেরারাই এগিয়ে এসেছিল। লুণ্ঠনের নেশা তাদের ছুটে গিয়েছে। তাই দূরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ জটলা করে তারা ধীরে ধীরে একে একে মিলিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে জনতা পাতলা হয়ে গিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিতে দাড়াল। তারপর আরো কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থেকে তারাও মিলিয়ে গেল।

শীতের আবহাওয়াটাও উত্তপ্ত হয়ে ছিল এতক্ষণ। ঘাম ঝরছিল জলাবৎ তাঁর কপাল দিয়ে। হাত দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে তাকালেন আলিকুলির দিকে। আলিকুলির মুখে তখনও কথা নেই। ওদিকে জেনানামহলে তখন যেন এক বিভীষিকার রাজত্ব। বেগমরা ভয়ে কেউ মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন। কেউ বা বিলাপ করছিলেন। এক মাত্র সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বিচরণ করছিলেন বেগম সাহেবা। তখন তার রণরঙ্গিণী মূর্তি। সেই মূর্তির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল বুলবুল আর গান্না। গান্না যে স্বপ্ন নিয়ে যৌবনের প্রান্তে এসে উপস্থিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে এ-জীবনের কোন পরিচয় নেই। সে সৃষ্টি করতে শিখেছে, ধ্বংশ করতে তো শেখেনি। সে ভালবাসতে শিখেছে, যুদ্ধ করতেতো শেখেনি। তাই তার পবিত্র দুটি চোখ বিমূঢ় হয়ে নারীর সেই রণরঙ্গিণী বেশ দেখছিল। একটা অভূতপূর্ব ভয়। অথচ অদ্ভুত এক অব্যক্ত ভাব, তার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। তার সমস্ত সহের উপর সে যেন একটা বিরাট চাপের মত কাজ করছিল। তাই আক্রমণকারীরা হঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার পূর্বেই তার দুর্বল স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। বুলবুল চিৎকার করে উঠল,—গান্না, গান্না।

সে আর্ত চিৎকারে চমকে উঠলেন বেগম সাহেবা। ফিরে তাকালেন তিনি বুলবুলের দিকে। দেখলেন গান্না তার কোলে শুয়ে এক নিথর নদীর মত স্থির হয়ে পড়ে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন।
—কি হয়েছে ?

বুলবুল ভয়চকিত দৃষ্টিতে বেগম সাহেবার দিকে তাকিয়ে বলল, ভয়ে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

এক মুহূর্তে বেগম সাহেবা তার নারীসত্বার মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি নিজে গান্নাকে তুলে নিলেন কোলের মধ্যে—আহা, বাছা আমার।

পাশে হতভম্ব যে বাঁদী অপেক্ষা করছিল, তাকে ধম্‌কে উঠলেন, দাড়িয়ে কি দেখছিস! যা পানি নিয়ে আয়।

তৎক্ষণাৎ বাঁদী পানি আনতে ছুটল।

বুলবুলের সমস্ত মুখখানা যেন পাংশু হয়ে গেছে, বেগম সাহেবা সে দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয় নেই। এক্ষুণি ভাল হয়ে যাবে। আম্মার আমায় হৃদয়টা বড়ই কোমল।

কথা বলতে বলতে বাঁদী পানি নিয়ে এল। মুখে চোখে কয়েকবার ঝাপটা দিতেই গান্নার চেতনার লক্ষণ পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে মুদ্রিত চোখ দুটি খুলতে লাগল সে। যেন একটি পদ্মের পাঁপড়ী মেলা দেখতে লাগলেন বেগম সাহেবা। গান্না চোখ মেলতেই তার চোখে চোখে মিলে গেল। গান্না দেখল, এক অপূর্ব স্নিগ্ধ লাবণ্যময়ী রমণী। তার সমস্ত দেহ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে মধুর মাতৃত্ব। তাকিয়ে কিছুটা বিহবল হয়ে থাকল সে। বেগম সাহেবাও কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। হঠাৎ গান্না যেন তার সাধারণ বুদ্ধিতে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চাইল সে। বাধা দিলেন বেগম সাহেবা, না। এখনও নয়। শুয়ে থাক।

কিন্তু কেমন লজ্জা পাচ্ছিল গান্না। সে উঠে দাঁড়াতে চাইল। বেগম সাহেবা তার কপালে হাত রেখে বললেন, লজ্জা কি! আমি তোমার আম্মা।

গান্না আর জোর করতে পারল না। একটা স্নিগ্ধ কোলের মধ্যে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে রাখল সে। বেগম সাহেবা তার অপূর্ব মুখ লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন, একি তাঁর পুত্রবধু হইতে পারত না! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি সে কথা মনে পড়তে। এমন সময় বুলবুল বলল, আমরা এবার তাহলে যেতে পারি? আশ্চর্য্য হয়ে বেগম সাহেবা বললেন, কোথায়?

—কেন, বাড়ী?

হাসলেন বেগম সাহিবা। বললেন, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? এতক্ষণ কি তোমাদের বাড়ীর আর আছে কিছু? লুঠেরারা লুঠ করে

নিয়েছে। উজির সাহেব অর্থাৎ সফদর জঙ্গ না আসা পর্যন্ত তোমাদের কোথাও যাওয়া হবে না।

মুহূর্তে বুলবুলের মুখে একটা বিষণ্ণ বেদনা নেমে আসল। তার এত সাধের সাজানো গৃহ তবে আর নেই!

সেই কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে বেগম সাহেবা বললেন, কিচ্ছু ভয় কোর না। সঙ্কোচ বোধ কোর না। জেন, আমি তোমাদের পর নই।

বুলবুল অশেষ বিনয়ের ভাব দেখিয়ে বলল, তা জানি। আপনাদের মেহেরবানি অশেষ। আপনাদের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারব না।

বেগম সাহেবা হাসলেন, বললেন, থাক, হয়েছে। এবার চুপ করতো! নিজের দুটো করতলে তিনি গান্নার কপোল দু'খানি স্পর্শ করলেন।

॥ পনের ॥

সফদর জঙ্গ দিল্লীতে ফিরে এলেন। পথে আসতেই তিনি শুনতে পেলেন যে তার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তুরাণীরা ইরাণীদের খুন করেছে। শুধু তাই নয়, তার নিজের আবাস দারা সুকোহর প্রাসাদ আক্রমণ করেছে লুঠেরারা। তিনি উজির হবার পর লালকেল্লা থেকে দারা সুকোহর প্রাসাদে এসে বাস করছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি নূতন দিল্লীর দিকে ছুটে আসলেন এবং ২০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর অপর প্রান্তে এসে শিবির গড়লেন। তৎক্ষণাৎ দিল্লীতে প্রবেশ করতে সাহস পেলেন না। শত্রুদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করলেন। বুঝলেন, তুরাণী দল সামরিক দিক থেকে তেমন শক্তিশালী নয়। দাক্ষিণাত্যে নিজামের অধীনে কোন বাহিনী না এসে পৌঁছালে তুরাণীদলের শক্তি বৃদ্ধি হবার উপায় নেই।

তিনি শিবির গড়তেই সলাবৎ খাঁ এসে তার সঙ্গে দেখা করলেন। ব্যস্ত হয়ে সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, কি সংবাদ?

সলাবৎ বললেন, আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম।

—কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—না। বেগম সাহেবার সাহসের জন্য আমরা বেঁচে গেছি।

কিন্তু………

চমকে উঠলেন উজির, কিন্তু কি?

—দিল্লীর অন্যান্য ইরাণীদের মধ্যে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারো সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়েছে। কারো····

মনের মধ্যে একটু কেঁপে উঠলেন, সফদর জঙ্গ। সেই মুহূর্তে আলিকুলি, গাম্না, বুলবুল প্রভৃতির প্রিয় মুখগুলি ভেসে উঠল তার মনের মধ্যে।

তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আলিকুলির খবর কি? ভাল আছে তো?

সলাবৎ বললেন, খোদার দোয়ায় বহাল তবিয়তেই আছেন। বেগম সাহবা বিপদের আভাষ পেয়েই প্রাসাদে এনে রেখেছিলেন তাদের।' সফদর জঙ্গ যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এবার তিনি অন্যকথা পাড়লেন। বললেন, দিল্লীর অবস্থা এখন কি?

সলাবৎ বললেন, আপাতত শান্ত। আমাদের আক্রমণ করবার সাহস আর তাদের নেই। আপনি এসে পড়েলেন, এখন আর ভয়ের কোন প্রশ্নই নেই।

সফদর জঙ্গ দরবারের প্রশ্ন ভাবছিলেন। বললেন, বাদশার মনের খবর কি? তিনি কি····

সলাবৎ বললেন, সেটা ঠিক বলতে পারব না। কয়দিন দরবারে যেতে পারেননি। তবে মনে হচ্ছে বাদশা এখন ইন্‌তিজামের কথামত চলছেন।

একটু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন সফদর জঙ্গ,—তারপর?

—তারপর ঠিক কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

—তোমার কি মনে হয়, আমি রাজধানীতে প্রবেশ করলে তুরাণীরা বাধা দেবে?

সলাবৎ বললেন, না। সে সম্ভাবনা নেই, কারণ তুরাণীদের হাতে কোন সৈন্য নেই। দাক্ষিণাত্য থেকে নিজামকে আসতে লিখেছে ওরা। নিজামের এখন আসা সম্ভব নয়।

ভাবতে লাগলেন সফদর জঙ্গ। এক মুহূর্ত নীরব থাকলেন দু'জনে। সলাবৎই, প্রথম কথা বললেন। বললেন, আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আপনার যা কিছু করবার তা করতে হবে।' প্রশ্ন করলেন সফদর জঙ্গ, কি রকম?

—নিজাম পৌঁছুবার আগেই বাদশার দরবারে যেতে হবে।

বাদশাকে হাত করতে হবে। নিজাম এসে গেলে তা' আর সম্ভব হবে না।

মাথাটা ঝেঁকে ঝেঁকে কি ভাবতে লাগলেন সফদর জঙ্গ। তার পর বললেন, জাবিদ খাঁকে হাত করতে হবে।

সলাবৎ বললেন, জাবিদ খাঁও আমাদের বিরুদ্ধে বলে মনে হচ্ছে।

একটু হাসলেন সফদর জঙ্গ। বললেন, ওতে ভাবনার কিছু নেই। জাবিদ খাঁকে সহজেই হাত করা যাবে। একটু ভয় দেখালেই হল, তার স ঙ্গে একটু অর্থের লোভ দেখালে তো কথাই নেই।

সলাবৎ উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। বা ন্দা এসে সালাম জানাল উজির সাহেব কে।

একটু ব্যস্ততার ভাব ফুটে উঠল সফদর জঙ্গের চোখে মুখে, কি খবর ?

বান্দা সালাম জনিয়ে বলল, দরবার থেকে আপনার কাছে লোক এসেছে।

তপ্ত তেলের মধ্যে যেন জল পড়ল। ছিটকে উঠলেন সফদর জঙ্গ। তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন, যাও নিয়ে এস।' বান্দা চলে গেল। সফদর জঙ্গ প্রশ্নের ইসারা নিয়ে সলাবৎ এর দিকে তাকালেন। কিছু আন্দাজ করতে না পেরে সালাবৎ বলল, বুঝতে পারলুম না। তার কথা শেষ হতে না হতে দরবারের দূত এসে সালাম জানিয়ে দাঁড়াল।

সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর ?

পত্র বাড়িয়ে ধরল দূত।

পত্র খানা নিয়ে কম্পিত হস্তে খুলতে লাগলেন সফদর জঙ্গ। তার পর দ্রুত পড়তে লাগলেন। বাদশার নিজের ফরমান।

বাদশা লিখেছেন।

জনাব সফদর জঙ্গ, (উজির সাহেব বলে উল্লেখ করেননি। পড়তেই অমঙ্গল আশঙ্কায় সফদর জঙ্গের বুকটা কেঁপে উঠল। তিনি পড়তে লাগলেন।) এতদ্বারা আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আপনি দিল্লী

দরবারে প্রবেশ করিবেন না। দরবারের নিয়ম অনুযায়ী পরাজিত উজির কখনো বাদশার দরবারে স্থান পান না। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে আপনার পরিবার ও সঙ্গীগণ সহ দিল্লী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা যাইবেন বাদশাহী ফরমানের অন্যথা হইবে না আশাকরি।

মহামান্য বাদশা,—

আহমদ শাহ।

পত্র পড়ে ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় কাঁপতে লাগলেন সফদর জঙ্গ। অবস্থা দেখে সলাবৎ ইংগিতে দূতকে একটু বাইরে যেতে বললেন। তার পর নিজে পত্র খানা নিয়ে পড়তে লাগলেন। ইতি মধ্যে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন সফদর জঙ্গ। বললেন কি মনে হয়?

সলাবৎ উত্তর দিলেন, সব ইন্‌তিজামের কারসাজি।

—আমি কি করব?

—এ আদেশ মানবেন না।

—তার পর?

—বাদশা কিছু বললে যুদ্ধের হুমকি দেবেন।

সফদর জঙ্গ বললেন, তা'তো বুঝলুম। আর?

—বলুন।

—এখন কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে?

সলাবৎ চট করে আর উত্তর দিতে পারলেন না। সফদর জঙ্গ নিজেই বললেন, জাবিদ খাঁকে লিখতে হবে।

—কি লিখবেন?

সফদর জঙ্গ বললেন, দেখি কি লেখা যায়।

তিনি তৎক্ষণাৎ কলম আর কাগজ চেয়ে নিয়ে লিখতে বসলেন। এবং ছোট্ট একটু কথা লিখলেন মাত্র। তার পর বান্দাকে বললেন, যা ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

বান্দা ছুটে গেল দূতকে ডাকতে। সলাবৎ প্রশ্ন করলেন,—কি লিখলেন ?

সফদর জঙ্গ পড়ে শোনালেন। "খান সাহেব জাবিদ খাঁ। দরবারে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলেছে জানতে পারলুম। আপনারা আমাকে মৃত বলে ভেবেছেন। তবে মনে রাখবেন যদিও আমি মৃত, তথাপি দরবারের সকল লোক অপেক্ষা শক্তিশালী। সেই অনুযায়ী কাজ করবেন। অবশ্য যদি বিনা রক্তপাতে আপনি এর মিমাংসা করতে পারেন তবে আপনার অধিক লাভালাভের কথা আমি বিবেচনা করব। সত্তর লক্ষ টাকার যে দাবীটা আপনি তুলেছিলেন আমি বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব।

ইতি,—

উজির সফদর জঙ্গ।

সলাবৎ শুনলেন। সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, কেমন মনে হয় ?' সলাবৎ বললেন, কাজ হবে। এ পথই শ্রেষ্ঠ পথ। যদি না হয় তবে তরবারি খোলা যাবে।

কথা বলতে বলতে পত্র বাহক এসে উপস্থিত হল। সফদর জঙ্গ তার হাতে পত্রখানা দিলেন। বললেন, পত্রখানা জনাব জাবিদ খাঁকে দেবে। এবং তিনি যে পত্র দেবেন তা দরবারে পৌছে দেবে।

সালাম জানিয়ে পত্র বাহক চলে গেল।

সফদর জঙ্গ সলাবতের মুখের দিকে তাকালেন।

আরো দু'দিন উজির সাহেবকে দিল্লীর প্রান্তে শিবিরে কাটাতে হল। অবশেষে দরবার থেকে বাদশার অনুমোদন পত্র এল। বাদশা জনালেন যে, বিশেষ ক্ষমতা বলে তিনি সফদর জঙ্গকে দরবারে প্রবেশ করতে দেবেন। সফদর জঙ্গ মনে মনে হাসলেন, বিশেষ ক্ষমতা যে কি তা তিনি -বিলক্ষণ জানেন। তিনি শিবির উঠালেন। তবে তৎক্ষণাৎ দরবারে গেলেন না, কারণ হারেমের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে সেখানে গাম্মা রয়েছে শুনে তিনি আরো

আগ্রহী হয়েছেন। সুতরাং প্রথম তিনি দারা স্থকোহর প্রাসাদের দিকেই চললেন। দিল্লীর পথে আবার সেনা বাহিনী দেখা গেল, তবে তুরাণীদের উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে নয়। পথে পথে সবাই অগ্রহ নিয়ে বসে ছিলেন। ইরাণীরা ভাবছিলেন সফদর জঙ্গ আসবেন। তুরাণীরা ভাবছিলেন দাক্ষিণাত্য থেকে নিজাম আসবেন।

তুরণী-ইরাণী সকল দিল্লাবাসী তাই একটা তীব্র কৌতূহল নিয়ে তাকাল আগত বাহিনীর দিকে। কিন্তু তুরাণীদের হতাশ করে দিয়ে সফদর জঙ্গের জয়ধ্বনী দিয়ে, রাজপথ দিয়ে বাহিনী দারাস্থকোহর প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। অনেক দিন পর রাহু মুক্ত চন্দ্রের মত ইরাণীদের মুখে হাসি ফুটল। দীর্ঘ দিন পর দারা স্থকোহর প্রাসাদের দরওয়াজা খুলল। দীর্ঘদিন পর আনন্দ ধ্বনি উঠল সফদর জঙ্গের হারেমে। আলিকুলির পরিবার সে আনন্দে যোগ দিল। বহু দিন পরে আজ হাল্কা মনে গান্নার মুখে হাসি ফুটল। বেগম সাহেবার কোল ঘেঁষে সে দাঁড়াল প্রত্যাগত উজির সাহেবকে সংবর্ধনার জন্য।

সফদর জঙ্গ হারেমে এলেন। মনে মনে পবিত্র যে সুন্দর মুখখানা তিনি কল্পনা করে আসছিলেন দেখতে পেলেন তার বেগমের কোল ঘেঁষে একটা পূর্ণ চন্দ্রের মত সে মুখ স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। বেগম সাহেবা সালাম জানালেন। নত হয়ে সেলাম জানাল গান্নাও। সস্নেহে হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে গান্নার চিবুকখানি স্পর্শ করলেন সফদর জঙ্গ, গান্না পিতৃপ্রতিম এই উজিরের মুখের দিকে তাকাল। দুটো বৃহৎ, উজ্বল চোখের দৃষ্টিতে তার দৃষ্টি বেঁধে গেল। সফদর জঙ্গ ডাকলেন, আম্মা—

কোন কথা যেন আর বলবার থাকলনা সফদর জঙ্গের। তিনি বাক্য হারিয়ে ফেললেন। শুধু তাকিয়ে থাকলেন গান্নার মুখের দিকে।

সে দৃশ্য দেখলেন বেগম সাহেবা। উপভোগ করলেন তিনি। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে তিনিই বললেন, তোমার আচ্ছা মেয়ে—

এবার হেসে বেগম সাহেবার দিকে ফিরে তাকালেন সফদর জঙ্গ।

কেন ? কি হল।

একটা কৃত্রিম তিরস্কারের ভঙ্গীতে বেগম সাহেবা বললেন, মুসলমানের মেয়ে এমন হয় শুনিনিতো বাপু। বিশেষ করে ইরাণী মেয়ে।

—কেন ?

বেগম সাহেবা বললেন, ওহ, কি ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিল। কৌতুক ভরা মুখে গান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সামান্য হল্লাতেই যে তোমার আম্মা মুর্চ্ছা যান।

—হুঁ—সফদর জঙ্গ গান্নার মুখের দিকে তাকালেন।

গান্নার সমস্ত মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল।

বেগম সাহেবা বললেন, দিল্লীর মেয়েছেলে এত ভীতু হয় তা জানতুম না। এই দিল্লীতে রাজিয়া সুলতানা হয়েছেন। নুরজাহান রাজ্য চালিয়েছেন। ভয়ের কাছে দিল্লীর মেয়েরা নতি স্বীকার করেনা। বেগম সাহেবা গান্নার মুখের দিকে তাকালেন। গান্না আরো লজ্জা পেল। কিন্তু গান্নার সমর্থনে এগিয়ে এলেন সফদর জঙ্গ নিজে। বল্লেন, —তাতে লজ্জার কি আম্মা ? সে তোমার গৌরব। সমস্ত দিল্লাতে মেয়ে বলতে যদি কেউ থেকে থাকে, সে তুমি। তরবারি ধরবার জন্য আল্লা সৈনিক স্মৃষ্টি করেছেন, নির্ভিক থাকবার জন্য পুরুষ তৈরী করেছেন। ভয় পাবার জন্য, আর আশ্রয় পাবার জন্যইতো নারী। নারী হবে পেলব, নারী হবে কোমল, নারী হবে সুন্দরী…………

সফদর জঙ্গ তাকালেন বেগম সাহেবার দিকে—বলতো সে রকম মেয়ে গান্না ছাড়া আর এই তামাম হিন্দুস্থানে কে আছে ? বেগম সাহেবা এবার হাসলেন। গান্নার চিবুকে হাত রেখে বললেন,—তামাম দুনিয়ায় কে আছে ? তিনি গান্নাকে তার বুকের কাছে টেনে ধরলেন।

সফদর জঙ্গ বললেন, সেকি ? তুমিও ধরা পড়েছ ?

বেগম সাহেবা বললেন, কি করি বল ? ওযে চাঁদ। আমি সমুদ্র। টানলে কি আর থাকতে পারি ?

সফদর জঙ্গ এবার বিশেষ জোর দিয়ে কথা বললেন, বেশ বলেছ. ঠিক ধরেছ। মা না হলে মায়ের কথা কেউ বলতে পারে? আমার হৃদয় অধৈর্য হলেও তো এমন উপমা দিয়ে মনের কথা বলতে পারবনা।

বেগম সাহেবা বললেন, যাক হয়েছে। কাব্য রাখ।' গান্না বেগমের বুকের উত্তাপে নিজেকে উপভোগ করতে লাগল। সফদর জঙ্গ তবু চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, কিন্তু ভাবছি—সত্যি-কারের যে মেয়ে, তার সত্যিকারের ছেলে পাওয়া যায় কোথায়?' গান্না এবার ছুটে পালাতে চাইল। কিন্তু বেগম সাহেবা ধরে রাখলেন তাকে। গান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে সফদর জঙ্গকে লক্ষ্য করে বললেন, কেন ছেলে খুজতে হবে নাকি?

—না হলে?—

—ফুলের যদি গন্ধ থাকে মৌমাছি এমনি জুটে।

—কিন্তু অনেক ভীমরুলও তো এসে ভুল করে বসতে পারে?

বেগম সাহেবা বললেন, আল্লা করুন, তেমন নসিব যদি হয়, তখন তার দাওয়াই আছে।

সফদর জঙ্গ সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি দাওয়াই?

—দাওয়াই তুমি! তুমি বসে পাহারা দেবে। দেখবে যেন ভীমরুল কাছে আসতে না পারে।

—ও বাবা, তাহলে যে এ ফুল মাথায় নিয়ে ঘুরতে হবে।

—নিশ্চয়ই? তুমি কি ভেবেছ, ফেলে দেবে নাকি?

সোহাগ করে বেগম সাহেবা বললেন, এ ফুল আমাদেরই।

দীর্ঘ দিন পরে সফদর জঙ্গের হৃদয় যেন তৃপ্ত হল আজ। এমন এক স্নেহের পুতুলকে কেন্দ্র করে অনেক আশা ছিল তাঁর। আল্লা গান্নাকে তার পুত্র বধূ করেননি, কিন্তু কন্যার অধিক করে পাঠিয়েছেন। সেই মুহূর্তে তুরাণীদেরও যেন আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হোল। যদি তারা লুণ্ঠন না করত, তবে কি গান্না তার হারেমে আসত?

আসলেও কি থাকত সে! এ তাঁর আশীর্ব্বাদ। গাম্নাকে ঘিরে তাঁর মনে সেই সময় যে স্নেহের রস সঞ্চারিত হচ্ছিল, তা যেন মুহূর্তে পরাজয়ের গ্লানী, অপমানের লাঞ্ছনা দূর করে দিল তাঁর। বাবর পানিপথ জয় করে যা পাননি, কার্নালে জয়ী হয়ে নাদির যা পাননি, তাই পেলেন সফদর জঙ্গ। পেলেন এক প্রশান্ত তৃপ্তি।

হারেমে আসা তাঁর সার্থক হল। সেই স্নিগ্ধ তৃপ্তি পেয়ে তিনি হারেম থেকে নতুন বল নিয়ে ফিরলেন। নতুন উৎসাহ নিয়ে তিনি বাইরে ইরাণীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চললেন।

॥ ষোল ॥

দিল্লীর অবস্থা শান্ত হলেও আলিকুলিদের আজো ফিরে যেতে দেননি সফদর জঙ্গ। কেন তা তিনিই জানেন। আলিকুলি অবশ্য ফেরবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফদর জঙ্গ সে কথা কানে তোলেন নি। সফদর জঙ্গের স্নেহের দাবী এত প্রবল যে আলিকুলি তাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু বুলবুলের মোটেই ইচ্ছা ছিল না দারা স্বকোহর প্রাসাদে সে থাকে। এর কারণ এই নয় যে, সফদর জঙ্গের স্নেহকে সে উপেক্ষা করতে চায়। অথবা তাঁর স্নেহের মূল্য দিতে সে নারাজ। কতগুলো বিশেষ কারণে তার ঠিক সেখানে ভাল লাগছিল না। প্রথম কারণ স্বাধীনতার অভাব। স্বাধীনতার অভাব এই কারণে নয় যে, সফদর জঙ্গ তাদের উপর কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। বরং তিনি তাদের স্বাধীনতার সব ব্যবস্থা একটু বেশী করেই করে দিয়েছেন। কিন্তু পরিচিত পরিবেশ না হলে, শুধু তাদের নিজেদের একটি নিভৃত পরিবেশ না হলে, যেন স্বাধীন ভাবটা অনুভব করা যায় না। বুলবুলের সেতারের তারে তাই ধূলো জমেছে। নূপুর যেন মৌন সন্ন্যাসী। জীবনের উত্তাপ যেন শীতল। বেগম সাহেবার এমন ব্যক্তিত্ব যে, তাঁর আওতায় থেকে তাকে মা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে, গৃহিণীর কর্তৃত্ব নিয়ে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ান চলে না।

এসবের উপরেও একটা দুর্বল সন্দেহ আর ঈর্ষা বুলবুল পোষণ করছিল বুলবুল সফদর জঙ্গ আর বেগম সাহেবার প্রতি। তারা যেন বুলবুলের চেয়েও গান্নার বেশী আপন। কেন? তার মাতৃহৃদয় তাই ঈর্ষা বোধ করে। তা ছাড়া গান্নাও যেন ওদের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ছে। এক মুহূর্ত ওদের ছেড়ে থাকতে পারে না। কি করবেন উজির সাহেব গান্নাকে নিয়ে? তাঁর মনে কি কোন........। আজোকি

তিনি সুজার সঙ্গে........। এ চিন্তাটাই বুলবুলের বেদনাদায়ক আর যাই হোক, বহু পত্নীর ঘর গান্নাকে তিনি করতে দেবেন না। তিনি যেমন আলিকুলির মাত্র এক এবং একক, তেমনি গান্নাও হবে কোন পুরুষের একমাত্র আশ্রয় আর আকর্ষণ। তাই উজির সাহেবকে তার সন্দেহ। তাই ভয়। তাই ঠিক আর থাকতে ইচ্ছে নেই বুলবুলের। একদিন তাই নিভৃতে আলিকুলিকে সে বলল, শুনছ?

—বল।

—আর কত দিন এখানে থাকবে?

—যতদিন ওঁরা যেতে না দেন।

—আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না।

—কেন?

—ওদের মতলব আছে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। ওঁরা আমার গান্নাকে চায়।

—সেত চায়ই।

—কিন্তু কি ভাবে চায় জান?

—বল।

—ওরা চায় ওকে পুত্র বধূ রূপে?

—ভালই তো।

—বিস্ফোরিত দুটো চোখে বুলবুল তাকায় স্বামীর দিকে।

—একি বলছ তুমি।

—কেন?

—বহু বেগমের হারেমে যাবে গান্না!

—কেন তাতে ক্ষতি কি?

—না, না, না, না, চিৎকার করে উঠে বুলবুল।

আলিকুলি বুলবুলের মুখে হাত দিয়ে থামান। চুপ্। তুমি পাগল হয়েছ? ওরা তেমন নয়। আর তা ছাড়া উজির সাহেব কথা দিয়েছেন।

—কি কথা দিয়েছেন ?

—তিনি গাম্নার সাদির ব্যবস্থা করবেন।

—বুলবুল প্রশ্ন করে, কেন—তিনি কেন ? তুমি নেই ?

—আমি শাহজাদা পাব কোথায় ?

—বুলবুল জানায়, না, আমার ভাল লাগছে না। যদি ওরা........

—তা হলেও উজির সাহেবের কথা ঠেলে আমি যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাদের পুরানো বাসা তো আর নেই। লুঠেরারা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গেছে।

একটা বেদনাহত দৃষ্টিতে বুলবুল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

॥ সতের ॥

ভাগ্য মানুষের সঙ্গে নানা ভাবে শত্রুতা করে। কখন শত্রুকে মিত্র করে, আবার মিত্রকে শত্রুতে পরিণত করে। যে মানুষের হৃদয়ে স্নেহ প্রবল, প্রতারিত হন তাঁরাই বেশী। ভাগ্য সফদর জঙ্গকে প্রতারিত করল ২৯শে অক্টোবর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দ। দিল্লাতে খবর আস্‌ল নিজাম গাজিউদ্দিন আহমদ খাঁর মৃত্যু হয়েছে। ইরাণীদলের অতবড় শত্রু আর নেই! দিল্লার তুরাণী দল এবার অসহায় হলেন। ইরাণীদের সৌভাগ্য। সংবাদ শুনে সফদর জঙ্গও একটু উৎফুল্ল হয়েছিলেন বৈকি, কিন্তু—আল্লা অন্যরূপ ভেবেছিলেন।

বেশ একটা সুস্থ মন নিয়ে হারেমে ছিলেন সফদর জঙ্গ।

আলোচনা করছিলেন বেগম সাহেবার সঙ্গে।

হঠাৎ বাঁদী এসে সংবাদ জানাল, জনাবকে বাইরে একবার প্রয়োজন। তখন কেবল সকাল হয়েছে। এত প্রাতঃকালে তাঁর কাছে কে এল! ভেবে সফদর জঙ্গ একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন, প্রাতঃকালে আবার কে এলরে?' জানিনা জনাব। সলাবৎ খাঁ বললেন, কে একটি ছেলে আপনার জন্য বসে আছে।

সফদর জঙ্গ বললেন, যা, ওকে পানি দিতে বল। বিশ্রাম করুক আমি যাচ্ছি।

বাঁদী সালাম জানিয়ে বাইরে এল।

বাইরে দারা স্তুকোহর প্রাসাদের দরওয়াজার সামনে তখন সত্যি এক ঘটনার অবতারনা হয়েছিল। দরওয়াজার সিঁড়িতে বসে আছে এক অপূর্ব সুন্দর যুবক। বয়েস পনের কি ষোল হবে। দেখলে কোন শাহজাদা বলেই বোধ হয়। হ্যাঁ, শাহজাদা গোত্রীয়ই। শিহাবুউদ্দিন। মৃত নিজাম গাজিউদ্দিনের পুত্র।

আশ্চর্য ব্যাপার! সে এখানে কেন? তুরাণী নেতার পুত্র কেন ইরাণী শত্রুর সঙ্গে! সলাবৎ খাঁ বললেন, তুমি এসে ঘরে বোস। শিহাবুউদ্দিন বলল, না।

—কেন?

—যতক্ষণ পর্যন্ত খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা না হবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাইরেই থাকব।

সলাবৎ বললেন, খাঁ সাহেবকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসবেন। তুমি ভেতরে এস।

শিহাবুউদ্দিনের সেই একই উত্তর, না।

এমন সময় বাঁদী এল সেখানে। জনাব, উজির সাহেব ওকে বসতে বলেছেন আর পানি দিতে বলেছেন।

সলাবৎ বললেন, শুনলেতো? এস।

শিহাবুদ্দিনের সেই এক উত্তর, না।

সলাবৎ বললেন, সেকি! এতবড় একজন লোকের পুত্র হয়ে তুমি সিঁড়িতে বসে থাকবে, সেটা কি শোভন?

শিহাবুদ্দিন বলল, শোভন কি অশোভন জানি না। খাঁ সাহেবকে না দেখে আমি উঠব না।

অগত্যা' হাল ছাড়তে হল সলাবৎ খাঁকে। তিনি আবার বাঁদীকে পাঠালেন জেনানা মহলে। বলে দিলেন, বলবে, নিজাম গাজিউদ্দিনের ছেলে শিহাবুদ্দিন এসেছে দেখা করতে।' বাঁদীকে দেখেই বলে উঠলেন সফদর' জঙ্গ, কিরে পানি দিয়েছিস?' বাঁদী বলল, কোন কিছুই গ্রহণ করছেন না তিনি। সেই সিঁড়িতে বসে রয়েছেন। বলছেন আপনাকে না দেখে উঠবেন না।

ব্যাপারটা যেন একটু রহস্যময় ঠেকল। সফদর জঙ্গ প্রশ্ন করলেন, ছেলেটা কে?

—নিজাম গাজিউদ্দিনের পুত্র শিহাবুদ্দিন।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না সফদর জঙ্গ।

সেকি! তার প্রবলতম শত্রুর পুত্র তার প্রাসাদের দরওয়াজাতে বসে থাকবে, সেকি! তৎক্ষণাৎ তিনি উঠে পড়লেন। বাঁদীকে বললেন, চল। বাঁদীর সঙ্গে তিনি প্রাসাদের দরওয়াজাতে এলেন।

তাঁকে দেখেই শিহাবুদ্দিন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। আর ছুটে এসে দুহাতে উজির সাহেবের পা দুটি জড়িয়ে ধরল। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হতভম্ব উজির জিজ্ঞেস করলেন, কি, কি হয়েছে? শিহাবের দুচোখে জল পড়ল। সেই অশ্রু আপ্লুত চোখে সফদর জঙ্গের মুখের দিকে তাঁকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, আপনি আমার আব্বাজান। নিজাম গাজিউদ্দিন আপনার ভাই। সুতরাং তার মৃত্যুতে আমি প্রকৃত পক্ষে আমার চাচাকে হারিয়েছি। আপনিই এখন আমার রক্ষা কর্তা।

সফদর জঙ্গ হাত ধরে শিহাবকে উঠাতে চাইলেন। শিহাব উঠবার চেষ্টা দেখাল না।

উজির সাহেব বললেন, ওঠ।

শিহাব বললেন, আপনি আগে কথা দিন যে, আপনি আমার আব্বাজান। আপনি আমাকে রক্ষা করবেন!

সফদর জঙ্গের হৃদয় বড় দুর্ব্বল। স্নেহরস একটু বেশী। তিনি আর থাকতে পারলেন না। কোন সন্দেহ নিয়ে প্রশ্নটাকে বিচার করলেন না। বললেন, বেশ, আল্লার নামে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, তোমাকে আমি পুত্র বলে গ্রহণ করলাম। কথা দিচ্ছি, তোমাকে রক্ষা করব।

এবার শিহাবুদ্দিন উঠে দাঁড়াল।

সফদর জঙ্গ বললেন, চল ভেতরে চল।

বৈঠক খানায় এসে বসলেন ওরা সব।

সলাবৎ খাঁ বললেন, এবার তোমার কথা বল।

বাধা দিলেন উজির সাহেব। অনেকটা বেলা হয়েছে তখন।

সকাল নয়টা। বললেন তিনি, আগে নাস্তাপানি দাও, দেখছনা মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ খাবার আনা হোল। ক্লান্ত শিহাব পানি গ্রহণ করল। সে একটু সুস্থ হলে সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন :

—কখন এসেছ ?

—খুব ফজিরে।

—এবার ব্যাপার কি বল।

শিহাব বলল—আব্বাজানের মৃত্যুর সংবাদ পাবা মাত্রই চাচাজান ইন্‌তিজাম দিল্লীতে আমাদের প্রাসাদ লুঠ করবার বন্দোবস্ত করছেন। তিনি আমাকেও হত্যা করতে চান। আমাদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য আর নিজামের পদপ্রার্থী তিনি। বলতে বলতে শিহাবের চোখ দুটি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে এল। সে কেঁদে বলল, আপনি আমার আব্বাজান। আপনি আমাকে বাঁচান।

সফদর জঙ্গ সান্ত্বনার ভঙ্গীতে শিহাবের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় নেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি আমার পুত্র। তোমার জীবন, তোমার সম্পত্তি, সব আমি রক্ষা করব। এমন কি বাদশাকে বলে দাক্ষিণাত্যে তোমাকে নিজামও নিযুক্ত করব।

কৃতজ্ঞতায় শিহাব সফদর জঙ্গের পাদুটি জড়িয়ে ধরল।

সফদর জঙ্গ তুলে ধরলেন তাকে। চিবুক ধরে মুখখানা তুললেন। ষোড়শ বর্ষীয় বালকের কোমল আর সুন্দর মুখখানি। দেখলে স্নেহ হয়, মমতা হয়। উজির সাহেব বললেন, চল।

—কোথায় ?

হাসলেন একটু সফদর জঙ্গ, কেন, তোমার আম্মাজানের কাছে! একটু লজ্জা পেল শিহাব, বলল, চলুন।

শিহাবুদ্দিনকে নিয়ে জেনানা মহলের দিকে চললেন সফদর জঙ্গ। সে দিকে তাকিয়ে একটু ভ্রুকুটি করলেন সলাবৎ খাঁ। এতটা তাঁর কাছে ভাল মনে হচ্ছে না। শত্রুকে আবার স্নেহ কিসের!

কিন্তু সে প্রশ্ন সফদর জঙ্গের নেই। পরকে আপন করে নেওয়াই তার স্বভাব। তিনি সৈনিক, আশ্রয় দানে আর আশ্রিতকে রক্ষাতেই তাঁর আনন্দ।

শিহাবকে নিয়ে বরাবর তিনি বেগম সাহেবার কক্ষে চলে এলেন। বেগম সাহেবা তখন গান্নার সঙ্গে গল্প করছিলেন। সফদর জঙ্গ হঠাৎ একজন অপরিচিত ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করাতে তিনি চমকে উঠলেন। আরো বেশী চমকে উঠল গান্না। পর্দানসীন মহিলার স্বভাব অনুযায়ী মুহূর্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিহাবের চোখের উপর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ—সুক্ষ্ম রেখায়, চকিতে ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেল।

এক মুহূর্তে সেই অপস্রিয়মান রহস্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে সে।

বেগম সাহেবা ওড়নার আড়াল টেনে নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন। সফদর জঙ্গ বললেন, আরে ওকে দেখে লজ্জা কিসের। ওতো ছেলে মানুষ।

ওড়নার আড়ালে মুখখানা রেখেই বেগম সাহেবা ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলেন, ও কে ?

সফদর জঙ্গ বললেন, ও নিজাম গাজিউদ্দিনের ছেলে। বর্তমানে তোমার। আমি ওকে ধর্মপুত্র বলে গ্রহণ করেছি। বেগম সাহেবা এবার ওড়নার আড়াল থেকে মুখ বের করলেন। সন্তানকে আর লজ্জা কিসের। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহহাত খানি রাখলেন শিহাবের পিঠে।

শিহাব কিন্তু তখন অন্যচিন্তায় মগ্ন। সেই পলায়মান আলোর শিখা তাকে অভিভূত করে গেছে। তার ইচ্ছে হল, স্থান কাল ভুলে সেই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করে বসে, আম্মা, ঐ মেয়েটি কে ?

কিন্তু তার তুরাণী রক্তের স্বাভাবিক বুদ্ধি তাকে সে হঠকারিতা থেকে রক্ষা করল। প্রশ্নটা সে করল না।

বেগম সাহেবা বললেন, তুমি এখানেই থাকবে তো ?

শিহাব বলল, হ্যাঁ আম্মা, আমি এখানেই থাকব।

সফদর জঙও বললেন, হ্যাঁ ও এখানেই থাকবে। যতদিন না ওকে নিজাম করে দাক্ষিণাত্যে পাঠাতে পাচ্ছি ততদিন ও আমার কাছেই থাকবে। বাগিচার পাশের ঘরটাতে ওকে থাকতে দেব।

বেগম সাহেবা হাসলেন, বললেন, তাই বলে বাগিচাতেই তোমাকে থাকতে হবে না। জেনানা মহলে তোমার আম্মার ঘর তোমার জন্য উন্মুক্ত থাকল, তুমি ইচ্ছে মত এস।

এই জেনানা মহল যে মুহূর্তেই শিহাবের মনকে বাঁদী করে ফেলেছে। এখানে যে, সে তার জীবনের বৃহত্তম প্রশ্নকে রেখে যাচ্ছে। এর উত্তর তাকে পেতেই হবে। সে নিশ্চয়ই আসবে। বেগম সাহেবা না বললেও ছল করেও তাকে আসতে হতই। না এসে তার থাকবার উপায় নেই। শিহাব বলল, নিশ্চয়ই আসব।

—বেশ এস। সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন বেগম সাহেবা।

সফদর জঙ্গের সঙ্গে শিহাব বাইরে চলে এল।

॥ আটার ॥

সফদর জঙ্গের স্নেহ, বেগম সাহেবার ভালবাসা, অল্প দিনের মধ্যেই গান্নাকে স্বচ্ছন্দ বিহারিণী করে তুলেছিল। দারা সুকোহর প্রাসাদের সর্বত্র অবাধ গতি ছিল তার। একটা বন্য পাখীর মত গান্না সেই প্রাসাদের সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। সব চেয়ে তাকে আকর্ষণ করত বাগিচা। সবুজ ঘাসের আস্তরণ, পুষ্পবৃক্ষের পেলব শাখা, বহু বর্ণের পুষ্প স্তবক, এবং সর্বোপরি বুলবুল মিথুন আর ময়ূর যুগলের প্রাণ-চঞ্চল খেলা তাকে মুগ্ধ করত। তাই দিনের কিছুক্ষণ সে এই বাগিচার। নিভৃত পরিবেশে একা কাটাত। কখনো নিস্পন্দ নেত্রে তাকিয়ে দেখত প্রকৃতির দৃশ্য। কখনো বা নীরবে বসে সে কবিতা লিখত এখানে। এক অপূর্ব পুলক তার চেতনাকে স্পর্শ করত এই বাগিচায়। এখানে না এসে সে থাকতে পারত না। তাই আজো এসেছিল। সবুজ কুঞ্জের একটা ঝুলন্ত লতার উপর বসে ছিল দুটো বুলবুল। হয়তো যুগল প্রেমিক। একে অপরকে সোহাগ করছিল। সেই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল গান্না। কি এক চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল সে।

গান্না যেমন অভিভূত হয়ে দেখছিল এক জোড়া বুলবুলের মিথুনকে ঠিক তেমনি ভাবে মুগ্ধ দৃষ্টিতে গান্নাকেও একজন তাকিয়ে দেখছিল পেছন থেকে। সে এই বাগিচার নূতন আগন্তুক, শিহাবুদ্দিন। সে দেখছিল ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে এক কন্যা। তার কচি কলাপাতার রঙের ওড়নায় জড়িয়ে খোলসে আবদ্ধ সাপের মত দীর্ঘ বেণীটি পিঠ জুড়ে বিলম্বিত হয়েছিল। ওড়নার ফাঁকে তার দেহের চম্পকবর্ণ অগ্নির মত দ্যুতি বিকিরণ করছিল যেন। দেখেই বুঝতে পেরেছিল শিহাব, এ সেই বেগম সাহেবার ঘরে চকিতে দেখা বিদ্যুৎ-কন্যা।

নিঃশব্দে সে এই পটে আঁকা ছবির মত এক বেহেস্ত কন্যাকে প্রাণভরে দেখছিল। আর তার স্পন্দিত বুকে আল্লার কাছে সে প্রার্থনা জানাচ্ছিল, থাক, থাক, শুধু ও দাঁড়িয়ে থাক। একটু হাওয়ার দোলন, বৃক্ষ শাখার একটু স্পন্দন, তাকে চমকিত করে তুলেছিল, এই বুঝি ঘুম ভাঙিয়ে দেবে সেই নিস্পন্দ দণ্ডায়মান স্বপ্ন কন্যার। তার তরুণ মনের সমস্ত স্বপ্ন দিয়ে সে শুধু তাকেই তাকিয়ে দেখছিল। আর তার তরুণ দেহ থেকে কি এক রস নিস্থত হয়ে অভূতপূর্ব আস্বাদে শিহাবকে পাগল করে তুলছিল। কস্তুরী মৃগের মত নিজেরই দেহের মধ্যে কিসের এক গন্ধ পাচ্ছিল যেন সে। কিন্তু সেই নিস্তব্ধকন্যা আর স্থির থাকল না। বাদ সাধল বুলবুল মিথুন। এই বাগিচায় ওরা গান্নাকে দেখে অভ্যস্ত। গান্না তাদের পরিচিত। তাকে দেখে ভয় পায় না ওরা। গান্নার মুগ্ধ চোখে স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে ওরা প্রায়ই অমন করে বসে থাকে। একে অপরের পালক খুঁটে দেয় কিম্বা একে অপরের চঞ্চুতে চঞ্চু সংযোগ করে চুম্বনের ভঙ্গীতে সোহাগ করে। হঠাৎ গান্নার পেছনে নতুন আগন্তুককে দেখে চমকে উঠল ওরা। তারপর একটা ভয় চকিত ভঙিতে উড়ে পালিয়ে গেল। বিস্ময় লাগল গান্নার মনে। কি হল ? ওরা উড়ে গেল কেন আজ ? পিছন ফিরে উড্ডিয়মান বিহঙ্গযুগলের দিকে তাকাতে গিয়েই তার চোখ দুটি বেধে গেল শিহাবের উপর। গান্না দেখল তারই সমান বয়সি। তখনো কৈশোর শেষ হয়নি। সোনার বর্ণ। উজ্জ্বল চোখ। লাবণ্য ভরা অবয়ব। হঠাৎ সে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সেই তরুণ এগিয়ে এল গান্নার কাছে। দোষস্খালনের একটা ভঙি করে বলল, আমারই দোষ।

গান্না এক মুহূর্ত উত্তর দিতে পারল না। কথা বলা উচিৎ হবে কিনা ভাবতে লাগল। কিন্তু ভাববার অবসরে তার অজ্ঞাতমন তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে ফেলল, না, আপনার কি দোষ ?

—আমিই বুলবুল দুটোকে ভয় পাইয়ে দিলাম।

হাসল একটু গান্না। বলল, আপনি কেন, ওটা পাখীর স্বভাব।

শিহাব বলল, কিন্তু আমাকে না দেখলে নিশ্চয়ই ওরা উড়ে যেত না ?

—কি করে জানলেন সে কথা ?

হাসল একটু শিহাব। বলল, ওদের ভঙি দেখে বুঝলাম ওরা এই বাগিচার দেবীর সঙ্গে পরিচিত।

'দেবী' কথাটা হৃদয়ে গিয়ে ঘা দিল যেন। বুকটা নড়ে উঠল গান্নার। এই প্রথম সে অপরিচিত অথচ সুন্দর তরুণের সঙ্গে দাড়িয়ে কথা বলছে। কিন্তু তবু সে প্রতিবাদ করল। বলল, আমি দেবী নই।

শিহাব বলল, না হলেও, মর্তে আপনি বেহেস্তের কন্যা।

গান্না একবার কটাক্ষপাতে শিহাবের মুখখানা দেখে নিয়ে বলল, বেহেস্তের কন্যা হবার ইচ্ছে আমার নেই। সে অলিক। আমি বাস্তব, এবং নিতান্তই আদমের বংশধর।

একটু রহস্য করল শিহাব। আকিবৎ রহমৎ কাশ্মিরীর কাছে সে বিদ্যার্জন করেছে। কৌতুক বোধ তার ও আছে। সে বলল, আদম নয়, আপনি হবার বংশধর। আদমের বংশধর আমরা।

ছেলেটি বড় সপ্রতিভ, বড় বুদ্ধিমান। কথাটার ইঙ্গিত বুদ্ধিমতি গান্না সহজেই আঁচ করে নিতে পারল। আর একবার কটাক্ষপাত করে সে শিহাবকে তাকিয়ে দেখল। তারপর আর কোন কথা না বলে বরাবর প্রাসাদের জেনানা মহলের দিকে চলল।

শিহাবের ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে বলে উঠে, যেও না। থাম। একটু খানি দাড়াও। আমি তোমাকে প্রাণ ভরে দেখি। কিন্তু কে যেন তার কণ্ঠ রোধ করে দিল। কোন কথা বলতে পারল না সে। স্থির হয়ে সেই রহস্যময়ী কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকল। শুধু দেখতে লাগল। নিস্পন্দ আঁখিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আকাংখা করতে লাগল একবারও শেষ প্রান্তে গিয়ে সে ফিরে তাকাবে তার দিকে। মনেমনে বলল, আল্লা ওর মনে কৌতূহল দাও।

কিন্তু না; তার হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে ফিরে তাকাল না মেয়েটি। বরাবর সে চলে গেল। আর একবার তার চোখের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করবার কি ব্যাকুল ইচ্ছাই না হয়েছিল তার।

কিন্তু গান্না তাকাল না। হৃদয়ে একটা বৃশ্চিক দংশন অনুভব করল শিহাব। নিজেকে যেন অপমানিত বোধ হল। সেই মুহূর্তে আক্রোশ হল তার। আর মনে হল মেয়েটি বড় অহঙ্কারিণী। কিন্তু এ অহঙ্কার তাকে জয় করতেই হবে।

সফদর জঙ্গের এক বাঁদী সেই মুহূর্তে বাগিচাতে ছিল। গান্না আর শিহাবুদ্দিনকে লক্ষ্য করছিল সে। গান্না অদৃশ্য হলে তার দিকে চোখ পড়ল শিহাবের। সে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল বাঁদীকে। বাঁদী কাছে এলে বলল, একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার ?

—বলুন ?

—এই মেয়েটি কে ?

নিজের মনের মধ্যে একটা দুষ্ট হাসি লুকিয়ে রেখে বাঁদী কটাক্ষ পাতে শিহাবকে একবার দেখে নিল। তার পর বলল, কেন জনাব, ওকে চেনেন না ?

—না। ও কে !

বাঁদী বলল, ও কবি আলিকুলির কন্যা গান্না বানু।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শিহাব বলল,—হুঁ। একটু খানি মাথা নাড়ল সে। তার হৃদয়ের অবস্থাটা ততক্ষণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে বাঁদী। তাই নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে সে শিহাবের বুকের যন্ত্রণাকে আর একটু বাড়িয়ে দেবার জন্য বলল, অপূর্ব মেয়ে জনাব।

আত্মমগ্ন শিহাব শুধু ছোট্ট করে উত্তর দিল, হুঁ।

বাঁদী বলল, ওর অনেক গুণ। গাইতে জানে। কণ্ঠের সুরে কোকিলও হার মানে।

শিহাব প্রেম পীড়িত চোখে বাঁদীর দিকে তাকাল।

বাঁদী বলল, নৃত্যে ওর তুলনা নেই। হরিণ শিশুকেও ম্লান মনে হয়।

শিহাব শুধু তাকিয়ে থাকল।

বাঁদী বলল, গজল রচনা করতে পারে গান্না।

—সত্যি! শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল শিহাবের চোখে।

—কেন আপনি শোনেন নি? "দুনিয়ার দিগন্তে নত নীল আসমান" এত গান্না বান্নুর গান।

—গান্নার! চিৎকার করে উঠলো যেন শিহাব।

—হ্যাঁ গান্না বান্নুর। কিন্তু…………

হঠাৎ মুখখানা গম্ভীর করে ফেলল বাঁদী।

উৎসুক শিহাব প্রশ্ন করল, কিন্তু কি?

—কিন্তু গান্নার নসিব বড় দুঃখের।

—কেন?

বাঁদী একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলল, আপনি দেখছি কিছু জানে না। গান্নার যে সাদি হবে।

হৃদয়ের মধ্যে কে যেন মুগুরের ঘা দিল শিহাবের। মুখখানি কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল:

কার সঙ্গে সাদি?

—সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে।

—সেকি, সুজাউদ্দৌলাতো বাহু বেগমকে সাদি করেছেন।

বাঁদী বলল, সেইতো দুঃখের। মেয়েটাকে সতীন বেগমের ঘর করতে হবে।

সেই মুহূর্তে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে শিহাব যেন একটা ঈর্ষা বোধ করল। মনে মনে যেন প্রতিজ্ঞা করতে চাইল, না, এ, হতে দেবেনা সে। বাঁদীকে বলল, আচ্ছা, আলিকুলি এতে মত দিলেন?

ঠোঁট উলটিয়ে বাঁদী বলল, কি যে বলেন! আলিকুলির আর মত অমত কি। কার ঘাড়ে দশটা মাথা সফদর জঙ্গকে অস্বীকার করবে।

শিহাবের তৎক্ষণাৎ মনে হল সেই সম্পন্ধ আহবান গ্রহণ করে বলে, আমি করব। কিন্তু বলা হল না, মনের কথা মনে চেপে জ্বলতে লাগল।

একটা পুরুষ হৃদয়ে যন্ত্রণার আগুন ধরিয়ে দিতে পেরেছে ভেবে, অপূর্ব আত্মপ্রসাদে বাঁদী হেলেদুলে জেনানা মহলের দিকে চলল।

একটা অসীম অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে ভাবতে বসল শিহাবুদ্দিন।

॥ ঊনিশ ॥

বাগিচা থেকে ফিরে এসে জেনানা মহলের এক নিভৃত কক্ষে ভাবতে বসল গান্না। এই প্রথম সে ভাবতে বসল! ভাবতে বসল একটি মন। সেই মনের কাতর ভাব। তার চোখের মধ্যে নিতান্ত আকুতি ভরা একটি দৃষ্টি। কেন কি জানি, সে দুটো চোখের কথা ভাবতে ভাল লাগে। অবজ্ঞা করে চলে আসলেও অবজ্ঞেয় বলে তাকে মনে হয় না। নিজের কি একটা অহঙ্কারে, কথা না বললেও, মনের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেছে তার। নিজেই জানে না, অথচ এখন মনে হয় অনেক কিছুই যেন কল্পনা করে বসেছে সে।

ছেলেটির দেহে লাবণ্য। মুখ বুদ্ধিদীপ্ত। কথায় শিক্ষার আভাষ। অভিজাত ঘরের সে নিশ্চয়ই। কে সে? উজির সাহেবেরই কোন পুত্র কি? কিন্তু কৈ, সুজাউদ্দৌলার ছোট বেলা দেখা মুখের সঙ্গে তো এর মিল নেই!

বেগম সাহেবার ঘরে সুজার তসবিরের যে নূতন অঙ্কিত মুখখানা, তার সঙ্গেও মিল নেই। সুজার মুখখানা উগ্র সৌন্দর্য্যের আধার। তীব্র সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু লাবণ্য কম। নূতন দেখা তরুণটির সৌন্দর্য্য, সুজার তুলনায় কম, কিন্তু কমনীয়তা! সত্যি বড় কোমল। কচি, কৃষ্ণ গোঁপের রেখা দেখা দিয়েছে কেবল। এখনও পৌরুষের ভাব ফুটে উঠেনি। অথচ সমস্ত দেহ জুড়ে বলিষ্ঠ পুরুষের ভাব। মনে পড়ছে, কথা বলবার সময় থর থর করে সেই বলিষ্ঠ তনুখানি কাঁপছিল তার। কেন? কথা বলবার সময় কণ্ঠ তার কি কেঁপে যায়নি? হ্যাঁ, কেঁপে কেঁপে উঠছিল বার বার। গান্নার নিজেরও কি দেহের মধ্যে কম্পন ছিল না কোন? ছিল। কেন? কেন সে জটিল প্রশ্নের উত্তর কে দেবে। নিজের মনকে কি নিজেই চেনা যায়? যায়না।

শুধু বোঝা যায় এক দুর্বোধ্য চাতুর্য। কেন জানি না। কিন্তু ভাল লাগে। ভাবতে বেশ ভাল লাগে। একেই কি বলে প্রেম। কি জানি? হ্যাঁ, তবে এমনি ভাবে চলে আসা ঠিক হয় নি। একটু ঔদ্ধত্য দেখান হয় নি কি? ছেলেটাকে তো অহঙ্কারী মনে হল না। তবে গান্না তাকে অপমান করতে গেল কেন? একবার পেছন ফিরে তাকালেই পারত। কিন্তু সেটা কি নিতান্ত অসভ্যতা হত না। আচ্ছা ছেলেটা কি ভাবল? গান্নাকে অহঙ্কারী ভাবল কি? আচ্ছা ওকি সেই মুহূর্তে গান্নার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে নি? ওযে যেচে এসে কথা বলল, সেকি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে? একটু ভাব করবার জন্যে কি? কিম্বা শুধু সৌজন্য মূলক। সত্যি কি যে হল, কিছুই যেন বুঝতে পারল না গান্না। কেমন যেন কৌতূহল ধেয়ে চলেছে সেই দিকে। আরো জানতে ইচ্ছে হলো। কি করে জানা যায় বলতো? হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ছে। সেই সময় বাগিচায় মেহের বাঁদীকেও যেন সে দেখতে পেয়েছিল। হ্যাঁ, ঠিক ছিল, মেহের কি ওকে চেনে? আচ্ছা মেহেরকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। না, না, ভারি লজ্জা, যেচে জিজ্ঞাসা করতে গেলে কি ভাববে মেহের! না, তার চেয়ে জিজ্ঞাসাই করবে না সে, অথচ........। কত সাতপাঁচ কথা জড়িয়ে জড়িয়ে মনের উর্ধে ভীড় করে আসবার চেষ্টা করছিল, কেমন বিব্রত বোধ করছিল গান্না অথচ কেমন ভালও লাগছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেগম সাহেবা এসেছিলেন বাগিচায়। গান্নাকে এসময় জেনানা মহলে একলাটি চুপ চাপ বসে থাকতে দেখে উঠে এলেন তিনি। সাধারণতঃ গান্না এসময়ে মহলে থাকে না। বাগিচায় বেড়াতে ভালবাসে, তাই তিনি গান্নার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,—

একি, আম্মা, তুমি এখানে?

লজ্জিত মুখে গান্না বেগম সাহেবার দিকে তাকাল, যেন তার মনের কথা বেগম সাহেবা জানতে পেরেছেন। বলল, কেন, এখানে থাকব না তো কোথায় থাকব?

মাথা নাড়লেন বেগম সাহেবা, উঁহুঁ, এসময় তো তুমি এখানে থাক না।

—তবে কোথায় থাকি ?

—বাগিচায়।

গান্না নীরব থাকল।

বেগম সাহেবা প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার কি ?

এ কি! বেগম সাহেবা সব জেনেছেন নাকি! গান্নার বুকটা একটু কেঁপে উঠল, বলল, কিছু না।

—নাঃ,—কিছু একটা হয়েছে, বেগম সাহেবা ভাববার চেষ্টা করলেও, তারপর কি মনে পড়াতে সশব্দে একটু হেসে উঠলেন, ওহো, বুঝেছি।

গান্নার মুখ লজ্জায় লাল হল, সে প্রশ্নের ভঙিতে বেগম সাহেবার দিকে তাকাল।

বেগম সাহেবা বললেন, বুঝেছি, তোমার বাগিচা বেদখল হয়েছে। সত্যি খাঁ সাহেব (সফদর জঙ্গ) বড় অন্যায় করেছেন।

তাইতো বলি, মেয়ে আমার একা এখানে কেন ?

গান্না প্রতিবাদ করল-না, না, আমার কিছু হয়নি।

এই প্রতিবাদ কৃত্রিম নয়। এর মধ্যে একটু সত্য মেশান ছিল। সেটা হল এই যে বেগম সাহেবা গান্নার সুবিধার জন্য আবার সেই তরুণ কে বাগিচা চ্যুত না করে বসেন। কি যেন কি একটা……..।

বেগম সাহেবা বললেন, ঠিক আছে কোন ভাবনা নেই। প্রাসাদের ছাদে তোমার জন্য একটা নতুন বাগিচা তৈরী করে দেব আমি। আজই ব্যবস্থা করছি দাড়াও। বেগম সাহেবা দ্রুত চলে গেলেন। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গান্না, আজ তার বড় লজ্জা আবার সে তন্ময় হয়ে ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু মনোনিবেশ করতে গিয়েও পারল না। কার পায়ের শব্দ হল। ফিরে তাকাল গান্না, দেখল মেহের দাঁড়িয়ে রয়েছে। মেহেরকে দেখে বুকের রক্ত যেন তার ছলাৎ

করে উঠল। কি একটা প্রশ্ন, তক্ষুণি যেন বুক ঠেলে আসতে চাইল। কিন্তু নাঃ—, মেহেরকে যেচে কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

কিন্তু প্রশ্ন শুধু গান্নার নয়। মজার কথা বলবার জন্য মেহেরেরও মন অস্থির হচ্ছিল। সুতরাং সেই আরম্ভ করল। বলল, জান?

গান্না মুখ তুলে তাকাল; কি?

—বড় মজা হল বাগিচায়।

বুকটা কেঁপে উঠল গান্নার। বলল, কি?

—সেই যে ছেলেটা—

—কোন্ ছেলেটা?

বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগল গান্নার।

—যে ছেলেটা যেচে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করল।

গান্না কোন কথা বলতে পারল না।

মেহের বলল, বেচারা জলে ডুবেছে।

—মানে?

—তোমার প্রেমে পড়েছে।

হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল গান্নার। কিন্তু নিজের দুর্বলতা দেখান উচিত নয়। জিজ্ঞেস করল,

কি করে বুঝলি?

মেহের বলল, আমার কাছে এসে তোমার খোঁজ খবর নিচ্ছিল।

—তুই কি বললি?

—কি আর বলব, আরো বুকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এলাম। বাছাধন জ্বলতে থাক।

একটু হাসবার চেষ্টা করল গান্না। বলল, কি বললি।

মেহের বলল, বলে দিলাম, এদিকে হাত বাড়িয়ে সুবিধে হবে না। গান্না বানুর সাদি ঠিক।

চমকে উঠল গান্না, সাদি ঠিক, কি বলছিস?

—মিছে বানিয়ে বলে এলাম।

—ওহ্—তাই বল্। তা কি বললি ?

—বললাম, উজির সাহেবের ছেলে সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে গাম্মা বানুর সাদি ঠিক—সুতরাং·········

ধমকে উঠল গাম্মা,—যাঃ, মিথ্যে বলতে গেলি কেন ?

মেহের বলল, বললুম। প্রতিযোগী না হলে খেলা জমে না, জানতো ?

হাসতে হাসতে সে চলে গেল। গাম্মা আবার ভাবতে বসল।

॥ কুড়ি ॥

মদনের চেয়ে বড় শাস্তি আর নেই। তার তীরের ফলায় বিরহ যন্ত্রণার যে বিষ তা অসহ্য। সেই তীর শিহাবুদ্দিনের হৃদয় ভেদ করেছে। যন্ত্রণায় সে পাগল। যেন সমস্ত দেহে তার আগুন ধরেছে। গান্নার দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে শান্তি নেই। কিন্তু পথ কোথায়? পথ যে নেই। না থাকলেও পথ কেটে যেতে হবে বৈকি। শিহাবুদ্দিন মনে করল, অলিকুলির সঙ্গে ভাব জমাতে হবে। তার মনে রেখাপাত করতে হবে। তারপর বক্তব্য পেশ করতে হবে। সুজাউদৌলার চেয়ে পাত্র হিসেবে সে কম কিসে? সে দাক্ষিণাত্যের নিজামের পুত্র, তারপর অবিবাহিত। অকৃতদার বর নিশ্চয়ই কৃতদারের চেয়ে মূল্যবান সুতরাং আলিকুলির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করল সে। আলিকুলি কবি সে জানে। কবিদের দুর্বলতার কথাও শিহাবুদ্দিনের অজানা নেই। প্রশংসার কাছে কবিরা অসহায়, ধরা দেবেই। সুতরাং আলিকুলির গজল গুলো ভাল করে পড়ে নিল শিহাব। তারপর আলিকুলির দৃষ্টি ভঙির উপর একটি প্রশাস্তি মূলক বক্তৃতা কল্পনা করে নিয়ে একদিন সত্যি সত্যি সে দারা সুকোহর প্রাসাদের অপর প্রান্তে আলিকুলির কক্ষের দিকে চলল। আলিকুলি তখন কাব্য চর্চায়ই বোধ হয় করছিলেন, হঠাৎ তার কক্ষে শিহাবুদ্দিনকে দেখে তিনি একটু চমকে উঠলেন। মর্য্যাদায় শিহাবুদ্দিন উজিরের পরেই। বয়স অল্প হলে কি হবে পদমর্য্যাদায় আলিকুলির অনেক উপর। তাই আলিকুলি তাকে দেখে উঠে দাড়ালেন, কি বলে সম্বোধন করবেন ঠিক ভেবে পেলেন না। তাকে সে অবস্থা থেকে শিহাবুদ্দিনই রক্ষা করল। বিশেষ একটা শ্রদ্ধার ভঙি দেখিয়ে সে বলল,—আপনি বসুন।

আলিকুলি বসলেন, কিন্তু নিজের তরফ থেকে কোন প্রশ্নই করতে পারলেন না।

শিহাবুদ্দিন এগিয়ে এল। বলল, শুনলাম আপনি এখানেই আছেন তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

এত বড় একজন আমিরের পুত্রের কাছে আলিকুলির কোন মর্যাদা আছে বলে তিনি জানেন না! তাই চুপ করে থাকলেন।

শিহাবুদ্দিন বলল, আপনার গজলের আমি একজন ভক্ত। অনেক দিনই দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৌভাগ্য হয়ে উঠে নি। সত্যি আজ বড় আনন্দ হল।

আলিকুলি শুধু আনন্দময় অনুমোদনের ভঙি করলেন।

শিহাব বলল, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ?

—বলুন।

—না, না, বলুন নয়। আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন। কারণ বয়স এবং যোগ্যতায় আপনি আমার অনেক উপরে। শুধু আমি নই দিল্লীর আমির ওমরাহরা পর্যন্ত আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করে।

বিনয়ে যেন গদ গদ হলেন আলিকুলি। বললেন, আচ্ছা তাই হবে। বল তোমার কি প্রশ্ন ?

—আপনার কবিতায় এত বিষাদের সুর কেন ?

হয়তো আমার জীবনের কোন অধ্যায়ের ছায়া পড়েছে।

কোন্ কথা বলতে চান আলিকুলি, বুদ্ধিমান শিহাবুদ্দিন তা' তৎক্ষণাৎ বুঝে নিল। বলল, হ্যাঁ সে কাহিনী আমাদের পরিচিত। তবে তা আপনার জীবনে আশীর্বাদই বলতে হবে। কারণ এ বিষাদের সুর ফারসি সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

আলিকুলি বিনয়ের ভঙিতে বললেন, আল্লা জানেন।

শিহাবুদ্দিন কথার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল বারবার। তার চোখ দুটো কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তার কান দুটি কার পদধ্বনীর জন্য উৎকর্ণ হয়ে ছিল যেন। পাছে তার এই গোপন আকাংখা ধরা পড়ে যায়, তাই কথা দিয়ে দিয়ে তা' ঢেকে দিচ্ছিল শিহাবুদ্দিন। সে বলল, আচ্ছা শুনেছি বেগম সাহেবাও বিদুষী।

একটু হাসলেন আলিকুলি। বললেন, লোকে তাই বলে। তবে জানতো তিনি এ হিন্দুস্থানেরই মেয়ে।

হেসে বলল শিহাবুদ্দিন, তা জানি।

কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ যাতে উত্থাপিত হয় সেই জন্য এই সব কৌশল শিহাবুদ্দিনের। কিন্তু তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলনা। ধরা দিলেন আলিকুলি। যে কথা শুনতে চায় শিহাবুদ্দিন, সে প্রসঙ্গই তুললেন তিনি। বললেন, জানতো আমার মেয়েও গজল রচনা করতে পারে?

না জানার ভান করল শিহাবুদ্দিন।

আলিকুলি বললেন, কেন গান্না বানুর গজল শোনোনি? —হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। তা, গান্না আপনার মেয়ে?

একটু হাসলেন আলিকুলি, বললেন, হ্যাঁ।

শিহাব বলল, শুনে বড় সন্তুষ্ট হলাম। তা............

শিহাব ভাবল বুঝি আলিকুলি কন্যাকে ডেকেই আনবেন। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেলনা আলিকুলির মধ্যে। অগত্যা তাকেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হল।

—আচ্ছা আপনার মেয়ের কোন কবিতা শুনতে পারি?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আচ্ছা তুমি বোস।

আলিকুলি তৎক্ষণাৎ ভিতরে চলে গেলেন।

শিহাবের বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। আলিকুলি কি সত্যি গান্নাকে ডাকতে গেলেন। সেই বিদ্যুতের মত চমক দেওয়া কন্যা কি তবে সত্যি আবার তার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হবে!

কিন্তু শিহাবকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে আলিকুলি এক গাদা কাগজ নিয়ে প্রবেশ করলেন। কাগজ গুলো নিয়ে যথাস্থানে বসলেন তিনি। বললেন, এই হল গান্নার গজল। সত্যি বড় মিষ্টি হাত মেয়েটার।

শিহাব মনে মনে বলল, অমন মিষ্টি রূপ যার, মিষ্টি হাত তার

হবেই। তবে এই অবাস্তব হাত থেকে বাস্তব হাতের দিকে তার লোভ বেশী। `সে যা প্রার্থনা করে তা পানি, পানীয় নয়। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। সুতরাং নিতান্ত ধৈর্য্য ধরে শুনতে হল তাকে।

আলিকুলি বললেন, শোন গান্নার গজল শোন। গান্না বলছে: ও হবা তুমি আদমকে ভাল বেসেছিলে?

কিম্বা, আদমই ভাল বেসেছিল?

শিহাব তারিফ করে উঠল বাঃ চমৎকার।

আলিকুলি বললেন, আমার কিন্তু মনে হয় ওর সবচেয়ে ভাল হল আসমানি গজলটা।

গান্নার সৃষ্টিকে সম্মান জানাতে শিহাবুদ্দিনও আজ গৌরব বোধ করে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তের। এই মুহূর্তে সবচেয়ে যে জিনিসটি তার কাম্য তা হল জীবন্ত গান্না। তার সান্নিধ্য। কিন্তু সেকথা মুখফুটে বলবার উপায় নেই। সুতরাং শোনবার জন্যই প্রস্তুত হল শিহাব। আলিকুলি বললেন "আসমান নীল হল আমারি বেদনা পেয়ে বুঝিরে।" প্রচুর প্রশংসা করল শিহাবুদ্দিন। কন্যার স্তুতিতে অভিভূত হয়ে আলিকুলি বললেন, গান্না এখানে নেই। তাহলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতুম। গান্না এখানে নেই! নিজের কপাল চাপড়াতে ইচ্ছেহল শিহাবুদ্দিনের। হায় সোনার মুহূর্ত তার মিছেই নষ্ট হল। কিন্তু সে যাই হোক সে কোথায় আছে এটা জানা প্রয়োজন। বলল, কেন আপনার কন্যা আপনার কাছে থাকেন না?

হাসলেন আলিকুলি। বললেন, নিশ্চয়ই আমার কাছে আছে তবে উজির সাহেব আসা অবধি এখানে নেই। উজির সাহেব ওকে মেয়ের মত ভালবাসেন। তা ছাড়া বেগম সাহেবা ওকে চোখের আড়াল করতে পারেন না। উজির সাহেবের হৃদয়টা কি রকম স্নেহ প্রবণ সে'ত তুমি জানই।

সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ শিহাব যে উজিরের কাছে আশ্রয় পেয়েছে সেটাই তার প্রমান। কিন্তু সেই মুহূর্তে উজির

সাহেবের স্নেহ প্রবণতা স্বীকার করতে ইচ্ছে হলনা তার। বরং এ স্নেহকে সন্দেহ আর ঈর্ষা করল সে। তবে মুখ ফুটে বলবার নেই কিছু। তাই স্বীকার করতে হল হ্যাঁ, সেত ঠিকই। ওরকম মানুষ কমই দেখেছি।

কিন্তু সেই মুহূর্তে গান্নার সম্বন্ধে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছা হলনা তার। কিম্বা নতুন কোন গজলও শোনবার ইচ্ছে হলনা। দ্রুত বাগিচায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হল। গান্না যদি সত্যি উজির সাহেবের জেনানা মহলে থেকে থাকে, তবে সেই বাগিচায়ই তার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল শিহাবের। সে উসখুস করতে লাগল। কিন্তু কবির চোখ সে অস্বস্তি লক্ষ্য করতে পারলনা। তাই নতুন গজলের সন্ধান করতে লাগলেন আলিকুলি গান্নার কাগজ গুলোতে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল শিহাবের। হঠাৎ সেই মুহূর্তে উজির সাহেবের ডাক এল তার। বান্দা এসে জানাল উজির সাহেব তাকে খোঁজ করছেন। বাগিচা তন্ন তন্ন করে খুঁজে সে এখানে এসেছে।

ক্ষুণ্ণ চিত্তে আলিকুলি বললেন যাও, তবে।

হাঁফ ছেড়ে শিহাবুদ্দিন উঠে দাড়াল। বলল, আদাব। আমি আবার আসব।

—'নিশ্চয়ই।' আলিকুলি দ্বার পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে এলেন। শিহাব চলে গেলে আবার তিনি সস্থানে ফিরে এলেন। তৎক্ষণাৎ পর্দ্দার ওপার থেকে বুলবুল বেগম বেরিয়ে এল।

আলিকুলি বললেন, এই যে, এস। দেখ আজ একটা নতুন গজল লিখেছি।

কুসানটাতে বসল বুলবুল। আলিকুলি নতুন লেখা গজলটা বের করলেন। কিন্তু বুলবুল তাকে বাধা দিল, থাক। গজল পরে হবে। আগে বল ও ছেলেটি কে এসেছিল তোমার কাছে?

আলিকুলি বললেন, চেন না? নিজাম গাজিউদ্দিনের ছেলে শিহাবুদ্দিন।

—তা'ও এখানে কেন?

—ওমা তা'ও জান না বুঝি? ও হঠাৎ কাল........

বুলবুল বলল, সে আমিও জানি। ও কথা নয়। ও এখানে এসেছিল কেন?

—এই আমার সঙ্গে একটু দেখা করতে।

—হুঁম্—। বিশেষ একটি ভঙ্গী করল বুলবুল।

তা লক্ষ্য করে আলিকুলি বললেন, কি হল তোমার?

বুলবুল বলল তুমি সরল মানুষ। কিছু দেখতে পাওনা।

শোন ওকে প্রশ্রয় দিওনা, ও কিন্তু তেমন সুবিধের ছেলে নয়।

অবুঝ একটা দৃষ্টি নিয়ে আলিকুলি তাকালেন বুলবুলের দিকে:

—কেন বলতো?

—ও কেন এসেছিল বুঝেছ?

—এই আমার, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে।

প্রতিবাদ করে উঠল বুলবুল মোটেই নয়। ও এসেছিল অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।

—কি বলত?

—ও, তোমার মেয়ে গান্নার খোঁজে এসেছিল।

এবার প্রতিবাদ করে উঠলেন আলিকুলি, না, না, না,। তুমি ভুল বুঝছ।

একটা কর্তৃত্বের সুরে বুলবুল বলল, না, আমি ভুল বুঝিনি।

ঠিকই বুঝেছি। সাবধান হয়ে চলবে।

এবার আলিকুলি একটু রহস্য করবার চেষ্টা করলেন: কেন, তাহলেই ক্ষতি কি? এত বড় একজন আমীরপুত্র। বর্তমানে নিজেই আমীর।

ধমকে উঠল বুলবুল, থাক। আমীর কেন বাদশা হলেও নয়। তুরাণীদের ঘরে আমার কন্যা যাবেনা। তুমি ওকে আর প্রশ্রয় দেবে না বুঝলে?

আর কোন কথা না বলে গম্ভীর ভাবে বুলবুল চলে গেল। আলিকুলি আশ্চর্য্য চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অপরদিকে সফদর জঙ্গের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করল শিহাবুদ্দিন। সফদর জঙ্গকে সালাম জানিয়ে বলল, আমায় তলব করেছেন?

উজির সাহেব বললেন, হ্যাঁ, এইযে এস।

শিহাবুদ্দিন এসে বসল।

সফদর জঙ্গ বললেন, আজ দরবারে গিয়েছিলাম। তোমার কথা বাদশাকে বললাম।

শিহাবের বুকটা দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগল। কি হল কে জানে?

সফদর জঙ্গ জানালেন, তোমাকে মির বক্সি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। দরবারে তোমার পদবী হল গাজি উদ্দিন খান বাহাদুর, ফিরোজ জঙ্গ আমির-উল-উমারা-ইমাদউল-মুলক। তোমার আব্বাজানের ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যে তুমি সুবাদারও নিযুক্ত হলে। সেখানে তোমার পদবী হল, নিজাম-উল্-মুল্ক আসফ খাঁ।

শিহাবুদ্দিন ভূমি স্পর্শ করে কুর্নীস জানাল উজির সাহেবকে।

সফদর জঙ্গ সস্নেহে শিহাবকে আলিঙ্গন করলেন করলেন। তারপর বললেন, কাল থেকেই তুমি দরবারে বসবে, আর তোমার নিজের প্রাসাদে থাকবে। তোমার আর কোন ভয় নেই।

শিহাব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। কিন্তু সেই মুহূর্তে এত বড় সুখবরও যেন তাকে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারল না। প্রাপ্তির সঙ্গে এক এক বিয়োগ ব্যথাও যেন অনুভব করল সে। দারাসুকোহর প্রাসাদ ত্যাগ করে যেতে হবে শুনে, তার হৃদয়টা হা-হাকার করে উঠল।

সুবাদারী আর মির বক্সীর পদের চেয়েও বড় জিনিসের সন্ধান সে এখানে পেয়েছিল। সে গান্নার বন্ধু। তার আত্মার তৃপ্তি। সে গান্নাকে আর একবার না দেখে বিদায় নিতে হবে, ভেবে তার হৃদয়টা ক্রন্দনাতুর হয়ে উঠল যেন।

সফদর জঙ্গকে সকৃতজ্ঞ সালাম জানিয়ে সে তার বগিচার কক্ষে

এসে বসল। তখন অপরাহ্ণ। দিন আর রাতের মধ্যে ব্যবধান অল্প হয়ে এসেছে। এই টুকু সময়ের মধ্যে সেই অপরূপ রূপময়ীর সন্ধান আর একবার মিলবে কি? সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তারই আগমনের প্রীতক্ষা করতে লাগল শিহাবুদ্দিন।

ধীরে ধীরে দিন চলে যেতে লাগল। আলো ম্লান হয়ে আসতে লাগল, কিন্তু গান্না এলনা। ভয়ানক অস্থির বোধ করল শিহাব। অধৈর্য্য হয়ে উঠল সে। তাকে যে আর একবার দেখা বিশেষ প্রয়োজন। একবার শুধু মুখোমুখি দেখা। জেনানা মহলের দিকে তাকাল শিহাব।

মেহের বাঁদী সেই দিকেই আসছিল। তাকে দেখেই হঠাৎ শিহাবের মনে পড়ল এর সাহাষ্য নিলে হয় না? হ্যাঁ, মেহেরকে কাজে লাগান যেতে পারে। সে অপেক্ষা করতে লাগল। মেহের তার ঘরের দিকেই আসছিল। কাছে আসতেই ডাকল; শুনছ?

মেহের ফিরে তাকাল: আমায় ডাকছেন জনাব?

শিহাব বলল, হ্যাঁ। তোমার নাম কি বলতো?

গরজের নমুনা দেখে মেহের হাওয়া কোন দিকে বইছে আঁচ করে নিল। বলল, গান্না বানু আমাকে মেহের বলেন।

—হ্যাঁ, মেহের। বেশ নাম। তুমি আমার একটি কাজ করে দিতে পারবে।

—মেহের বলল, কেন পারব না। আমি বাঁদীমানুষ, কাজের জন্যই তো আছি।

—হ্যাঁ, সেত নিশ্চয়ই। তবে কিনা এ একটু বিশেষ কাজ।

—আদেশ করুন।

—তোমার গান্না বানুর কাছেই একটু কাজ ছিল। কি পারবে?

—বলুন আগে শুনি।

শিহাব চতুর লোক। কাজের কথা বলবার আগে, কাজ করলে কি ফল হতে পারে; তাই মেহের কে বুঝিয়ে দিল। বলল, জানত

আমি দরবারে মির বক্সী হয়েছি? আমি আজ প্রধান আমীরদের মধ্যে একজন।

—শুনে সুখী হলাম।

—শুধু প্রধান আমীর নয়। আমি দাক্ষিণাত্যের নিজাম উলমুলক্ আসফ ঝাও হয়েছি।

আভূমি নত হয়ে কুর্নীস জানাল মেহের।

শিহাব বুঝল ফল হয়েছে। এই বার কাজের কথা পাড়ল। বলল, গান্নাবানুর কাছে একটা পত্র পৌঁছে দিতে হবে।

দুহাতের আঙুল দিয়ে কান ঢাকল মেহের,—ইয়া আল্লা। আমি তা পারব না।

—কেন?

—নিমক হারামী করতে পারব না। পর পুরুষের চিঠি জেনানা মহলে দিতে পারব না। কসম খেয়ে কাজ নিয়েছি।

শিহাব বুঝল, মেহেরের এই সততার অর্থ কি। পকেট থেকে কয়টি সোনার আসরফি বের করে সে মেহেরকে দেখাল। যদি কাজ করে দিতে পার—আরো মিলবে। আসরফির দিকে চেয়ে মেহেরের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল। সে কোন কথা বলল না।

শিহাব বলল, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। সে কক্ষের ভীতরে প্রবেশ করল। মন্ত্র মুগ্ধের মত মেহের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। অর্থের চেয়ে যাদুকরি শক্তি বুঝি আর কিছুরই নেই।

ভিতরে শিহাব লিখতে লাগল,

আদাব অন্তে সমাচার—

গান্না বানু আমি মির বক্সী ইমাদ-উল-মুল্ক দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজাম-উল-মুল্ক আসফ খাঁ লিখছি। আমাকেই আপনি একদিন আপনার বুলবুল মিথুনকে ভয় পাইয়ে দিতে দেখেছিলেন। কিন্তু তা বলে সত্যি ভয় পাবার মতন আমি নই। সেই প্রথম দিনের চকিত দেখাতেই আপনার তসবীর আমার বুকে

অঙ্কিত হয়ে গেছে। সেই অবধি দুচোখ শুধু আপনাকেই খুঁজছে হয়ত আল্লার দুনিয়ায় অপরাধ করে থাকব, তাই বাঞ্ছিত দর্শনের সৌভাগ্য আর হয়নি। অগত্যা মেহের বাঁদীর নিকট আপনার সংবাদ নেবার ঔদ্ধত্য দেখালাম। এ সংবাদ নেবার প্রচেষ্টা আমার পক্ষে অন্যায় কিনা বাঁদীর মারফৎ জানাবেন। আমি অপেক্ষায় থাকলাম।

"আমারই চোখের জলে আসমান নীল"

—গান্নাবানু—

অসংখ্য সালাম অন্তে

গাজিউদ্দিন খান বাহাদুর ফিরুজ জঙ্গ

আমির-উল্-উমারা ইমাদ-উল্-মুলক

পত্র লেখা সমাপ্ত হলে মেহেরের হাতে কাগজ খানি দিল শিহাব। সঙ্গে সঙ্গে আসরফি কয়খানিও দিল। বলল, পত্রখানি গোপনে গান্নাবানুকে দেবে। আবার তার উত্তর নিয়ে আসবে। আরও বকসীস মিলবে।

—জনাব মেহের বান। সালাম জানিয়ে জেনানা মহলের দিকে চলল মেহের। শঙ্কিত বক্ষে সেই দিকে তাকিয়ে থাকল শিহাব।

নতুন আগন্তুক আসবার পর বাগিচায় আর যায়নি গান্না। বেগম সাহেবার নির্দ্দেশে ছাদের উপর কৃত্রিম উদ্যানে ছিল সে। বেলা শেষে সেখানেই বসে ছিল গান্না। মেহের গিয়ে উপস্থিত হল সেখানে।

মেহেরকে দেখে সহাস্য মুখে অভিনন্দন জানাল গান্না বানু—

এই যে মেহের কি খবর ?

খবর না থাকলে বালাই ছিল না। খবর আছে বলেই ভয়। মেহের যেন তার সমস্ত দেহে একটা কম্পন অনুভব করল। এদিক ওদিক সতর্ক ভাবে দেখে নিয়ে সে গান্নার আরো কাছে এগিয়ে এল। বলল, খবর আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে গান্না তাকাল মেহেরের দিকে, কি খবর ?

চিঠি।

চমকে উঠল গান্না। বুকটা দুর্ দুর্ করে কেঁপে উঠল। এক মুহূর্তে যেন ঘাম ছুটল তার। চিঠিটা মেহের গান্নার হাতে গুজে দিল। গান্না প্রথমেই পত্রখানা খুলল না। বলল, কার পত্র ?

মেহের বলল, সেই যে বাগিচায়....

গান্না বলল, বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তুই যা। মেহের তবু দাঁড়িয়ে থাকল।

—কি আর কিছু বলবি ?

—কিছু লিখে দিতে বলেছে তোমাকে।

মেহেরের মুখের দিকে কিছুটা তাকিয়ে থাকল গান্না। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, তুই যা আমার মহলের সামনে গিয়ে দাড়া আমি যাচ্ছি।

মেহের চলে গেল।

গান্না পত্র খুলে পড়তে লাগল।

প্রতিটি লাইনে তার মুখে যেন ভাবের পরিবর্তন হতে লাগল। পত্রের শেষ দিকে এসে একটু থেমে গেল সে। তারপর কি ভেবে হাসল। তারপর পত্রখানা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দিল। ছাদ থেকে দ্রুত মহলে চলে এল সে। মেহের কথা মত সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে ঢুকে দ্রুত একটুকরো কাগজে কি লিখিল গান্না, তারপর মেহেরের হাতে দিয়ে বলল, যা।

দ্রুত ছুটে পালাল মেহের।

একটা অধীর উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছিল শিহাব। মেহেরকে দেখে তার বুকখানা প্রচণ্ড দোল খেয়ে উঠল। দ্রুত এগিয়ে গেল সে মেহের কাছে। ফিস্ ফিস্ করে বলল, এনেছ ?

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল মেহের।

শিহাব বলল, দাও।

তবু পত্র বের করলনা মেহেরের।

অধৈর্য্য হয়ে শিহাব বলল, কৈ দাও ?

—আমার বক্‌শিস ?

তাড়াতাড়ি একখানা মোহর বের করে দিল শিহাব। একহাতে মোহর খানা নিয়ে অপর হাতে পত্র খানা বের করে দিল মেহের। তারপর বলল, আদাব জনাব। প্রয়োজন হলে বাঁদীকে তলব করবেন।”

মেহের চলে গেল।

পত্র খুলল শিহাবুদ্দিন। ছোট্ট একটু খানি উত্তর মাত্র। দু'লাইনে লেখা। কোন সম্বোধন নেই।

“এ নিছক নিমকহারামি। আসতে হলে দরওয়াজা দিয়ে আসবেন।”

গান্না বানু।

যেন একটা বিরাট থাপ্পড় এসে পড়ল শিহাবুদ্দিনের গালে। গান্নাকে সে ভুল বুঝেছিল। কিন্তু পিছিয়ে আসবার পাত্র সে নয়। বুলান্দ দরওয়াজ দিয়েই সে যাবে। গান্নার উদ্ধত্যের সমুচিৎ জবাব দেবেই শিহাবুদ্দিন। সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসল সে।

॥ একুশ ॥

মাটি আর নারী চির কাল মানুষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিহাবুদ্দিন ইমাদ উল্ মুলক হল, কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। সফদর জঙ্গ ভাবলেন অন্ততঃ তুরাণীদের সঙ্গে তার বিরোধ এখন একটু কমবে। শিহাবুদ্দিন এবার তার সহায়। কিন্তু শিহাব যাবার সময় সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে বিরাট এক আক্রোষ নিয়ে গেল। এমন আক্রোষ যা তার কৃতজ্ঞতাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দিল। কারণ নারী।

গান্নাবানুকে দেখে পাগল হয়েছিল শিহাব। তাকে তার প্রয়োজন। ধন নয়, ঐশ্বর্য্য নয়, শুধু একটি নারী, একটি নারীকে তার আজ বেশী প্রয়োজন। তাকে না পেলে জীবন তার ব্যর্থ। শিহাবের মনে হল। সফদর জঙ্গের এখানে না এলেই বুঝি ভাল হত। যে ক্ষতি পুরণের জন্য সে এসেছিল, তার চেয়ে বড় ক্ষতি নিয়ে সে ফিরে গেল। সে ক্ষতি হৃদয়ের ক্ষতি। সে ক্ষতি না পাওয়ার ক্ষতি। গান্নাকে পাবার তার কোন উপায় নেই, যদি না সফদর জঙ্গের জেনানা মহল লুণ্ঠন করা যায়।

শিহাব সেই প্রতিজ্ঞাই করল। ভুলে যাবে সে কৃতজ্ঞতা, প্রয়োজন হলে সফদর জঙ্গকে সে হত্যা করবে, তবু গান্নাকে তার চাই। ফিরে গিয়েই সে তাই সফদর জঙ্গের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে পড়ল। জ্ঞাতি শত্রু ইন্‌তিজামের শত্রুতার কথা মুহূর্তে ভুলে গিয়ে আবার তার সঙ্গে মিলিত হল। একদিন দেখা করল সে ইনতিজামের সঙ্গে। ইন্‌তিজাম বড় ভাই হলেও সালাম জানাল শিহাবকে। শিহাব এখন মিরবক্‌সী, প্রধান আমীর। নিজাম উল্‌মুল্‌ক।

প্রশ্ন করল ইন্‌তিজাম, কি খবর ?

—চতুর শিহাব বলল, তুরাণীদের কাছে এলাম।

—মানে ?

—মানে বুঝতে পারনি? সফদর জঙ্গের কাছে গিয়েছিলাম কাজ হাঁসিল করতে। কাজ হয়েছে। এবার সে আমার শত্রু।

সন্দিগ্ধ ইন্‌তিজাম প্রশ্ন করল, তোমার কি উদ্দেশ্য বলতো?

শিহাব স্পষ্ট করেই বলল, সফদর জঙ্গ আমার শত্রু। তুরাণীদের শত্রু। তার সর্ব্বনাশ চাই।

এক মুহূর্তে ইন্‌তিজাম ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তার পর তাকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

দু'ভাইয়ের মধ্যে আবার মিল হল।

স্নেহ ভাজনের মধ্য দিয়ে তুরাণীদের শত্রুতা—সফদর জঙ্গের পক্ষে প্রভূত ক্ষতিকারক হয়ে দাড়াল।

ভাগ্যও হয়তো সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে বিরূপ হয়েছিল। তাই তিনি একের পর এক কতকগুলি ভুল করে বসলেন। প্রথম ভুল হল বাদশাহী হারেমের পরিদর্শক জাবিদ খাঁনের সঙ্গে বিবাদে। জাবিদ খাঁ উজিরের উপর নিজের প্রাধান্য দেখাতে চাইলেন। উজিরের চেয়ে বেশী সম্মান করা হোক এ-দাবী করতে লাগলেন। উজিরের প্রতি কাজে জাবিদ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে জাবিদ খাঁকে হত্যা করালেন।

বিরাট ভুল করলেন তিনি। ইরাণী তুরাণীদের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করবার মত একজন লোককে সরিয়ে দিলেন। এর ফলে দুটি বিবাদমান দলে বিবাদ অবিসম্বাদিত রূপে দেখা দিল। বাদশাও তার প্রিয় পাত্রের মৃত্যুতে উজিরের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। নিজের নিরাপত্তার জন্যই তুরাণীদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

সফদর জঙ্গ আরো ভুল করলেন। বাদশার কাছে যেন তুরাণীরা যেতে না পারে, বা তার বিরুদ্ধে যাতে কোন দল গঠন করতে না পারে, এর জন্য তিনি লাল কেল্লার দরওয়াজাতে কিল্লাদার বসিয়ে দিলেন। কিল্লাদার দুর্গের মধ্যেই আশ্রয় নিল। উদ্দেশ্য বাদশা যেন দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন হবার চেষ্টা না করেন। অস্ত্র নিয়ে বা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দুর্গের ভীতরে প্রবেশ করা আমীরদের নিষিদ্ধ হল।

ফলে গণ্যমান্য আমীরেরা দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন। বাদশা অসন্তুষ্ট হলেন। বাদশা বুঝতে পারলেন যে, উজির তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিতে চাইছেন।

বাদশা আর বাদশা জননী উধম বাঈ তুরাণীদের স্মরণাপন্ন হলেন। বিশেষ করে শিহাবুদ্দিনকে ধরলেন উধম বাঈ।

উধম বাঈ বললেন, আমাকে রক্ষা কর ভাই।

একটু হেসে শিহাব বলল, কেন? কি হল?

—উজির সফদর জঙ্গ আমাকে বাঁদী করে রেখেছে দুর্গে।

—আপনি কি মুক্তি চান?

—হ্যাঁ, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। যদি পার, জেন, বাদশা তোমাকেই উজির করবেন।

শিহাব বলল, আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। তবে মনে রাখবেন আমি যা বলব সেই মত চলতে হবে। সন্দেহ করলে চলবে না।

উধম বাঈ বললেন, না, তোমাকে সন্দেহ করব না।

শিহাব কথা দিল।

এদিকে তুরাণীদের সঙ্গে ইরাণীদের সম্বন্ধ এমন শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে যে একে অপরকে যমের মত ভয় করছে।

উজির সফদর জঙ্গ দরবারই ত্যাগ করলেন, কারণ ইন্‌তিজামের প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে তাকে যেতে হয়। কি জানি, যদি সে ভিতর থেকে গুলি করেই বসে।

একদিন রাত্রে দিল্লীর অবস্থা এমন হল যে, সমস্ত রাজধানীতে হৈ হৈ পড়ে গেল। গুজব রটল গৃহ যুদ্ধ আরম্ভ হল বলে।

১৩ই মার্চ মধ্য রাত্রে উজির তার অনুচর পাঠাতে বাধ্য হলেন বাদশার কাছে। বলে পাঠালেন, তিনি শুনেছেন ইন্‌তিজাম তাঁকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সুতরাং তিনি তাঁর বাহিনী প্রস্তুত করলেন। পরদিন দিল্লীতে ভীতির রাজত্ব। দোকানী দোকান বন্ধ করল। জহুরী তার জহর নিয়ে পালাল। মারাঠারা লুণ্ঠনের অপেক্ষায়

রাজপথ দিয়ে ঘুরতে লাগল। খাস চৌকি বাহিনী লালকেল্লার চারদিকে বাদশাকে রক্ষা করবার জন্য ভীড় জমাল।

অবশেষে বাদশার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ তাদের বাহিনী দুর্গের বাইরে নিয়ে গেলেন।

১৭ই মার্চ। চতুর শিহাব গোপনে উধম বাঈ আর বাদশার সঙ্গে দেখা করল। বলল, আপনারা উজিরের কাছ থেকে মুক্তি চান?

বাদশা শিহাবের হাত ধরে বললেন, চাই। বিনিময়ে উজিরী তোমার।

শিহাব বলল, তাহলে আমার কথা মত আজকে রাত ন'টার সময় এক কাজ করবেন। রাত ন'টাতে আমার অনুচরেরা রাজধানীর উপর হল্লা করবে। বলবে দুষমনেরা কেল্লা আক্রমণ করতে আসছে। আপনি মিরঅতিসকে ডেকে বলবেন, যাও দরওয়াজার বাইরে কামান সাজাও, তোমার বাহিনী নিয়ে দাঁড়াও সে যেমনি বাইরে যাবে অমনি আপনি দরওয়াজা বন্ধ করে দেবেন। আর ওদের দুর্গে প্রবেশ করতে দেবেন না।

অপূর্ব যুক্তি। বিনা আঘাতে শত্রুকে পর্যুদস্ত করবার প্রকৃষ্ট উপায়। বাদশা স্বীকার করলেন।

সে দিনই রাত ন'টায় পূর্ব কল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজধানীতে হল্লা হল। গুজব রটল দুষমনেরা লাল কেল্লা আক্রমণ করতে আসছে।

বাদশা আহমদ শাহ সহকারী মিরঅতিসকে ডেকে আদেশ দিলেন, আপনার তোপ বাহিনী নিয়ে দরওয়াজার বাইরে দাঁড়ান। দুষ্‌মনেরা যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে।

সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। সহকারী মির অতিস তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরওয়াজা বন্ধ হয়ে গেল।

শিহাবের বুদ্ধির কাছে প্রথম ভুল করলেন সফদর জঙ্গ। ফলে লাল কেল্লার উপর তার কর্তৃত্ব গেল। পরদিন সফদর জঙ্গ নিজেই ভুল করলেন, যার ফলে দিল্লী নগরী ছেড়ে যেতে হল তাকে।

যখন সংবাদ পেলেন তিনি যে, সহকারী মির অতিসকে দুর্গথেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্রোধে ফেটে পড়লেন উজির সাহেব। বাদশাকে ভয় দেখিয়ে দুর্গ হাত করতে চাইলেন তিনি। ভাবলেন যদি পদত্যাগের হুমকি দেন, তবে বাদশা এর পেছনে প্রচ্ছন্ন চোখ রাঙানীর কথা ভেবে নতি স্বীকার করবে না। তাই তিনি বাদশাকে লিখে পাঠালেন।

মহামান্য বাদশা,

আমার প্রতি আপনি বিরূপ হয়েছেন। আমাকে আদেশ করুন আমি দিল্লী নগরী ত্যাগ করে যাচ্ছি। আপনি আমার প্রাপ্য অর্থ থেকে সৈন্যনের বেতন মিটিয়ে দেবেন। আমার উজিরী পদ মহামান্য বাদশা যাকে ইচ্ছে করেন দিতে পারেন। বাদশার হুকুম তামিল করতেই আমি রয়েছি।

ইতি,—

বান্দাধম সফদর জঙ্গ বাহাদুর।

বাদশা শিহাব আর ইন্‌তিজামকে পত্র দিলেন। বললেন,—এখন কি করব বল?

শিহাব বলল, এই মুহূর্তে পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করুন।

—যদি কোন বিপদ হয়?

ইন্‌তিজাম বলল, আমরা আছি।

বাদশা তুরাণীদের ভরসায় সফদর জঙ্গের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। বাদশা শিহাবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিজের হাতে পত্র লিখে দিলেন:

জনাব,

সফদর জঙ্গ,

আমার প্রেরিত পরিচ্ছদ আর উপহার গ্রহণ করুন।

আপনার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হইল। আপনাকে এই মুহূর্তে অযোধ্যা যাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

ইতি,—

মহামান্য বাদশা আহম্মদ শা

পত্র পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সফদর জঙ্গ। বুঝলেন চালে ভুল করেছেন তিনি। কিন্তু তখন আর অনুশোচনা করে লাভ নেই। দিল্লী ত্যাগ করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন তিনি।

কিন্তু দিল্লী ত্যাগ করতে হলে কিছু কর্ত্তব্য করবার আছে তাঁর। তিনি ইরাণীদের নেতা। তার উপর অনেক ইরাণীই নির্ভর করে আছে। তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি সলাবৎ খাঁ আর আলিকুলিকে ডাকলেন।

সলাবৎ ইতি পূর্বে রাজপদ থেকে ইরাণী অজুহাতে বরখাস্ত হয়েছেন। কিন্তু কি জানি কেন, আলকুলির পদচ্যুতি ঘটে নি। সলাবৎ খাঁ নিজে থেকেই সফদর জঙ্গরে সঙ্গে অযোধ্যা যেতে প্রস্তুত হলেন। সফদর জঙ্গ তাকালেন, আলিকুলির দিকে, কি কবি, তুমি কি করবে?

সকলে ভাবল আলিকুলি থেকে যাবেন, কারণ তিনি অল্প-শত্রু লোক, তা ছাড়া সমস্ত ইরাণী আমীরদের পদচ্যুতি হলো তাঁর হয়নি। এর মানে হল এই যে, বাদশা তার উপর অসন্তুষ্ট নন।

কিন্তু আলিকুলি সফদর জঙ্গকে চমকে দিয়ে বললেন, জনাব, আপনি যেখানে যাবেন আমিও যাব।

সফদর জঙ্গ বললেন, কিন্তু মনে হচ্ছে বাদশা তোমাকে তাড়াতে চান না। তিনি তোমার উপর প্রীত।

আলিকুলি উত্তর দিলেন, প্রয়োজন হয় রাজপদ ত্যাগ করব, তবু প্রিয় জনের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে চাই না।

এত বিপদের মধ্যেও সফদর জঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ হল। মানুষ তাহলে আজো আছে! সবাই শিহাব নয়। তবু তিনি আলিকুলিকে আরো পরীক্ষা করবার জন্য বললেন, কিন্তু তোমার বেগম, কন্যা এরা রয়েছেন। তাদের মত নেওয়া প্রয়োজন নয় কি?

আলিকুলি বললেন, আমার বেগম নিমকহারাম নন। আমার কন্যা আপনারই কন্যা, সুতরাং সে প্রশ্ন অবান্তর।

সফদর জঙ্গ আবেগে আলিকুলিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

২৬শে মার্চ সফদর জঙ্গ দারা সুকোহর প্রাসাদ ত্যাগ করলেন, তার চোখে জল নেমে আসল। লাল কেল্লার পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি অদৃশ্য বাদশার উদ্দেশ্যে সালাম জানালেন। তারপর ইরাণী অনুগামীদের নিয়ে তিনি চিরদিনের জন্য দিল্লী ত্যাগ করলেন। প্রথম দিন দিল্লী নগরীর বাইরে গিয়ে শিবির গড়লেন তিনি।

সফদর জঙ্গের দিল্লী ত্যাগ করবার সংবাদ পাবা মাত্র শিহাব দারা সুকোহর প্রাসাদে দূত পাঠাল আলিকুলিকে সালাম জানাবার জন্য। বলে দিল তাঁকে যেন জানানো হয় যে, তাঁর কোন ভয় নেই। কিন্তু কিন্তু বার্তাবহ ফিরে এসে তাকে জানাল যে আলিকুলিও সফদর জঙ্গের সঙ্গে দিল্লী ত্যাগ করেছেন। হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল শিহাবুদ্দিনের। তাহলে এই ষড়যন্ত্র করে তার কি হল? যাকে তার প্রয়োজন সেই যে চলে যাচ্ছে! না, না, তা' হতে পারে না। যেমন করেই হোক বাধা দিতে হবে। শিহাবুদ্দিন ছুটে গেল বাদশা জননী উধম বাঈয়ের কাছে।

শত্রু পরাজিত। উধম বাঈ আজ উৎফুল্ল। হাসি মুখে তিনি শিহাবকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন, এস উজির সাহেব। আজ থেকে তুমিই উজির।

উধম বাঈকে কুর্নীশ জানাল শিহাব। তারপর বলল, যদি তাই মনে করেন তবে আমার বুদ্ধি মত কাজ করুন।

—বল।

শিহাব তখন অন্য কথা চিন্তা করছিল। যে করেই হোক সফদর জঙ্গকে বাধা দিতে হবে এবং তার শিবির লুণ্ঠন করে গান্না বানুকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। সুতরাং শীগ্‌গীরই যুদ্ধের প্রয়োজন। সে বলল সফদর জঙ্গের ভাব সাব ভাল মনে হচ্ছে না। মনে হয় তিনি

আমাদের আক্রমণ করতে চান। তাঁর মারাঠা বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এই মুহূর্তে আমাদের উচিৎ হবে তাকে সুযোগ না দিয়ে আক্রমণ করা।

উধম বাঙ্গী বললেন তা কি উচিৎ হবে। আমরা এখনও প্রস্তুত নই। তা ছাড়া সফদর জঙ্গ প্রত্যক্ষ ভাবে কোন শত্রুতার চেষ্টা করেন নি। হঠাৎ একটা কিছু করতে গেলে....

শিহাব কিন্তু ধৈর্য্য ধরতে পাচ্ছে না। বলল, বেশ, সফদর জঙ্গ যে আমাদের আক্রমণ করতে প্রস্তুত হচ্ছে তার প্রমাণ দিচ্ছি।

চতুর উধম বাঙ্গী বললেন, হ্যাঁ, সেটা আমাদের একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু কাজ হাসিল করবার মত বুদ্ধির অভাব শিহাবুদ্দিনের কখনও হয়নি। সে এক নতুন কৌশল বের করল। গোপনে সফদর জঙ্গকে পত্র লিখে অপমান করল।

দিল্লীর বাইরে সফদর জঙ্গ অবশ্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করবার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তখন সলাবৎ খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। পত্র পাঠ করে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সফদর জঙ্গ।

সলাবৎ খাঁ জিজ্ঞেস করলেন, কে লিখেছে ?

—নিমকহারাম। এক কাল সাপকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, তার গুণগার দিচ্ছি।

তিনি পত্রখানা বের করে সলাবৎকে পড়তে দিলেন। সলাবৎ পত্র খুলে পড়লেন। লেখা হয়েছে :

জনাব সফদর জঙ্গ, সুবেদার উড়িষ্যা,

আপনাকে বাদশার নির্দ্দেশ অনুযায়ী জানান যাইতেছে, আপনি আলিকুলিও তার পরিবারবর্গকে দিল্লীতে ফেরৎ পাঠাবেন। তাঁর আদেশের অন্যথা না হয়।

বাদশার আদেশ ক্রমে, মীর বক্সী ইমাদ-উল-মুল্ক।

সলাবৎ পড়ে বললেন, আমি তখনি বলেছিলাম (শিহাবুদ্দিন) এ কাল সাপটিকে আশ্রয় দেবেন না। এখন বুঝতে পাচ্ছি যে এ সমস্ত চক্রান্তের মূলে আছে শিহাবুদ্দিন।

সফদর জঙ্গ বললেন, বেশ এই যদি হয়, তবে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। দাঁড়াও আগে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে নিই।

তিনি তৎক্ষণাৎ আলিকুলিকে তলব করলেন। আলিকুলি এলে পত্রখানা তাকে পড়তে দিলেন। পাঠান্তে আলিকুলির মুখেও ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল।

সফদর জঙ্গ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি মত?

আলিকুলি গম্ভীর ভাবে বললেন, আমার কাছে বাদশা-উজির নেই। আমার কাছে আছেন শুধু জানাব সফদর জঙ্গ। জীবন থাকতে তাঁকে ছেড়ে আমি অন্যত্র যাব না।

সফদর জঙ্গ খুশী হলেন। বললেন, এ আমি জানতাম।

তিনি সলাবৎ খাঁর দিকে ফিরে বললেন, শোন। আমার জবানীতে তুমি বাদশাকে একটি পত্র লিখে দাও যে, আমার শত্রু শিহাববুদ্দিন আর ইন্‌তিজাম। বাদশা যদি সাহস করেন আমার বিরুদ্ধে যেন তাদের আসতে বলেন।

সলাবৎ খাঁ লিখলেন :

মহামান্য বাদশা,

আমার দুষ্‌মন ইমাদ (শিহাববুদ্দিন) আর ইন্‌তিজাম। তারাই আপনার মন আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছে। তাদের বাইরে এসে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলুন।

ইতি

বান্দাধম-সফদর জঙ্গ বাহাদুর।

শিহাবের কৌশল কাজে লাগাল। সফদর জঙ্গ নিজে যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। পত্রখানা নিয়ে সে উধম বাঈকে দেখাল। উধম বাঈ এবার ভয় পেলেন। বললেন, তাহলে?

শিহাব বলল, আমদের প্রস্তুত হয়ে তাকে আক্রমণ করতে হবে।

—বল, আমাদের কি করতে হবে ?

—অর্থের প্রয়োজন প্রথম। আমাদের বাহিনী গঠন করতে হবে। উধম বাঈ শিহাবের হাত ধরে বললেন, আমি তোমাকে দু'কোটি টাকা দেব, তুমি বাদশাকে রক্ষা কর।

শিহাব বলল, ভয় নেই, আপনি নিঃশ্চন্ত থাকুন, সফদর জঙ্গকে আমি পরাজিত করবই !

॥ বাইশ ॥

যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। সফদর জঙ্গ বাদশার খাস মহল লুণ্ঠন করলেন। শুধু তাই নয়, দিল্লীনগরী অবরোধ করে দাঁড়ালেন। দিল্লীতে খাদ্য শস্য আমা বন্ধ হল।

বাদশা নতুন উজির ইন্‌তিজাম ও মীরবক্‌সী ইমাদ উল্ মুলকে ডাকলেন। আহমদশা বললেন, সফদর জঙ্গ দিল্লী অবরোধ করেছেন, এখন কি করব বল? ইন্‌তিজাম বললেন, ইরাণীদের একের পর এক রাজ পদ থেকে সরিয়ে দিন, তবেই সফদর জঙ্গ নত হবেন।

ইমাদের দিকে তাকান হলে সে বলল, আমার একটি আর্জি আছে।

—বল।

—শুধু আলিকুলির উপর হস্তক্ষেপ করবেন না।

একটু আশ্চর্য্য হয়ে বাদশা তার দিকে তাকালেন, বললেন, কিন্তু শুনেছি আলিকুলি, সফদর জঙ্গের শিবিরে আছে। এই বিদ্রোহের মূলে সেও একজন।

ইমাদ বলল, না, শাহানশা, সে কারো দলে নয়। তাকে সফদর জঙ্গ জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

—কেন?

তার কন্যা গান্নাবানুকে সফদর জঙ্গ পুত্রবধু করতে চায়।

বাদশা বললেন, বেশ তাই হবে।

এবার ইন্‌তিজাম বলল, আরো একটি কথা।

—বলুন।

—সফদর জঙ্গের পুত্র সুজা মির অতিস। এক্ষুণি তাকেও বরখাস্ত করবেন না। তাহলে সফদর জঙ্গ হতাশ হয়ে ক্ষতিকর পন নিতে পারে। বরং অন্যান্য সব গুরুত্ব পূর্ণ পদ থেকে ইরাণীদের বরখাস্ত করুন।

তাহলে সফদর জঙ্গ ভয় পাবেন। কথা যুক্তি যুক্ত। বাদশা স্বীকার করলেন।

সলাবৎ খাঁ, জনাবৎ খাঁ, প্রভৃতিকে তৎক্ষণাৎ বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী সরকারী পদ থেকে বরখাস্ত করা হোল। সঙ্গে সঙ্গে সে খবর সফদর জঙ্গকে জানিয়ে দেওয়া হল। সফদর জঙ্গ কিন্তু মোটেই ভয় পেলেন না। উল্টে পারিষদ বর্গের সঙ্গে পারামর্শ করে মারাঠাদের ডেকে নিজের শিবিরে নিয়ে আসলেন। উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে দিল্লী লুণ্ঠন করবেন। মারাঠাদের দুর্দ্ধর্ষতা, তাদের হিংস্রতা বাদশাহী দরবারে কারো অজানা নায়। সংবাদ পেয়ে বাদশা ভয় পেলেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবেই সফদর জঙ্গকে লিখে দিলেন :

'জনাব, আপনি অস্ত্র ত্যাগ করুন। আপনাকে উজির পদে বহাল রাখা হবে। এই মুহূর্তে গৃহ যুদ্ধ সমীচিন নয় বলেই এরূপ অনুরোধ জানাচ্ছি।'

পত্র পেয়ে সফদর জঙ্গ সলাবৎ আর জনাবৎ খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন, জিজ্ঞেস করলেন, মিটমাট কয়ে নেওয়া কি বাঞ্ছনীয় হবে ?

সলাবৎ বাদশাহী ফরমান বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি বললেন মোটেই না।

—কিন্তু এতে আমাদের লাভ হবে কি ?

সলাবৎ বললেন, আমাদের লাভ না হলেও যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধ বন্ধ করা যেতে পারে, যদি বাদশা আমাদের অনুরোধ শোনেন।

—কি রকম ?

সলাবৎ বললেন, আপনি লিখে দিন যে, বাদশা যদি মির বক্সীর পদ, সহকারী বকসীর পদ, আর লাহোর ও মুলতানের সুবেদারী তুরাণী-দের দেন তবেই মিটমাট সম্ভব। শুধু তাই নয় ইমাদ আর ইন্তি-জামকেও দরবার থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এ যদি না হয় আমরা দিল্লী আক্রমণ করবই।

সফদর জঙ্গ সলাবৎ খাঁর পরামর্শ অনুযায়ী পত্র দিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার সর্ত ছিল অসম্ভব। বাদশা যদি তুরাণীদের বরখাস্ত করতে যান, তবেও বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবি। তবে তুরাণীদল লাল কেল্লা লুণ্ঠন করবে। কারণ সেই মুহূর্তে লালকেল্লা তাদের হাতেই ছিল। সুতরাং তিনি অন্য পন্থা গ্রহণ করলেন। যাদের হাতের মুঠোয় রয়েছেন তাদের সঙ্গেই ভাগ্য মিলিয়ে দিলেন। আবার তিনি ইন্‌তিজাম আর ইমাদকে ডাকলেন। বললেন, মিটমাট অসম্ভব। যুদ্ধই আমাদের করতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হন।

অবিলম্বে যুদ্ধই ছিল শিহাবের কাম্য। এক মুহূর্ত গান্নার বিরহ ছিল তার অসহ্য। সুতরাং সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। উধম বাইয়ের দু'কোটি টাকার সঙ্গে তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি ব্যয় করে বিরাট বাহিনী গঠন করেছিল সে। বলল, শাহান শা, আমারও তাই মত। আপনি যুদ্ধ ঘোষণা করুন।

বাদশা বললেন, বেশ তাই হবে।

ইন্‌তিজাম বলল, আপনি সুজাকে পদচ্যুত করে সফদর জঙ্গকে জানিয়ে দিন। যদি তাঁর চৈতন্য হয় তবে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে। নতুবা যুদ্ধ অনিবার্য্য।

ইন্‌তিজামের পরামর্শ অনুযায়ী সুজাকে বরখাস্ত করা হল। জানিয়ে দেওয়া হল সফদর জঙ্গকে।

সফদর জঙ্গ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, সুজার পদচ্যুতি গ্রহণ করলাম। আপনি দিল্লী রক্ষা করুন। আপনার পরামর্শদাতাদের এবার আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে বলুন।

সফদর জঙ্গ তার জাঠ বন্ধু রাজেন্দ্রনিধি আর সুরজমলকে পুরাতন দিল্লী আক্রমণ করবার নির্দ্দেশ দিলেন।

১০ই মে। সুজার পদচ্যুতির উত্তর—এল পুরাতন দিল্লী লুণ্ঠন।

কিন্তু এর উত্তর দেবার জন্য ইমাদ প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে

বাদশাকে বলল, আপনি আদেশ করুন আমি সফদর জঙ্গকে আক্রমণ করি।

ইন্‌তিজামকে সে আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বলল। ইন্‌তিজাম ছিলেন যুদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সুতরাং ইতস্ততঃ করতে লাগল। বলল, এখন যুদ্ধ না করে মিমাংসার পথ দেখা যেতে পারে।

ইমাদ অন্য চরিত্রে গড়া। বলল, ভয় নেই, আমিই সব করব। সেদিনই সন্ধ্যাবেলা ইমাদ বাদশাহী ফৌজ নিয়ে আক্রমণ করল সফদর জঙ্গকে।

যুদ্ধ বিদ্যায় ইমাদও মোটেই অভিজ্ঞ নয়। অথচ তারই আক্রমণ সহ্য করতে পারলেন না প্রবীণ সফদর জঙ্গ। ইমাদ মরিয়া। সফদর জঙ্গ আক্রমণের মুখে পিছু হটে গেলেন।

ইমাদের বুকে তখন অসীম সাহস, আর আশা।

যেমন করেই হোক—সফদর জঙ্গকে বন্দী করতে হবে। গান্নাকে তার চাইই। দরবারে সে বাদশা আর ইন্‌তিজাম উভয়কেই প্রত্যক্ষ ভাবে যোদ্ধাবেশে অস্ত্র নিয়ে থাকতে বলল। বলল শাহান শা আর উজির ইন্‌তিজামউদ্দিন যদি অন্ততঃ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতও থাকেন আমি মনে করি আমি দু'দিনেই সফদর জঙ্গকে পরাজিত করতে পারব।

কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া বাদশার স্বাভাবিক কারণই নয়। বললেন, আমি প্রয়োজন হয় যাব। তার আগে উজির সাহেব এর নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।

যুদ্ধকে ইন্‌তিজাম বাদশার চেয়ে কম ভয় করে না, তথাপি স্বীকৃত হলেন। অবশ্য সাময়িক ভাবে।

দ্বিতীয় সংঘর্ষে সফদর জঙ্গ আবার পরাজিত হলে, নানা কারণে ইন্‌তিজাম অগ্রসর হতে চাইলেন না। তিনি গিয়ে বাদশাকে গোপনে বোঝালেন, জাঁহাপনা।

—বলুন।

—আমার মতে যুদ্ধে আর আমাদের মোটেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ হবে না।

—কেন ?

ইনতিজাম বললেন, এ যুদ্ধে যদি ইমাদ চূড়ান্ত ভাবে সফদর জঙ্গকে পরাজিত করতে পারে, তবে তাকে বাগে আনা কষ্টসাধ্য হবে। সে হয় তো আপনারই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে বসবে। তাই ভাল হবে যদি এখনই যুদ্ধ বন্ধ করেন। তবে দুই শত্রুর শক্তি সাম্য বজায় রেখে আপনি নিরাপদ হতে পারবেন।

বাদশা ইন্‌তিজামকে কথা না দিলেও তাঁর যুক্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। অবশ্য তখনই তিনি যুদ্ধ বন্ধ করলেন না।

ইমাদ তার সমস্ত অর্থ আর শক্তি ব্যয় করে সফদর জঙ্গকে আক্রমণ করল। ২৪শে সেপ্টেমম্বর তার মূল বাহিনী সফদর জঙ্গকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করল। সফদর জঙ্গ বল্লভ গড়ের দিকে পালালেন।

সুযোগ পেলে ইমাদ তৎক্ষণাৎ উজিরকে গ্রেপ্তার করত। কিন্তু তার পক্ষেও হতাহতের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল না। নতুন বাহিনী, নতুন অর্থ না হলে, যুদ্ধ চালান অসম্ভব।

কিন্তু আপোষ করবার মত সময় নেই হাতে। হৃদয় পাগল। গাম্লাকে অযোধ্যায় যেতে দেওয়া কিছুতেই চলবে না। ইমাদ তার ক্লান্ত সেনাপতিদের অনুরোধ করল সফদর জঙ্গকে অনুসরণ করবার জন্য। কিন্তু সেনাপতিরা বললেন, নতুন করে বাহিনী না গড়লে, অনুসরণ সম্ভব নয়। কিন্তু ইমাদের তখন পৈতৃক অর্থ নিঃশেষিত হয়েছে। আর অর্থ নেই। তবে উপায় ?

সেনাপতিরা বললেন, আর একটি মাত্র আক্রমণে সফদর জঙ্গ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। আপনি উজির ইন্‌তিজামকে অনুরোধ করুন। তার অর্থ আর বাহিনী দুইই রয়েছে। তিনি যদি এবার যুদ্ধে নামেন, তবে যুদ্ধ জয় অনিবার্য। সফদর জঙ্গ বল্লভ গড়ের দিকে

পালালে আবার দরবার বসল। প্রকৃত পক্ষে ইমাদই এ দরবার আহ্বান করাল। বাদশাকে বলল, জাঁহাপনা, আপনি অথবা উজির সাহেব প্রত্যক্ষ ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করুণ আমি কথা দিচ্ছি আর একটি মাত্র যুদ্ধে, সফদর জঙ্গ বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

বাদশা কোন কথা না বলে ইন্‌তিজামের দিকে তাকালেন। ইন্‌তিজাম নির্বিকার।

বাদশা প্রশ্ন করলেন, আপনার কি মত উজির সাহেব?

ইন্‌তিজাম তখন মনস্থির করে ফেলেছেন। ইমাদকে চূড়ান্তজয় লাভ করতে দেওয়া যাবে না। তাঁর স্বাভাকি বুদ্ধিতে ইন্‌তিজাম বুঝেছিলেন যে ইমাদ একবার সুযোগ পেলে শুধু মির বক্‌সী নয়, উজিরী পদের দিকেও হাত বাড়াবে। সফদর জঙ্গের চেয়ে ইমাদ হবে আরো বেশী ক্ষতিকারক। তিনি বললেন, আমার আর যুদ্ধ বাড়িয়ে যাবার ইচ্ছে নেই।

অশ্চর্য্য হয়ে ইমাদ তাকাল ইন্‌তিজামের দিকে, কেন?

—কারণ অর্থ নেই।

—কিন্তু আর একটি :মাত্র যুদ্ধেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হতে পারে। ইন্‌তিজাম নির্বিকার ভাবে বললেন, তাও হতে পারে।

ইমাদ এবার বাদশার দিকে তাকাল, বলল, তবে আমাকে এ যুদ্ধে সর্বশান্ত করবার কি প্রয়োজন ছিল?

বাদশা তাকে সান্ত্বনা দিলেন, তোমার যুদ্ধ তো ব্যর্থ হয় নি। সফদর জঙ্গ পরাজিত হয়েছেন। তিনি অপমানিত হয়েছেন।

ইমাদ বলল, তিনি এখনো দিল্লী আক্রমণের আশা ত্যাগ করে অযোধ্যা চলে যান নি।

ইন্‌তিজাম বললেন যাননি, কিন্তু, যাবেন বলেই আশা করি। আমরা সে ভাবেই তাকে আদেশ পাঠাব, যদি না যান তবে ইমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ করা যাবে।

ইমাদ যেন উন্মাদ হয়ে উঠল, বলল, পরাজিত শত্রুর প্রতি এটা অনুকম্পা ব্যতীত আর কিছু নয়।

ইন্‌তিজাম কিছু না বলে চুপ করে থাকলেন।

ইমাদ বাদশার মুখের দিকে তাকাল। বাদশাও যুদ্ধের অনুকুলে কোন মত প্রকাশ করলেন না।

কিন্তু ইমাদ চেঁচিয়ে উঠল, ভীরু। সব ভীরু।

কিন্তু বাদশা বা ইন্‌তিজামের তরফ থেকে কোন উৎসাহই দেখা গেল না।

ক্রোধে ইমাদের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ দরবার ত্যাগ করল।

ইন্‌তিজাম বাদশাকে বললেন, আপনি সফদর জঙ্গকে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান।

—তারপর ?

ইন্‌তিজাম বললেন, আমার সঙ্গে তার গোপন পত্র বিনিময় হয়েছে। আপনি তাকে ক্ষমা করলে তিনি অযোধ্যা চলে যাবেন।

বাদশা বললেন, বেশ, তবে তাকে তাই লিখে দিচ্ছি।

॥ তেইশ ॥

যুদ্ধ বন্ধ হল।

বল্লভ গড় থেকে সফদর জঙ্গ অযোধ্যাতে ফিরলেন। ভয়ানক গম্ভীর তিনি। কিন্তু এলাহাবাদে সুজা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ত্রুটি করে নি। অভ্যর্থনা দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে, সফদর জঙ্গ যুদ্ধে জয়ী, কিম্বা পরাজিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু এ অভ্যর্থনায় সফদর জঙ্গের মন আর ভরবার নয়। তাঁর গৌরব, মান, জীবন, সব কিছুই তিনি দিল্লীতে হারিয়ে এসেছেন। তখন শুধু তাঁর ব্যর্থ অবসর।

সুজা পিতাকে দেখে চমকে উঠল। সফদর জঙ্গ নীরবে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন, কিন্তু কোন কথা বললেন না। পার্শ্বে হস্তি পৃষ্ঠে বেগম সাহেবা, বুলবুল, গান্না আর অন্যান্য মহিলারা অপেক্ষা করছিলেন। সফদর জঙ্গ তাদের হারেমে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

তিনি বোরখাবৃত বুলবুল আর গান্নাকে দেখিয়ে বললেন, এদের আমার বাগিচার প্রাসাদে নিয়ে যাবে।

সুজা পিতাকে কুর্নীস জানিয়ে বেগমদের নিয়ে হারেমে চলল। ওদের বিদায় দিয়ে একক ভাবে সফদর জঙ্গ নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। তাঁর গম্ভীর ভাব দেখে সান্ত্বনার বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করতে সাহস করল না কেউ।

এমনকি সলাবৎ খাঁ আর আলিকুলি পর্যন্ত নীরবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তবে বেশী সময় তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। সফদর জঙ্গ—সলাবৎ আর আলিকুলিকে ডেকে পাঠালেন।

তাঁরা প্রকোষ্ঠে গিয়ে সফদর জঙ্গকে সালাম জানিয়ে দাঁড়াল। সফদর জঙ্গ ওদের বসতে বললেন। ওরা বসল।

সফদর জঙ্গ একটু ক্লান্ত হাসি হেসে সলাবতের দিকে তাকালেন। বললেন, তুমি বোধ হয় ভুল করেছ সলাবৎ।

সলাবৎ দু'চোখে প্রশ্ন তুলে তাকালেন।

সফদর জঙ্গ বললেন ; তুমি দিল্লী থাকলেই ভাল করতে। এখানে এসে শুধু দুঃখের জীবন বরণ করে নেবে।

সলাবৎ কসম খাবার ভঙ্গী করে বললেন, আল্লা জানেন।

আপনি যেখানে, আমিও সেখানে সুখী।

এবার সফদর জঙ্গ তাকালেন আলিকুলির দিকে। আলিকুলি শির নত করে বললেন, আমিও সুখী।

সফদর জঙ্গ একটি পত্র বাড়িয়ে ধরলেন আলিকুলির দিকে। আলিকুলিকে ফিরে যাবার জন্য বাদশার অনুরোধ পত্র। পথে আসতে সফদর জঙ্গের কাছে পৌঁছেছে। আলিকুলিকে উন্নত পদের লোভ দেখান হয়েছে।

আলিকুলি পত্রখানা পড়ে, ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করতে বাধা দিলেন সফদর জঙ্গ, দাঁড়াও, দাঁড়াও। ছিঁড়ো না।

ম্লান মুখে আলিকুলি বললেন, এ দিয়ে কি হবে ?

ধীরে ধীরে সফদর জঙ্গ বললেন, কাজে লাগবে। অত আবেগ প্রবণ হলে জীবন চলে না। ভবিষ্যৎ কি দেখা যায়! কখন কি প্রয়োজনে লাগবে কে বলতে পারে। হয় তো পত্রাধিকার বলে তুমি একদিন আমাদেরই উপকার করতে পারবে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে যেন আলিকুলি বললেন, বেশ, তবে থাক। সফদর জঙ্গ একবার সলাবতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আহমদ শার জন্য দুঃখ হয়। তিনি তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করলেন। আহা বেচারী বড় অসহায় ছিল।

সলাবৎ একটু ক্রোধের ভঙ্গীতে বললেন, উচিৎ শাস্তি হয়েছে। বাধা দিলেন সফদর জঙ্গ, না না, ওকথা বোল না। সত্যি বেচারী ছিল অসহায়।

কথার মোড় ফেরালেন তিনি, বললেন, সে যাই হোক, অতীত

নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। এবার থেকে আমাদের নতুন জীবন গড়তে হবে এখানে। আলিকুলি—

—বলুন জনাব।

—তোমার বাসা হবে আমার বাগিচার প্রাসাদে। যেখানে এতক্ষণ তোমার বেগম আর গান্না গিয়ে পৌঁছেছে। তুমি যাও।

আলিকুলি তবু দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সফদর জঙ্গ বললেন, যাও। আবার দেখা হবে। আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব। রোজ আমি আমার আম্মার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আলিকুলি প্রস্থান করলেন।

সফদর জঙ্গ সলাবতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি থাকবে দরিয়ার পাশে, প্রাসাদে, যাও।

সলাবৎ সালাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

অপর দিকে হারেমে এসে বেগম সাহেবা হস্তি পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। বুলবুল আর গান্নাও নামল। বেগম সাহেবা বুলবুলের দিকে তাকালেন।

নিতান্ত বেদনা ক্লিস্ট। বললেন, যাও বহিন আবার দেখা হবে। বুলবুল আবেগে বেগম সাহেবার হাত জড়িয়ে ধরল। বেগম সাহেবা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি গান্নার মুখের বোরখা খানা খুলে ফেললেন। সুজা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ তার দুচোখ ঝলসে দিয়ে চমকে উঠল। হতবুদ্ধি হয়ে সুজা সেই মুখ খানি দেখল, সেই গান্না এই হয়েছে!

বেগম সাহেবা তাঁর দু'করতলে গান্নার মুখখানি তুলে ধরে চুম্বন করলেন। বললেন, এস আম্মা। গান্না কেঁদে ফেলল।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিলেন বেগম সাহেবা, সেকি! চোখে জল কেনরে? তুই তো আমার পাশেই থাকবি। রোজ দেখা হবে।

আবার গান্নার মুখে বোরখা নামিয়ে দিলেন তিনি। সূর্য্যকে যেন কে ঢেকে দিল। সুজার চোখের সামনে পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে এল।

বেগম সাহেবা জেনানা মহলে গেলেন।

সুজা আলিকুলির পরিবারকে নিয়ে বাগিচার প্রাসাদে এল। প্রাসাদ ঘরে এসে সালাম জানিয়ে সে বুলবুল বেগমকে বলল। এই আমাদের গরীব খানা।

বুলবুল হাত উঠিয়ে তাকে বিদায় দিল।

কিছু দূরে প্রাসাদ। বুলবুল আর গান্না এগিয়ে চলল। সুজা ঠায় দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল। প্রাসাদের সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বোরখা খুলে ফেলল ওরা। মহলে প্রবেশ করবার পূর্বে গান্না একবার পেছনে তাকাল। দেখল সুজা দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন একটা প্রতীক্ষার ভাব দিয়ে গড়া সুন্দর প্রস্তর মূর্তি। এই একটা পশ্চাৎবর্তী দৃষ্টির জন্যই অপেক্ষা করছিল সুজা। নিজেকে তার ধন্য মনে হল।

কি জানি কেন, গান্নার বুকটাও দুলে উঠল।

॥ চব্বিশ ॥

সফদর জঙ্গ অযোধ্যাতে পালিয়ে গেলেন। ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদ হয়ে যাবার মতন হল ইমাদের। জীবনে এ তার চরম পরাজয়। এর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ছিল অনেক ভাল। একবার এমন হল, মনে হল আত্মহত্যা করবে সে।

কিন্তু তৎক্ষণাত গান্নার কথা মনে পড়ল। না, না তাকে তার চাই। জীবন ভোর যদি তার জন্যই প্রস্তুত হতে হয়, তাই হবে। তবু গান্নাকে তার চাই। সিংহ দরজা দিয়ে গান্না তাকে জয় করে নিতে বলেছে, তাই হবে। সে একদিন তাকে জয় করেই নিয়ে আসবে।

কিন্তু আজকে যারা তাকে তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাদের সে রক্ষা করবে না। ইন্‌তিজাম আর বাদশা আহমদ শা তার শত্রু।

নিজের সেনাপতিদের নিয়ে সে পরামর্শ সভা বসাল। তার বিশ্বস্ত অনুচর অকিবৎ মহম্মদ খাঁ কিছুদিন যাবতই ইমাদকে লক্ষ্য করে আসছিল। লক্ষ্য করছিল, ইমাদ যুদ্ধ জয় করে যেন ভেঙে পড়েছে। কি এক যন্ত্রণা যেন তার অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সে বলল, ইমাদ সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন মনের মধ্যে আপনার কোন ব্যাধি হয়েছে।

ইমাদ বলল, হ্যাঁ! ইন্‌তিজাম আর বাদশাকে আমি দেখে নেব। অকিবৎ ইমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

ইমাদ বলল, এরা আমাকে সুযোগ থেকে বাঞ্চিত করেছে। আমাকে, আমাকে জীবনের সবচেয়ে বৃহত্তম প্রাপ্য থেকে ওরা বঞ্চিত করেছে। ওদের ক্ষমা নেই।

এবার অকিবৎ বলল, আমিও সেটা সন্দেহ করেছিলাম। ইন্‌তিজাম আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না।

ইমাদ প্রশ্ন করল, কিন্তু কেন, বলতে পার ?

আকিবৎ বলল, আমার মনে হয় ইন্‌তিজাম আপনাকে ভয় পায়। ভাবছে যদি যুদ্ধ জয়ী হন, আপনাকে বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। আপনিই তখন হিন্দুস্থানের হর্তা কর্তা ভাগ্য বিধাতা হবেন।

ইমাদ সক্রোধে বলল, যুদ্ধে জয়ী না হলেও ইন্‌তিজামের কোন ক্ষতি নেই। সে তুরাণীদের কলঙ্ক। কাপুরুষ। ওকে উজির থাকতে দেওয়া চলবে না।

অকিবৎ বলল, আমারও তাই মত। আপনি প্রকাশ্যেই বাদশার কাছে উজির পদ দাবী করুন। সমস্ত তুরাণী দল এখন আপনার পক্ষে। তারা আপনাকেই তাদের নেতা বলে গ্রহণ করেছে।

—সত্যি !

সত্যি।

বেশ তবে তুমি আমার উজির পদের দাবী নিয়ে বাদশার দরবারে যাও। বল ইমাদ উজির হতে চায়। যদি তিনি রাজি না হন, তবে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

বাদশা লাল কেল্লায় হারেমে ছিলেন। সেখানেই অকিবৎ খাঁ তার দাবী পেশ করলেন।

বাদশা জননী উধম বাঈয়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন আহমদ শা। বাঁদী এসে খবর দিল, জাঁহাপনা অকিবৎ খাঁ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বাদশা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

উধম বাঈও আশ্চর্য্য হলেন। বেগম মহলে কেউ বাদশার খোঁজ করবার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারে, তিনি এই জীবনে প্রথম দেখলেন।

বাদশা প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, দুষমনকে এখানে আসতে দিয়েছে কে ?

কিন্তু তাঁকে থামালেন উধম বাঈ। তিনি চতুরা। রাজনীতির প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। বললেন, আহমদ তুমি যাও।

—সেকি!

হ্যাঁ। প্রয়োজন হলে বেগম মহলেও লোকের সঙ্গে দেখা করে।

—কিন্তু।

—কিন্তু নেই। ইমাদকে তুমি চেন না। অকিবৎ তারই বন্ধু। নিশ্চই ইমাদ তাকে পাঠিয়েছে। গুরুতর ব্যাপার। তুমি যাও। কিম্বা তোমাকে যেতে হবে না।

বাঁদীকে তিনি বললেন, যাও, অকিবৎকে এখানে নিয়ে এস।

বাঁদী তৎক্ষণাৎ অকিবৎ মহম্মকে সঙ্গে নিয়ে বেগম মহলে উধম বাঈয়ের কক্ষে এল।

উধম বাঈ তোয়াজের ভঙ্গীতে অকিবৎকে অভ্যর্থনা জানালেন,

—এই যে খাঁ সাহেব আসুন, খবর কি?

অকিবৎ ইমাদের পত্র বের করে দিল উধম বাঈয়ের হাতে।

পত্র পড়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করতে গিয়েও থেমে গিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে আনলেন উধম বাঈ। বললেন, সেতো, ভাল কথা।

ইমাদকে বলবেন, তার প্রস্তাব আমরা সানন্দে গ্রহণ করে নিলাম।

অকিবৎ চলে গেলে উধম তাকালেন আহমদের দিকে। আহমদ প্রশ্ন করলেন, কি?

—ইমাদ উজির হতে চায়।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—তুমি তাতে মত দিলে?

—উপায় নেই। ইন্‌তিজাম তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদি বাদশাহী রাখতে হয় তবে ইমাদকে গ্রহণ করতেই হবে।

বাদশা চুপ করে থাকলেন।

উধম বাঈ বললেন, শুধু এই নয়। ইমাদকে শান্ত করতে হবে। তুমি তাকে হারেমে ডেকে নিয়ে এস।

ভীত আহামদ শীঘ্রই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন হারেমে। ২রা জুন। ইমাদ হারেমে এলে, উধম বাঈয়ের পরামর্শ অনুযায়ী বাদশা তাকে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, ইমাদ তুমিই আমার রক্ষা কর্তা। তুমি কথা দাও, তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে না?

ইমাদের বুকের মধ্যে তখন প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। সে কোন কথা বলল না।

বাদশা কোরাণ আনিয়ে তাকে দিয়ে স্পর্শ করালেন। কাতর ভাবে অনুরোধ করলেন, বল, তুমি আমার বিরুদ্ধে যাবে না? তুমি আমকে রক্ষা করবে?

একটা সাপের দৃষ্টি দিয়ে ইমাদ বাদশাকে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর বলল, আচ্ছা কথা দিলুম।

কিন্তু মনে মনে সেই মুহূর্তে কি কথা দিল তা ইমাদই জানে।

বরাবর সে চলে এল মির বক্‌সীর ঘরে, ডাকল অকিবৎ।

—বলুন জনাব।

তোমার দেহরক্ষীরা প্রস্তুত?

—আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য প্রস্তুত জনাব।

ইমাদ তখন মির বক্‌সীর সীল দিয়ে পত্র লিখে পাঠাল বন্দী শাহজাদাদের মহলে। বলল, যাও মুইজুদ্দিনের পুত্র, মহম্মদ আজিজুদ্দিনকে আমার সালাম জানাও। বলবে দেওয়ানী আমে আমি তাঁকে সালাম জানাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

প্রতিশোধের আগুন বড় ভয়ানক। যার বুকে জ্বলবে সে শত্রুকে গ্রাস না করে খান্ত হবে না। যদি না পারে, নিজে জ্বলে পুড়ে শেষ হবে। ইমাদের ক্রোধের আগুন আহমদ শাহকে স্পর্শ করল।

বন্দী শাহজাদা আজিজুদ্দিনকে নিয়ে আসা হোল দেওয়ানী আমে। তরুণ ইমাদ তাকে সালাম জানাল। কুর্নীস জানাল ভূমি স্পর্শ করে।

হতবাক আজিজুউদ্দিন শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

ইমাদ বলল, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন বাদশা।

—বাদশা!

—হ্যাঁ। বাদশা গাজি আলমগীর।

সঙ্গে সঙ্গে আজিজুদ্দিনের মাথার উপর ছত্র তুলে ধরা হল। ইমাদের অনুচরেরা দিল্লীর বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল: বাদশা আলমগীর জিন্দাবাদ।

ইমাদ ভেট রাখল নতুন বাদশার পায়ের কাছে। বলল,—জাঁহাপনা, আপনি আদেশ দিন।

হতবুদ্ধি আলমগীর শুধু ইমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দরখাস্ত তৈরীই ছিল। ইমাদ তুলে ধরে বলল, সই করুন।

নতুন বাদশা সই দিলেন। নতুন বাদশাহী পরোয়ানা ইমাদ অকিবতের হাতে তুলে দিয়ে বলল, যাও, আহমদ আর উধমবাঈকে বন্দী কর। বন্দী করবার সময় বলবে—নিমকহারামির পুরস্কার।

ভূমি স্পর্শ করে ইমাদ আবার কুর্নীস জানাল নতুন বাদশাকে। বলল, আর একটি কাজ করতে হবে খোদাবন্দ।

—বলুন।

আর একটি পত্র বাড়িয়ে ধরে ইমাদ বলল, মেহেরবানি করে সই করুন।

বাদশা দস্তখত দিলেন।

ইমাদ অকিবৎকে বললেন, এ পত্র অযোধ্যায় পাঠিয়ে দাও। আলিকুলিকে—মির তুজুক থেকে তার পদবী হল খানই—জামান।

অকিবৎ কুর্নীস জানাল বাদশাকে। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ইমাদের মুখে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা আবার বেদনা ক্লিষ্ট হল। কি ভেবে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

॥ পঁচিশ ॥

অপরাহ্নে একাকি দাড়িয়ে দেখতে লাগল গান্না।

সেই একই প্রাসাদ। বহুদিন পূর্বে ছোট বেলায় সে এখানে এসেছিল। পুরানো জায়গায় এসে সে কথা যেন আবার তার মনে পড়ছে। সেই তেমনি সবুজ নিবিড় ঘাসের আস্তরণী সেই তেমনি দুটো বড় বড় ময়ূর কুঞ্জের পাশে আজো ঘুরে বেড়চ্ছে। মনে পড়ে, এখানে দাড়িয়েই সুজা তাকে সব কিছুর পরিচয় দিয়েছিল। সেই সুজা—

কিন্তু সে সুজার সঙ্গে আজকের সুজার যেন কোন মিল নেই। সে দিন যে সুজা ছিল বড় লাবণ্যময়য় নিষ্পাপ আর সুন্দর। কিন্তু আজ। আজকের সুজা বলিষ্ঠ, সুন্দর, ততটা লাবণ্য নেই। চোখের দৃষ্টিতে আজকে যেন অন্য প্রশ্ন। মনে মনে হাসি পেল গান্নার, সেই গান্নাও কি তেমনি আছে? সে দিন সে প্রজাপতির পিছনে ছুটে বেড়িয়ে ছিল আর একটি প্রজাপতির মতই। কিন্তু আজ। সেই বাগিচা আর সেই পরিবেশ তো তেমনিই রয়েছে—কিন্তু তার চরণে সে চাঞ্চল্য আর নেই।

ভাবতে ইচ্ছে করে সেই হারাণো দিনের কথা। তার কেবল বুদ্ধি স্ফুরণ হয়েছে। দারা সুকোহর প্রাসাদ থেকে কতবার তাদের বাসায় গিয়েছে সুজা। কতবার সুজাদের বাসায়ও গিয়েছে গান্না। কতবার সে সেই শিশু গান্নার কণ্ঠে আলিকুলির লেখা গজল শুনেছে।

মনে পড়ে মা বাবার চোখে সুজাকে নিয়ে সেই স্বপ্নের জাল বুনন। ছোট ছিল বলে সে কি অন্য কিছুই বুঝত না? সে নিজেও কি কতবার ভাবেনি মনে মনে কোন কথা? তারপর? সেই উৎসব মিছিলের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সবাই তারা গিয়েছিল বাইরে সেই আলোক, আতজ বাজি আর উন্মত্ত আনন্দ দেখতে। তারপর? যখন আম্মা

আর আব্বাজান জানতে পারলেন যে সেদিন সুজাউদ্দৌলার সাদির মিছিল! সে কথাও মনে পড়ে। যেন একটা বিরাট আঘাতে ভেঙে পড়েছিলেন আম্মা। মনে পড়ে দ্রুত তিনি জেনানা মহলে ফিরে এসে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কেঁদে ছিলেনও তিনি। কেন? সেকথা গান্নাও কি তখন বোঝেনি। আর গান্নার কি মনে হয়েছিল?....অনেক দিনের কথা, মনে পড়তে যেন সেদিনের মনে হয়। গান্না দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আবার শিহাবের কথাও মনে পড়ে। শিহাব সুন্দর। লাবণ্যময়। শিক্ষিত। বীর। তাকেও তো গান্না দেখেছে। তার কাতর দুটো চোখওতো গান্না স্মরণ করতে পারে। কিন্তু হঠাৎ আজকে সুজাকে দেখে সেই কাতর দুটো চোখের প্রার্থনা তার কাছে তেমন আবেদন পূর্ণ মনে হয় না কেন? সুজাকে দেখবার পর থেকে কেন তার চিন্তা আজ মনকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। সুজা বিবাহিত, শিহাব অবিবাহিত। সুজার চেয়ে অনেক বড় পদে রয়েছে শিহাব। সে আজ হিন্দুস্থানের ভাগ্য বিধাতা। সে উজির। তবু তবু........।

কি জানি, কি এর রহস্য! শৈশবে মনে যে ছাপ পড়ে তা বুঝি ন্যায় অন্যায় বিচার করতে পারে না। জীবনে প্রথম কল্পনার মানুষ বুঝি শেষ কল্পনার। না হলে অনেক দিনের হারাণো সুজাকে নিয়ে আজ এমন পাগল কল্পনা গান্নার মন জুড়ে উঠবে কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নিজের মনের কাছেই, গান্না আজ নিজে অসহায়। মন থেকে সরাতে চেয়েও এ চিন্তা সে দূর করতে পারছে না।

শুধু গান্নার নয়। সুজার ক্ষেত্রেও সেই প্রশ্ন। বহুদিন পরে গান্নাকে সে আবার দেখল। দেখেই আজ সে উন্মদ হয়েছে প্রায়। কেন? গান্না কি তবে তার অবচেতন মনে সম্রাজ্ঞীর আসন নিয়ে বসে ছিল? প্রথম যৌবনে যাকে সে ভালবেসেছিল অথচ রাজনৈতিক ঘূর্ণীবাত্যার জন্য যাকে জোরকরে ভুলতে হয়েছে তাকে প্রকৃত ভোলা যায়না। প্রথম প্রেম চির মধুর। অমর। ভোলা যায় না। ভুলতে পারে না। ভুললেও অবচেতন মনে থেকে যায়। উপযুক্ত

মুহূর্তে আবার সে জেগে উঠে। জেগে উঠে সেই তীব্রতা নিয়েই। প্রেমিককে সে আবার উন্মাদ করে দেয়। সুজারও তাই হয়েছে। গান্নাকে দেখে অবদমিত আকাংখা আবার পাগল হয়ে জেগে উঠেছে। বাহু বেগম সুন্দরী। বিদুষী। গুণবতী। কিন্তু তার আকর্ষণও সুজাকে বেঁধে রাখতে পারল না জোয়ারের টানে গঙ্গার মতই দুলে উঠে ছড়িয়ে পড়ল সে। তাই সুজাকে আবার আসতে হল। পৌঁছে দিয়েই হল না। আবার আসতে হল।

বাগিচায় এসে সে দেখল গান্না আত্মচিন্তায় বিভোর। উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে। নিঃশব্দে সে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

অনেক্ষণ গান্না জানতে পারল না যে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ একবার পেছনে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠল। লজ্জা পেল। কি করবে ভেবে পেলনা। মনে হল চলে যায়। কিন্তু পা চলল না। সুজা বলল, অপ্রস্তুত করলাম ?

এবার কথা বলতে হল গান্নাকে, না না। আরক্তিম হয়ে উঠল সে।

সুজা প্রশ্ন করল, আমাকে চিনতে পেরেছ ?

—কেন পারব না ?

কিছুক্ষণ সুজা চুপ করে থাকল। হঠাৎ বুঝতে পারল, যে কথাগুলো সে মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা যেন সব হারিয়ে গেছে। একটু চেষ্টা করে নতুন কথা সংগ্রহ করল, বলল, ছোট বেলায় এখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মনে পড়ে ?

ঘাড় কাৎ করে হ্যাঁ জ্ঞাপক ভঙ্গী করল গান্না।

—দিল্লার কথা মনে পড়ে ? সেই দারা সুকোহর প্রাসাদের কথা ?

হ্যাঁ........

আবার চুপ করল সুজা। আর কি বলবে ? আবার ভেবে বলল, আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে না ?

মাথা নীচু করেই গান্না বলল, কিছু কিছু।

হঠাৎ যেন একটা কথা পেয়ে গেল সুজা। মুহূর্তের উপযুক্ত কথা। বলল, তোমার ও কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

গান্নার বুকটা কেঁপে উঠল। কোন কথা বলল না প্রথম। তারপর সুজাকে নীরব দেখে বলল, কি রকম পারিবর্তন ?

সুজার সমস্ত মুখ চোখ রক্তিম হয়ে উঠল। যা সে বলতে চায় তা বলতে তো ?—

গলাটা একটু কেঁপে গেল তার, তবু বলল, তুমি, তুমি অনেক বদলে গেছ। অনেক, অনেক সুন্দর হয়েছ। আর বলতে পারল না সুজা। আবেগে তার বুকটা কাঁপতে লাগল! গান্নারও কেন কি জানি বুকের মধ্যে রক্ত লাফাতে লাগল। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। অনেকক্ষণ আর কেউ কথা বলতে পারল না। এভাবে নীরবে দাড়িয়ে থাকাও অশোভন, তাই গান্না ওপাশে একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বলল, ওখানে আব্বাজান রয়েছেন।

ইঙ্গিত বুঝতে বিলম্ব হলনা সুজার। বলল, আচ্ছা আমি যাচ্ছি। সে আলিকুলির ঘরের দিকে দুপা এগিয়ে গেল। ওদিকে গান্নাও জেনানা মহলের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। হঠাৎ সুজা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, শোন।

গান্না দাড়াল।

সুজা দুপা কাছে সরে এসে বলল, এখানে এলে তোমার দেখা পাব তো ?

কি বলবে গান্না! তার কানের ডগা দুটো পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। অবশেষে অজ্ঞান অবস্থাতেই সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়ল। সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা আনন্দ বিচ্ছুরণ অনুভব করল সুজা। গান্না দ্রুত পদে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পর মহলের এক নীরব জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। মনের মধ্যে তক্ষুণি একটা প্রশ্ন জট পাকিয়ে তাকে ব্যস্ত করে তুলল। কি করলাম সুজা যে বিবাহিত।

॥ ছাব্বিশ ॥

হিন্দুরা বলে জন্মান্তর। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতি সুকৃতি মানুষের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করে। মুসলমানরা পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে না। কিন্তু ভাগ্য বিশ্বাস করে। কিন্তু ভাগ্য সম্বন্ধে আরো একটি ব্যাখ্যা আছে হিন্দুদের। সে হল গ্রহ বৈগুণ্য। এমন কি মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই গ্রহের প্রভাবেই ভাগ্য। যদি গ্রহ অনুকুল থাকে মানুষ কর্ম না করেও ফল পায়। কিন্তু গ্রহ বিরূপ হলে শত চেষ্টাতেও শুধু ভাগ্য বিপর্য্যয় ব্যতীত আর কিছুই আনতে পারে না। গান্না মুসলমানের মেয়ে পূর্ব জন্ম নেই। কিন্তু গ্রহ হয়তো আছে। সেই গ্রহের প্রভাবে পড়েছে সে। নইলে এমন হবে কেন। সাগর লঙ্ঘন করে সে গোষ্পদে সে ডুববে কেন? আর আব্বাজান আম্মা কত কত কল্পনা করেছে এক মাত্র কন্যার জীবন নিয়ে। বহু বেগমের ঘর করবে না গান্না। শাহাজাদার মত মর্য্যাদা সম্পন্ন পুত্রের সঙ্গে সাদি হবে তার। কিন্তু এ তবে গান্নার জীবনে কি হতে চলেছে! হঠাৎ সুজা তার জীবনে খড়ির দাগ কেটে বসতে চাইছে কেন? গান্নার বয়স খুব বেশী না হলেও বুদ্ধিতে খুব ছোট সে নয়। বিচার শক্তি তার আছে। সেই বিচারই একদিন তাকে গোপন পথে শিহাবুদ্দিনের প্রথম প্রত্যাখ্যানে সাহায্য করেছে। আজ সমস্ত কিছু জানা সত্বেও বিচার বুদ্ধি তাকে সাহায্য করতে পারছেনা কেন? কেন মন তার সমস্ত নিষেধ অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে চাইছে সুজার দিকে। কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টানছে। একেই বলে নসিব। গান্নার নসিবে কি আছে কে জানে। তার কুমারী মন সুকুমার পুরুষইতো কামনা করেছে। তবু তবু কেন........।

আর ভাবতে পারেনা গান্না সেই ভাগ্যের হাত ধরেই এগিয়ে যায় সে।

সফদরের বাগিচা গান্নার জীবনের ইতিহাসে কি এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই ছোট বেলায় যে সবুজ ঘাসের আস্তরণ আর পুষ্পিত ফুলের শাখা দিয়ে তাকে অকর্ষণ করেছিল। আজ আবার উন্মত্ত যৌবনে উন্মাদনার দিয়ে গোপন হাতছানিতে সে ডাকছে। সেদিন বালক সুজা ছিল তার পাশে, আজ পুরুষ সুজা এসেছে। আল্লা কি তার সঙ্গে এক সূত্রে সুজার ভাগ্য গেঁথে দিয়েছেন ?

বাগিচায় দাড়িয়ে সে বুঝতে পারল্ যে সুজা এসেছে। আলিকুলির ঘরের দিকেই সে বুঝতে পারল। ইদানিং আলিকুলির বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েছে সুজা। তার কাব্যের বিশেষ সে উদাসাহী পাঠক। কেন, হয়তো আত্মভোলা কবি বুঝতে পারেন না, কিন্তু গান্না জানে। সুজার প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলে হয়তো তার আব্বাজান ব্যথাই পাবেন। আরো ব্যথা পাবেন যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন গান্নার গোপন মনের আকাংখা। কিন্তু হায়,—কেমন যেন উপায় নেই। মানুষের জীবনের বেদনাই এই টা নিজেকে জানতে পারে না। নিজের উপর তার হাত নেই। অপরকে শাসন করা চলে কিন্তু নিজের মনকে অপরাধী জেনেও কিছু বলা চলে না। ভয়, বিচার, যুক্তি কিছুই সে স্বীকার করিতে চায় না।

গান্না নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল।

হৃদয়ের অদৃশ্য সুর অপর হৃদয়কে যত প্রবল ভাবে টানতে পারে—কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বন্ধন তা হতে পারে না। সে মুহূর্তে গান্না এল উদ্যানে সুজার মনও চঞ্চল হয়ে উঠল। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে যেন কার নিবিড় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। যেন প্রকৃতিতে গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে কার প্রস্ফুটিত যৌবন।

সুজা আর থাকতে পারল না, উঠে পড়ল সে। ধৈর্য্য ধরতে জানে না সে ? এটাই তার বিরাট দোষ ?

আলিকুলি বললেন, একি, উঠলে ?

সুজা বলল, হ্যাঁ, দেখি, বাইরে গিয়ে একটু দাড়াই।

—আচ্ছা এসো ? আলিকুলি সুজাকে বিদায় দিলেন।

সুজা বাইরে এসে যেন মুক্তি পেল। যেন ছুটেই চলে এল সে গান্নার কাছে। বলল, তুমি এসেছ ?

মৃদু একটু হাসল গান্না, বলল, আপনি কখন এসেছেন ?

—অনেকক্ষণ। তোমার আব্বাজানের সঙ্গে গল্প করছিলাম। গান্না জিজ্ঞেস করল, আব্বাজানের কবিতা আপনার কেমন লাগে ?

হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হল সে, একটু থেমে বলল, ভাল। তোমার কবিতাও আমার ভাল লাগে।

গান্না সুজার দিকে দুচোখে তাকাল। বড় ধীর, বড় গম্ভীর দুটি চোখ, গান্নার গজলের বিষণ্ণ সুরের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে।

সে কথা মনে পড়তেই সুজা প্রশ্ন করল, আচ্ছা গান্না, (নিজের নামটা সুজার কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারিত হতে গান্না চমকে উঠল) তোমার সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে একটা বিষাদের সুর কেন ?

গান্না তেমনি গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিল, কি করে বলব বলুন। এ সমস্তই নির্ভর করে চরিত্রের উপর।

সুজা প্রশ্ন করল, কিন্তু তোমার বেদনা কিসের বল ? তোমার রূপ আছে, (গান্না কেঁপে উঠল) তোমার যৌবন আছে, তুমি তো ইচ্ছে করলেই সুখী হতে পার।

গান্না, বলল, হয় তো তা পারি না।

—কেন ?

—আল্লার পৃথিবীতে সবই তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

—কেন নয়। মানুষ সব করতে পারে।

গান্না প্রতিবাদ করল, বলল, না, সব পারে না। অদৃশ্য এক শক্তি আছে তার হাত এড়াবার উপায় নেই! সেখানে, বিচার, আচার, বল প্রয়োগ, কিছুই চলে না। নিজের খেয়ালে এগিয়ে নিয়ে যায়।

সুজা বলল, আমি বিশ্বাস করিনা, বিচার, বিশ্লেষণে সব কিছুই করা যায়।

—যায় ? গান্না তাকাল সুজার দিকে।

সুজা বলল, যায়।

এক দৃষ্টিতে গান্না কিছুকাল সুজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, অহঙ্কার করবেন না। বলুনতো আপনি নিজের মনকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে চালাতে পারেন ? স্থির করতে পারেন ?

সুজা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলল, এ প্রশ্ন কেন ?

গান্না জোর করল, বলুন না।

সুজা বলল, পারি।

—পারেন ?

—হ্যাঁ।

গান্না এবার বলল, আচ্ছা তবে বলুন তো, এখানে আপনি আসেন কেন ? আপনার মনে কি সাড়া দেয় ? একবারও কি মানা করে না ? মনের সে মানা আপনি মানতে পারেন ?

কি একটা যেন সন্দেহ করল সুজা, একটু ভেবে বলল, না, আমার মন তো এখানে আসতে মানা করেনা। বরং আসতেই বলে।

যেন স্তম্ভিত হল গান্না। এ উত্তর সে আশা করেনি। বলল, আমার কিন্তু........।

—কেন ?

—আপনি বিবাহিত তাই, বাহু বেগমের মুখখানি নিশ্চয়ই আপনার মনের মধ্যে ভেসে উঠে ?

—না ?

—না !

—হ্যাঁ। কারণ ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে তো আমি যাইনি। বহু বিবাহ ইসলাম অনুমোদন করে। আর তা ছাড়া বাহুবেগমকে তো আমি বঞ্চনা করিনি। তাকে আমি চাইনি। কিন্তু আমার জীবনের উপর তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি যাকে চেয়েছিলাম....কথা শেষ করতে দিল না গান্না, বলল, জানি। আমি তা শুনেছি কিন্তু তখনতো আমি ছোট ছিলাম।

—সুজা বলল, ভালবাসা, ছোট বড় বিচার করে না।

—কিন্তু দুটি হৃদয় বিচার না করলে ভালবাসা এক তরফা হয়ে যায় না কি ?

—জানি না। হয় তো হয়। ভালবাসা চিরকালই এক তরফা, বিচারের ক্ষমতা তার নেই। তাই সে দিনের ছোট্ট গান্নাকে আজো আমি ভুলতে পারিনি।

গান্না কথা বলতে পারল না। তার নীরব বুকের মধ্যে—শুধু কি-জানি একটা ভাব ঘুরপাক খেতে লাগল। সত্যিই, ভালবাসা একতরফা, তার বিচার চলে না। যদি চলত তবে গান্নার আজ এ অবস্থা হত না।

সুজা তাকে নীরব থাকতে দেখে বলল, একটা প্রশ্ন করব ?

—বলুন।

—তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারনি ?

গান্না বলল, সে প্রশ্নের বিচার করিনি। শুধু ভাবছি ভালবাসা উচিৎ কিনা ? মনকে সেটাই বোঝাতে পারছিনা।

সুজা বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসেছি। চিরকাল একথা জেনে রেখ।

গান্না মুখ তুলতে পারল না। ভালবাসলেও মুখে তা' স্বীকার করতে কিছুতেই যেন পারছিল না সে।

সুজা আর কথা বাড়ালনা, বলল, আচ্ছা আজ আসি। সে চলে গেল। শূন্য আসমানের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল গান্না।

গান্নাকে ক'দিন আনমনা দেখছিল বুলবুল। তাদের একমাত্র কন্যা। তার মনে এতটুকু ব্যথা, বেদনার কারণ। সে মেয়েই যে তাদের স্বপ্ন। তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে বুলবুল জীবনে। মেয়ের এতটুকু মনের বৈকল্য তাই বড় চিন্তার কারণ হয়ে উঠে বুলবুলের। কি হয়েছে গান্নার, সে ভাবতে লাগল। বয়স হয়েছে মেয়ের। মুখ ফুটে হঠাৎ কিছু বলা যায় না। অথচ না জানলেও তার

স্বস্তি ছিল না। ক'দিন ধরেই সে গান্নার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিল। আজো সে দেখছিল। গান্নার পাশে সুজাকে দেখে ভাল লাগল না তার। একদিন সুজাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সে দিন আর আজ নেই। যে সুজাকে চেয়েছিল, সেত নেই। আজ আর ও প্রশ্ন মনে স্থানও পাবার যোগ্য নয়। সুজার জীবন আর গান্নার জীবন আজ ভিন্ন পথে চলে গেছে।

সুজা চলে গেলে তাই কন্যার পাশে উদ্যানে চলে এলো।

গান্না কেমন যেন ধ্যানস্থ হয়ে আছে।

বুলবুল কন্যার দেহে হাত রেখে ডাকল, গান্না।

গান্না চেতনার মধ্যেই ছিল। শুধু স্থবির বেদনাতে মুক হয়ে ছিল সে। মায়ের ডাকে সাড়া দিল....আম্মা।

—কি হয়েছে তোর?

গান্না কথা বলল না।

—একটা কথা বলব?

—বল?

—সুজার সঙ্গে না মিশলে হয় না?

নির্বিকার গান্না উত্তর দিল, মিশব না আম্মা।

বুলবুল গান্নাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

॥ সাতাশ ॥

দিল্লী থেকে ফিরে এসে শুধু মাত্র কর্মজীবনই নয়, জীবনের মেয়াদও শেষ হয়ে এসেছিল সফদর জঙ্গের। আর তিনি বড় একটা বের হননি। আর জীবনের আনন্দে যোগদান করেন নি। মাঝে মাঝে তিনি আলিকুলির ওখানে বেড়াতে যেতেন। গান্নাকে তিনি অসীম স্নেহ দিয়ে ফেলে ছিলেন তাই না দেখে থাকতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত তাও আর যেতেন না। যেতে পারতেন না। বাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। শয্যা গ্রহণ করলেন সফদর জঙ্গ। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হল।

খবর চারিদিকে রটল। ইরাণীরা চিন্তিত হল। খবর পেলেন আলিকুলিও।

সে দিন অপরাহ্নে যথারীতি তিনি কাব্যচর্চা করছিলেন। হঠাৎ বান্দা এসে জরুরী খবর দিল। বেগম সাহেবা তাঁকে তলব করেছেন। সফদর জঙ্গের অবস্থা ভয়ানক খারাপ। গান্নাকে তিনি শেষ দেখা দেখতে চাইছেন। আলিকুলি যেন সংবাদ পাওয়া মাত্র চলে আসে। জীবনে সফদর জঙ্গের চেয়ে বড় মিত্র তাঁর নেই। সংবাদ পেয়ে আলিকুলি পাগলের মত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বুলবুল আর গান্নাকে নিয়ে নবাব প্রাসাদে এলেন।

সত্যি, সফদর জঙ্গ শেষ অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর পাশে আত্মীয় স্বজনের ভীড়। বেগম সাহেবা শিয়রে বসে আছেন। আলিকুলি এসে সফদর জঙ্গের পায়ের কাছে দাঁড়ালেন। সফদর জঙ্গ ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকলেন। আলিকুলি এগিয়ে এলে তাঁর হাত স্পর্শ করলেন বৃদ্ধ। বললেন, চললুম ভাই।

আলিকুলির দুচোখে জল এল।

সফদর জঙ্গ এদিক ওদিক তাকিয়ে কি দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর বৃদ্ধ বললেন—আম্মা, আম্মা কোথায় ?

বেগম সাহেবা গান্নাকে বৃদ্ধের হাতের কাছে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পাশে সিক্ত নয়নে, বাহু বেগম, বুলবুল, সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। গান্না সফদর জঙ্গের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে হু, হু করে কেঁদে ফেলল।

সফদর জঙ্গ তার হাত ধরে বললেন, কাঁদিসনি আম্মা ! মানুষ তো চির কাল বেঁচে থাকে না।

একথা শুনে গান্না আরো কাঁদতে লাগল। আজন্ম সে সফদর জঙ্গের স্নেহ পেয়েছে। বৃদ্ধ তার পিতারও অধিক।

সফদর জঙ্গ তখন সুজাকে কাছে ডাকলেন। সুজা কাছে এলে বললেন, শোন। আমার অবর্তমানে আলিকুলির পরিবারকে তুমি দেখ। এরা আমার বড় প্রিয়। এদের যেন কখনো কষ্ট না হয়।

সুজা বলল, আমি আল্লার নামে শপথ করছি, এদের যথা সাধ্য রক্ষা করব।

সফদর জঙ্গ এবার আলিকুলির মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, —আলি, বড় সখ ছিল, নিজে আম্মার সাদি দেব। কিন্তু সময় আর পেলাম না ....।

সফদর জঙ্গ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আলিকুলি আবেগের মাথায় এক কাজ করে বসলেন, খাঁ সাহেবকে স্পর্শ করে বললেন, জনাব গান্নাকে আপনি একদিন মনে মনে চেয়েছিলেন, তা আমি জানি। তাই গান্নাকে চিরকাল কাছে কাছে রেখেছেন। আপনার সে আশা অপূর্ণ থাকবে না। আমি কথা দিচ্ছি যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে গান্না আপনার পুত্র বধু হবে।' সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলের মুখখানা অন্ধকারাছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু হাসি ফুটল মুমূর্ষু সফদর জঙ্গের মুখে। বললেন, আমার আবার অনুমতি কি। ওকে যে আমি গ্রহণ করেই রেখেছি। তোমার যদি ইচ্ছা তো হয় তাই কোরো। তবে এক্ষুণি নয়, আরো কিছুদিন বিচার কর।

আলিকুলি বললেন, না জনাব, বিচার করবার কিছুই নেই। সফদর জঙ্গ বললেন, বেশ তো, না হয় তাই হল। তাই বলে ব্যস্ত হবার কিছু নেই। তোমার কথা মানেই কাজ, এ আমি জেনে গেলাম।

আলিকুলি আর কথা বললেন না।

সফদর জঙ্গ তাঁকে ডাকলেন—আলি।

—বলুন।

—আমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

—ফরমাস করুন।

ক্লান্ত বৃদ্ধ বললেন, আমার ইচ্ছা দিল্লীর সঙ্গে গোলমাল মিটে যাক। আমি সেই উদ্দেশ্যে একটা পত্র লিখেছি ইমাদের কাছে। তুমি আজো ইমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। দয়া করে একবার দিল্লী যাবে তুমি ?

—আপনার ফরমাসই আমার যথেষ্ট জনাব।

—বেশ, তবে তুমি অল্প দিনের মধ্যেই দিল্লা গিয়ে কাজটা করে আসবে।

আলিকুলি কথা দিলেন, তিনি শীঘ্রই দিল্লী যাবেন।

সফদর জঙ্গ একটু নিশ্চিন্ত হলেন।

এমন সময় হেকিম সকলকে বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, বেশী কথা বলা ওর পক্ষে ক্ষতি হবে।

সফদর জঙ্গ শুধু একটু ম্লান হাসলেন। কথা বললেন না। এক মাত্র বেগম সাহেবা ব্যতীত সবাই একে একে গৃহ ত্যাগ করলেন।

॥ আটাশ ॥

রোগ শয্যা ছেড়ে সফদর জঙ্গ আর উঠলেন না। আত্মীয় পরিজনকে কাঁদিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। কিছুদিন লক্ষ্ণৌর উপর শোকের ছায়া নেমে থাকল। শোকের প্রথম অধ্যায় শেষ হলে বুলবুল একদিন স্বামীকে বলল, এবার চল দিল্লী।

লক্ষ্ণৌ আর তার ভাল লাগছিল না। আলিকুলি কি কুক্ষণে কথা দিয়ে ফেললেন তার জন্যও তার মন ভাল নেই। তার মন যেন বলছিল, না, না, এ সাদি শুভ হবে না। তবু অস্বীকার করবার উপায়ও ছিল না। অস্বীকার করে লাভও ছিল না, কারণ সে জানত আলি-কুলির জীবন থাকতে তাঁর কথার খেলাপ হবে না। কিন্তু তার একমাত্র কন্যা গান্নার অদৃষ্টে এই ছিল তা কে জানত। নানা কারণে তাই অযোধ্যা আর ভাল লাগছেনা তার। বিশেষ করে সুজার কাছ থেকে কয় দিন দূরে থাকলে যেন স্বস্তি পায় সে। সুজা তার অনেক ব্যথার কারণ হয়েছে। প্রথমে তার নতুন স্বপ্নকে ব্যর্থ করেছে সুজা। শনি গ্রহের মত আর এক স্বপ্নকেও নাশ করতে চলেছে সে। তাই কিছুদিন দূরে যেতে চায় সে।

তার কথা শুনে আলিকুলি বললেন, দাঁড়াও, আর কয়টা দিন পরে যাব।

—কেন ?

—এই মুহূর্তে সুজাকে ছেড়ে যাওয়া কি ভাল দেখাবে ?

—তোমাকে অত ভাবতে হবে না, তুমি চল।

আলিকুলি বললেন, কিন্তু গান্নার সাদিটা সেরে গেলেই ভাল হত না ?

বুলবুল স্পষ্ট করে বলেছিল, না জানতো তা'তে সু ফলের চেয়ে

উল্টো ফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং কৌশলের সাহায্য নিতে চাইল। তাড়াতাড়ি দিল্লী যাওয়াই যে আলিকুলির প্রয়োজন একমাত্র তাই বোঝাতে চাইল।

বলল খাঁ সাহেব যে তোমাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটা দ্রুত করাই তোমার উচিৎ নয় কি?

আলিকুলি বললেন, সেত নিশ্চয়ই। তবে আমি ভেবেছিলাম গান্নার সাদিটা····

বুলবুল বলল, সেটা পরে সারলেও তেমন কোরাণ অসুদ্ধি হবে না। কিন্তু সময় মত খাঁ সাহেবের চিঠিটা দিল্লীতে পৌঁছে দিতে না পারলে ক্ষতি হতে পারে।

আলিকুলি যেন বুঝলেন। বললেন, বেশ চল, দিল্লী থেকে ঘুরেই আসি।

বুলবুলের মুখে হাসি ফুটল।

আলিকুলি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বেগম সাহেবার সঙ্গে দেখা করে বললেন, অনুমতি দিন আমি দিল্লী যাব।

—এখনি ?

—হ্যাঁ, না হলে কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

বেগম সাহেবা বললেন, আসুন তবে।

আলিকুলি জানালেন, আমি অল্প দিনের মধ্যেই ফিরে আসব, এসেই গান্নাকে আপনার পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে মুক্ত হব। বেগম সাহেবা একটু ম্লান হেসে বললেন, আচ্ছা।

নির্দিষ্ট দিনে অযোধ্যার দৌত্য নিয়ে আলিকুলি দিল্লী যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সুজা এল শেষ বিদায় দিতে। সেই বাগিচায় গান্নার সঙ্গে নীরবে দেখা করল সে।

শেষ বিদায়ের আগে গান্না বাগিচায় এসেছিল। কেন, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সেও দিতে পারবে না। মনের গোপনে কারো জন্য আকাংখা ছিল কি? জানি না, তবে, এই উদ্যানকে সে মমতা ভরা দৃষ্টি দিয়ে

শেষ বার দেখে নিচ্ছিল। কে জানে, আবার কোন দিন দেখা হবে কি না। একবার ছোট বেলায় এসে ছিল, আবার আসতে হবে, কে জানতো। এবার যাচ্ছে, ফিরে আসবে বলে, কিন্তু আবার ফিরে আসতে পারবে কিনা কে জানে। মানুষের আকাংখা আর প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে তার অদৃষ্ট লেখা। সে লিপি উদ্ধার করা বড় কঠিন। তবে এ কথা ঠিক, গান্না কোনদিন অযোধ্যার এই উদ্যানকে ভুলবে না। কোন দিন দিল্লার সেই দারা সুকোহর প্রাসাদকেও না। মনে মনে বিদায় চাইল উদ্যানের তৃণ লতা গুল্মের কাছে—বিদায়। যদি ভাগ্যে থাকে আবার দেখা হবে। ভুলব না তোমাদের কোন দিন।

বিদায় নিয়ে ফিরে যাবে সে, দেখতে পেল পেছনে সুজা দাঁড়িয়ে।

সে ডাকল : গান্না।

—বলুন।

—কথা দাও আবার আসবে।

—কথা দেবার মালিক আল্লা।

—তবে তুমি কথা দাও।

ম্লান হাসল একটু গান্না বলল, চেষ্টা করব।

সুজা একটি আবেদনের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল গান্নার দিকে। গান্না সে চোখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি মাথা নীচু করে মাটীর দিকে তাকাল।

॥ উনত্রিশ ॥

দিল্লী আসবার কালে আলিকুলির মনে প্রশ্ন ছিল তবু।

তিনি ছিলেন সফদর জঙ্গের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন। যে ইমাদ ইরাণীদের এতটা ঘৃণা করে আলিকুলিকে ক্ষমা করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে বলেই মনে হয়। সেই ইমাদ তবু তাকে শ্রদ্ধা করে, এটা যেন সহজে মন বিশ্বাস করতে চায় না। সুতরাং অযোধ্যা ত্যাগ করবার পূর্বে আর একবার ভাবতে চাইলেন। বুলবুল বেগমকে বললেন, যা বল, তাই বল, আমার মন যেন সায় দিচ্ছেনা।

—কেন ?

—ইমাদ আমাকেই হঠাৎ ক্ষমা করবে কেন, সেটা বুঝতে পাচ্ছি না।

বুলবুল বলল, কিন্তু সন্দেহ কেন বলতো ?

—আমি যে খাঁ সাহেব সফদর জঙ্গের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। ইমাদ সবাইকে শাস্তি দিয়েছে।

—তাইতো আরো প্রমাণ করছি, সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। অধিকাংশ ইরাণীদের যখন সে শাস্তি দিয়েছে, তখন তোমাকে উল্টো ব্যবহার সে দেখাবে কেন বল ? শাস্তির পরিবর্তে, একেবারে পুরস্কার। মির তুজুক থেকে খাঁন-ই জামান। কেন বল ? নিশ্চয়ই শত্রুতা করবার হলে এত সম্মান তোমাকে দেখাত না।

আলিকুলি বললেন, সেইটাই তো বুঝতে পাচ্ছিনা। তাই ভয় হচ্ছে কি হবে, কে জানে। যদি দিল্লী গিয়ে আর ফিরতে না পারি ?

বুলবুল বোঝাতে চাইল, দিল্লীতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না দেখে নিও। স্বয়ং বাদশা আলমগীর আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আলিকুলি বললেন, আল্লা জানেন।

অবশেষে দিল্লী যেতেই হল আলিকুলিকে। কিন্তু যাবার ইচ্ছা ছিলনা। সফদর জঙ্গ যেন তাঁর আজীবন সঙ্গীর মত ছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে অযোধ্যায় ফেলে যেতে কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না আলিকুলির মন। তবু যেতে হল।

আলিকুলি দিল্লী আসছেন এ সংবাদ পেল ইমাদ বেশ কিছুক্ষণ পর। অস্ত্রের আঘাত তার মিলিয়ে গেছে কিন্তু অন্তরের আঘাত যায়নি। তার তরুণ বক্ষে গান্না যে আঘাত করেছে তা অসহ্য। বিষ দিয়ে যেমন বিষক্ষয় হয়, বৃশ্চিক দংশনে, যেমন গোটা বৃশ্চিকটাকে থেঁতলে দংশিত স্থানে মালিশ করে যন্ত্রণা নাশ করবার চেষ্টা করে আহত ব্যক্তিরা, ইমাদের তেমনি হয়েছিল।

যে দংশন গান্না তাকে করেছে, তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে না পারলে শান্তি তার ছিল না। এ যন্ত্রণার একমাত্র প্রলেপ গান্না নিজেই।

তাই আলিকুলির খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল ইমাদ।

অকিবৎ মহম্মদকে প্রশ্ন করল ইমাদ সত্যি ?

—হ্যাঁ, সত্যি।

আর কে, কে আসছেন ?

ইমাদ জানতে চায় তার আকাংখিত গান্নাও আছে কি না।

অকিবৎ বলল, বেগম বুলবুল, আর গান্না দুজনেই আসছেন।

হঠাৎ আলোর পরশে যেন ঝলমল করে উঠল ইমাদের চোখ দুটো। সে বলল, অকিবৎ দেখো, তাঁদের জন্য কোন প্রকার অভ্যর্থনার ত্রুটি যেন না হয়।

—দেখব জনাব।

—তাদের দারা স্থকোহর প্রসাদে নিয়ে গিয়েই উঠাবে।

—আচ্ছা জনাব।

—যাও, তুমি এগিয়ে যাও, পথেই তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবে।

অকিবৎ তাকে আশ্বাস দিল, জনাবের ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ করা হবে।

দিল্লী এসে পৌছোলেন, অলিকুলি।

অভ্যর্থনার কোন রকম ত্রুটি হল না। অকিবৎ মহম্মদ পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাল। অশ্চর্য্য হলেন আলিকুলি। ইমাদ যে তাকে সত্যি সত্যি এতটা সম্মান দেখাবে এটা তিনি দীর্ঘ পথে একবারও কল্পনা করতে পারেন নি।

অকিবৎ তাঁকে বলল, জনাব, ইমাদ-উল-মুল্কের ব্যবস্থা অনুযায়ী দারা সুকোহর প্রাসাদে উঠতে হবে আপনাদের।

আলিকুলি বললেন, আমি সামান্য মানুষ, এ ব্যবস্থা আমার জন্য কেন?

আকিবৎ বলল, জানি না। কিন্তু উজির ইমাদ-উল-মুলক আপনাকে যত পেয়ার করেন, সমস্ত হিন্দুস্থানে এত পেয়ার বুঝি আর আর কাউকে করেন না।

—কিন্তু কেন, বলতো।

অকিবৎ বলল, তিনি নিজে শিক্ষিত। সম্ভবতঃ আপনার পাণ্ডিত্য, অপনার কবিত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে।

নরম হলেন আলিকুলি। দুর্বল স্থানে তাঁর ঘা পড়ল। তৎক্ষণাৎ ইমাদের উপর একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত স্নেহ গিয়ে পড়ল তাঁর, বললেন, উজির সাহেবকে আমার সালাম জা'নিও। বো'ল আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

অকিবৎ বলল, উজির সাহেব নিজেই এসে আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ করবেন। তিনি বিশেষ, ব্যস্ত কাজেই আসতে পারেন নি। তার জন্য তিনি গোস্তাকি মাপ করতে বলেছেন।

অলিকুলি সম্পূর্ণ অভিভূত হলেন, তিনি আর কথা বলতে পারলেন না।

দারা সুকোহর প্রাসাদে তাঁদের পৌছে দিয়ে অকিবৎ বিদায় নিল। বলল, আপনাদের জন্য সব ব্যবস্থা ঠিক আছে, আপনারা যান।

সালাম। সালাম জানিয়ে বিদায় দিলেন আলিকুলি অকিবৎকে। তিনি সপরিবারে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

ভেস্তয়ে প্রবেশ করে বোরাখা থেকে মুক্তি নিল, বুলবুল আর গান্না। সকলেই তাকিয়ে দেখল, বহু পরিচিত স্থান। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এ প্রাসাদে আবার কোন দিন ফিরে আসা যাবে, কল্পনা করতে পেরেছিল কি তারা ?

বুলবুল আলিকুলির দিকে তাকাল।

আলিকুলি বললেন, না, সত্যি ইমাদ আন্তরিক ভাবেই আমাদের আহ্বান করেছে।

গান্না তখন একমনে, বাগিচার দিকে তাকিয়ে ছিল। যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল সে এক আস্তরণ সবুজ ঘাসের মধ্যে। তা দেখে বুলবুল বলল :—কিরে গান্না ?

আম্মাজানের দিকে ফিরে তাকাল সে। —আবার এলাম ?

—কেন ভাল লাগছে না ?

এখানে যে স্নেহ, প্রেমের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ভাল না লেগে পারে ? সে বলল। বেগম সাহেবার কথা মনে পড়ে আম্মা ?

শুনে আলিকুলি তার দিকে তাকালেন, সফদর জঙ্গের কথা মনে পড়ে তার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

দারা সুকোহর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন আলিকুলি। সেখানেই থেকে গেলেন। মনে করেছিলেন অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে যাবেন অযোধ্যায়, কিন্তু দিল্লী তাকে আটকে রাখল।

ইমাদকে সহজে তিনি বোঝাতে পারলেন না।

সফদর জঙ্গের প্রতি ইমাদের ক্রোধ অসীম। তার চেয়েও বেশী ক্রোধ তার পুত্র সুজার উপর। কেন, ঠিক বুঝতে পারলেন না আলিকুলি।

মিটমাটের প্রশ্ন আসতেই ইমাদ জানাল, সুজার সঙ্গে মীমাংসা অসম্ভব।

—কেন ?

—জানিনা। কিন্তু অসম্ভব।

আর কথা বাড়াতে পারেননি আলিকুলি, বলেছিলেন, তবে আমাকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে হবে।

—কেন, জনাবের কোন অসুবিধা হয়েছে ?

—না।

—তাহলে ?

—আমি তাকে কথা দিয়েছি ফিরে যাব, তাই।

ইমাদ উত্তর দিয়েছিল, বেশ, যাবেন। তবে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করুন। কেন, সে কথা ইমাদ বলেনি! আলিকুলির মনে এক দুর্বল আশা উঁকি দিয়েছিল, তাহালে কি ইমাদ মিটমাটের কথাই ভাববে ?

তিনি থাকতে রাজি হলেন।

ইমাদের মনের মধ্যে তখন একটিমাত্র প্রশ্ন, তা হল গান্না। তাকে তার চাইই। হৃদয়কে বঞ্চিত রাখতে সে রাজি নয়।

যে আলিকুলি হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে যখন আবার পাওয়া গিয়েছে, তখন ছেড়ে দেবে না। সম্মান দিয়ে রাখতে হবে। যদি না হয়, জোর করে রাখতে হবে। যদি সত্যি সে থাকতে না চায়, তবে পাঠিয়েই দেওয়া হবে, কিন্তু গান্নাকে বাদ দিয়ে। হিন্দুস্থানের উজির তার প্রণয়িনীকে তার কাছে রাখবে।

তুরাণীদের পক্ষ থেকে ইমাদকে সমর্থন করে শক্তিশালী করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম, নবাব আহমদ বঙ্গাস। আহমদ বঙ্গাসের মারফৎ ইমাদ আলিকুলির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আসতে চাইল। এক দিন সে নবাব সাহেবকে পাঠিয়ে দিল দারা সুকোহর প্রাসাদে, সাদির প্রস্তাব নিয়ে। বলল, নবাব সাহেব আপনি আমার আর বুলবুল বেগম উভয়ের আত্মীয়, আপনি অন্তত এই কাজটুকু করুন।

বঙ্গাস চতুর ও ফন্দিবাজ লোক। ইমাদের তরুণ মনের আকাংখা

কা'কে ঘিরে উন্মাদ হয়ে উঠেছে তিনি বহু পূর্বেই তা টের পেয়েছিলেন। প্রয়োজন হলে তিনিই অগ্রণী হতেন। কিন্তু কিছুদিন হল ইমাদের উপর তিনি বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইমাদ উদ্ধত। মানী জনের মান রাখতে পারে না। তাঁর জাঠ বন্ধু সুরজমল পর্য্যন্ত দিনদিন ইমাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছিল।

ইমাদের প্রস্তাব শুনে বঙ্গাস একমুহূর্ত ভাবলেনা। তাঁর চিন্তা অন্য। ভিন্নাভিমুখী। তিনি ভাবছিলেন, আলির সঙ্গেই দেখা করবার জন্য। কারণ আলিকুলির মাধ্যমে সুজার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। সুজা যদি রাজি থাকে, তবে ইমাদের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত করবেন তাঁরা। সুতরাং ইমাদ তাকে সাদির প্রস্তাব নিয়ে আলিকুলির কাছে যেতে বললে, স্বীকার করলেন তিনি। যোগাযোগ, সে'ত আমার আনন্দের কথা। আমি সানন্দে এ প্রস্তাব নিয়ে যাব। আমার বিশ্বাস, আলিকুলিও এতে আনন্দিতই হবেন।

ইমাদ আনন্দে অভিভূত হয়ে বলল, জনাব, যদি আপনি পারেন, আপনাকে আমি প্রচুর ভাবে পুরস্কৃত করব। আপনি জানেন না আমি............।

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নবাব সাহেব বললেন,—আমি জানি। আপনি স্থির হোন। এ সাদি হবেই।

—সত্যি!

—সত্যি।

ইমাদ বলল, তবে জানবেন আপনারও উন্নতি অবশ্যম্ভাবি। নবাব সাহেব বিদায় নিলেন।

দারা সুকোহর প্রাসাদে এসে দেখা করলেন তিনি আলিকুলির সঙ্গে। আলিকুলি ইমাদের কাছে থেকে কোন দৌত্যেরই অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গাসকে দেখে অভ্যর্থনা জানালেন, এই যে নবাব সাহেব, কি খবর?

আপনারই কাছে এলাম।

বক্সাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আলিকুলিকে দেখে নিলেন। দেখলেন, সরল পরিষ্কার লোক। কোথাও ঘোর প্যাঁচ নেই মনে হয়। কাজেই প্রথমেই তিনি কাজের কথা পাড়লেন,—দিল্লী কেমন মনে হচ্ছে?

আলিকুলি দুঃখ করে বললেন, বড় হতাশ হলাম।

—কেন?

মোগল সাম্রাজ্যের আয়ু শেষ হয়ে আসছে। সফদর জঙ্গের সঙ্গে শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে গেছে।

একটু হেসে বক্সাস বললেন, আস্তে।

—কেন ?

—দেয়ালেরও কান আছে। শুনতে পাবে।

আলিকুলি বললেন, কিন্তু সত্যি বলতে ভয় পেয়ে লাভ নেই। নবাব সাহেব তখন তীক্ষ্ণ ভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সত্যি কি আপনি তাই মনে করেন ?

—হ্যাঁ জনাব।

—তাহলে মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার দায়িত্ব কি আমাদের নয়?

আলিকুলি সন্দেহের ভঙ্গীতে একবার তাকিয়ে দেখলেন নবাব সাহেবকে, তাপর বললেন, আমরা কি করতে পারি?

দুটো উজ্জ্বল চোখ আলিকুলির উপর রেখে বক্সাস বললেন, পারি। অনেক কিছুই করতে পারি।

—যেমন?

—নতুন উজির যদি নিযুক্ত করা যায়?

—কে আছে তেমন লোক।

নবাব সাহেব এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, যদি বলি সুজাউদ্দৌলা?

দুটো বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকলেন আলিকুলি নবাব সাহেবের দিকে।

গলাটা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, নবাব সাহেব,

হ্যাঁ, আমরা তেমনই ভেবেছি, তাই, আপনার সঙ্গে সংযোগ করছে। আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

আলিকুলি একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

নবাব সাহেব বললেন, ভয় নেই। আপনারই মঙ্গল হবে। সুজা আপনার জামাতা হতে যাচ্ছে, তারজন্য তাকে কথা শেষ না করতে দিয়ে আলিকুলি বললেন।

—আপনি—সত্যি, বলছেন ?

—আল্লার নামে শপথ করে বলছি।

আলিকুলি বললেন, তাহলে কথা দিচ্ছি, আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব। সুজার জন্য এতটুকু কাজ করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব। সফদর জঙ্গের নিমকের প্রতিদান দিতে পারব।

বঙ্গাস বললেন, এ আমি জানতাম, বড় সন্তুষ্ট হলাম। তিনি যেন একটা বিরাট তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর বঙ্গাস বললেন,—আপনাকে একটি কাজ করতে হবে ?

আলিকুলি বঙ্গাসের মুখের দিকে তাকালেন, যেমন ?

বঙ্গাস বললেন, ইমাদ একটি সাদির প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আপনার কন্যা গান্নার সে পানিপ্রার্থী। চিৎকার করে উঠলেন যেন আলিকুলি।

—অসম্ভব।

শান্ত ধীর ভাবে বললেন বঙ্গাস, তা জানি। তবু আপনাকে বাহ্যত এ প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে হবে।

—মানে ?

—এই সাদির প্রস্তাবে ইমাদকে ভুলিয়ে রেখে আমরা এগিয়ে যাব।

—না। তা হয় না।

বঙ্গাস আলিকুলির হাত ধরে বললেন, এত সত্যি, নয়। অভিনয়, সুজার জন্যে এইটুকু পারবেন না ?

নবাব সাহেবের চোখে অনুনয় ফুটে উঠল।

একটু ভেবে আলিকুলি বললেন, বেশ তাই হবে।

ফিরে এলেন নবাব সাহেব।

প্রতীক্ষায় অধীর ইমাদ প্রশ্ন করল, কি, তিনি রাজি হলেন?

হাসলেন নবাব সাহেব, না হয়ে উপায় আছে। এত তাঁর সৌভাগ্য আলিকুলি কখনও একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। ইমাদ কৃতজ্ঞতায় নবাব সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরল।

পাশে ছিল অকিবৎ মহম্মদ। বলল, তাহলে সাদির দিন ঠিক করে ফেলা হোক।

নবাব সাহেব বললেন, না।

—কেন? ইমাদ তার দিকে তাকাল।

নবাব সাহেব বললেন, এই মুহূর্তে সাদি হলে অনেকগুলি বিপদ আছে।

—যেমন?

—শত্রু পক্ষরা প্রবল হবে।

অকিবৎ বলল, কি রকম?

নবাব সাহেব বুঝিয়ে দিলেন, সুজাও গান্নার পানি প্রার্থী। সাদির সংবাদ শুনে সে ইন্‌তিজামের সঙ্গে যোগ দেবে। ইন্‌তিজাম, ইমাদ ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রু। শুধু তাই নয় এক্ষুণি সাদি হলে, পাঞ্জাব থেকেও বিপদের সম্ভাবনা। মুঘলানি বেগমের কন্যা উমদা বেগম জনাবের বাগদত্তা। যদি তাকে অস্বীকার করে উজির ইমাদ-উল-মুলক গান্নাকে সাদি করেন, তিনি রুষ্ট হবেন।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে নবাব সাহেব বললেন, কিন্তু সময় বিশেষে করতে হয়। আফগানরা যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেছে তখন মুঘলানিকে চটান উচিৎ হবেনা। সে আবদালির সঙ্গে যোগ দিলে দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

একটু ভাবল ইমাদ। বলল, আমাদের কি করতে হবে? নবাব সাহেব বললেন, ইন্‌তিজাম লাহোর আর মুলতানে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করছে ওকে আগে জয় করুন। তারপর পাঞ্জাব হয়ে মুঘলানিকে দিল্লী নিয়ে আসুন। সাদির সময় তাকে চোখে চোখে রাখা প্রয়োজন।

একমুহূর্ত ভাবল ইমাদ। তারপর বলল, কিন্তু আলিকুলি? নবাব সাহেব বললেন, তাঁর ভার আমি নিচ্ছি। তিনি দিল্লী ত্যাগ করবেন না।

ইমাদ বলল, বেশ তবে আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।

॥ ত্রিশ ॥

সময়েরই মত দ্রুত পরিবর্তনশীল মানুষের মন! সেই পরিবর্তনের নমুনা পেল ইমাদ। নবাব বঙ্গাস সাহেবের কথা মত লাহোর, মুলতান পঞ্জাব জয় করে মুঘলানি বেগমকে নিয়ে সে যখন ধীরে ধীরে দিল্লার পথে ফিরছিল, আচমকা এক সংবাদে চমকে উঠল। সংবাদ পাওয়া গেল যে দিল্লাতে বঙ্গাস, আলিকুলি আর সুজার দল সুজাকে উজির করবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। শুধু তাই নয়, এক মুহূর্তে বিলম্ব হলে হিন্দুস্থানের উজিরী পদ হারাতে হবে তাকে।

ইমাদের মত চতুর ছেলও বুদ্ধি হারিয়ে ফেলল। সঙ্গে ছিল অকিবৎ মহম্মদ তাকে নিয়েই আলোচনা করল ইমাদ। সে বলল, দ্রুত দিল্লীর দিকেই যেতে হবে তাহলে।

অকিবৎ বলল, আমার মনে হয় দিল্লার চেয়ে ফারাক্কাবাদ যাওয়াই আমাদের যুক্তি সঙ্গত হবে।

—কেন?

—বিদ্রোহের মূল নেতা নবাব বঙ্গাস। তাকে শান্ত করতে পারলে এর মূলোচ্ছেদ হবে। দিল্লীতে যারা রয়েছে তারা তত দুর্দ্ধর্ষ নয়।

ইমাদ বলল, নবাব সাহেবই যে দিল্লীতে নেই তা কে জানে?

অকিবৎ বলল, তা তিনি নেই, সে কথা জানতে পেরেছি।

ইমাদ বলল, কিন্তু ফারাক্কাবাদ গিয়ে যে আমরা তাকে শান্ত করতে পারব, তা কে বলতে পারে?

অকিবৎ বলল, আমি বলছি। নবাব সাহেবকে আমি চিনি। তাঁর কাছে সমস্ত কিছুর বিচার হয় লাভালাভ দিয়ে। নীতির বালাই নেই। আমরা যদি তাকে বেশী লোভ দেখাতে পারি তবে তিনি সুজার পক্ষ ত্যাগ করবেন।

—কি লোভ দেখাবে বল?

—লোভ দেখান যে, এলাহবাদ প্রদেশ তার সুবেদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অত উর্বর প্রদেশ নবাব সাহেব ছাড়তে চাইবেন না, ফলে সুজার সঙ্গে তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবি কারণ এলাহাবাদ এখন সুজার অধীনে। এতে সুজা মিত্র থেকে তাঁর শত্রুতে পরিণত হবে, আর আমরা শত্রুকে মিত্র করতে পারব।

বুদ্ধিমানের মত কথা। ইমাদ স্বীকার করল। তৎক্ষণাৎ দ্রুত দূত পাঠিয়ে দেওয়া হল প্রস্তাব নিয়ে ফারাক্কাবাদের পথে। পেছনে ইমাদ তার বাহিনী নিয়ে আসতে লাগল।

অকিবৎ সঠিক ধারণা করছিলেন। ইমাদের প্রস্তাব পেয়ে তৎক্ষণাৎ নবাব সাহেব সুজার পক্ষ ত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয় তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সুজার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

আরো কথা দিলেন, যারা এই ষড়যন্ত্রে সুজার সঙ্গে যোগ দিয়েছে তিনি তাদের ধরিয়ে দেবেন।

তিনি ফারাক্কাবাদে ইমাদের শিবিরে গিয়ে দেখা করলেন। ইমাদ তাকে এতটুকুও অবজ্ঞা না করে পূর্ণ সম্মান দিয়ে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলল, নাবাব সাহেব অপনিই আমার আত্মীয়, প্রতিভূ, সব।

নবাব সাহেব অল্লার নামে প্রতিশ্রুতি দিলেন আমি জীবনে তোমাকে পরিত্যাগ করব না।

ইমাদ প্রশ্ন করল, আমি এখন কি করব বলুন।

নবাব সাহেব বললেন, তুমি দ্রুত দিল্লীতে যাও। সুরজমল আর জাঠদের আক্রমণ কর। শুধু তাই নয়, আলিকুলি খাঁকেও বন্দী কর। ওরা প্রস্তুত হবার পূর্বে তোমাকে দিল্লী যেতে হবে।

ইমাদ বলল, আপনার পরামর্শ মতই আমরা কাজ করব; আপনি শুধু এদিক দেখবেন।

নবাব সাহেব বললেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি এগিয়ে যাও।

ইমাদ দ্রুত দিল্লীর দিকে এগিয়ে চলল।

সেই মুহূর্ত আলিকুলির পরিবারের পক্ষে এক চরম মুহূর্ত। সুজাকে দিল্লীতে নিয়ে আসবেন আলিকুলি, প্রস্তুত হবেন তিনি। আনন্দ আর ধরে না। তার পরে জামাতা হবে দিল্লীর উজির। তিনি তাকে এলাহাবাদের পথে এগিয়ে আনতে যাবেন, হঠাৎ একদিন তিনি বুকের মধ্যে তীব্র ব্যাথা অনুভব করলেন।

কিন্তু সে ব্যথার কথা আর খুলে বলতে পারলেন না কারো কাছে, এমন কি নিজের স্ত্রী বুলবুল বেগমের কাছে পর্যন্ত নয়। পড়বার ঘরে গিয়ে বসে আর উঠতে পারলেন না।

গান্না নিত্য অভ্যাস মত আব্বাজানের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে চিৎকার করে উঠল।

—কি হল ? ছুঠে আসল বুলবুল বেগম।

—কেঁদে লুটিয়ে পড়ল গান্না, আম্মা, অব্বাজান কথা বলছেন না, আম্মা।

বুলবুল এগিয়ে আলিকুলির দেহে হাত রেখে দেখল স্থির, নিশ্চল।

আল্লা বলে চিৎকার করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অভিভূত, স্থির, নির্বাক হয়ে গেল গান্না।

তার আব্বাজানের কখনো মৃত্যু হতে পারে, তাদের কাছ থেকে তিনি দূরে যেতে পারেন এ যেন ভাবনারও উর্ধ্বে। কিন্তু তাই ঘটে গেল।

বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, আঘাতের উপর আঘাত এসে থেঁতলে দিল ওদের। বাঁদী এসে খবর দিল, পারিবারিক দেওয়ান নাজির খাঁ দেখা করতে চান। তখনও অশ্রু শুকায়নি, বুলবুল তাকিয়ে থাকল শুধু। কথা বলতে পারল না।

বাঁদী বলল, তিনি বলেছেন ভয়ানক বিপদ।

—বিপদ !

—হ্যাঁ।

আবার কি বিপদ বুলবুল ভাবতে পারল না। এর চেয়ে বিপদ আর আছে কি?—তবু বলল, যা, দেওয়ান সাহেবকে ডেকে নিয়ে আয়।

বাঁদী নাজির খাঁকে নিয়ে এল। নাজিরের মুখ শুষ্ক, শঙ্কায় মৃয়মাণ। সে দিকে তাকিয়ে বুলবুলও ভয় পেল। কি হয়েছে খাঁ সাহেব।

—ইমাদ সংবাদ পেয়েছে আমরা বিদ্রোহ করেছি। সে দ্রুত দিল্লীর দিকে ছুটে আসছে।

চিৎকার করে বুলবুল গান্নাকে জড়িয়ে ধরল।

নাজির খাঁ বলছেন, আমাদের অপেক্ষা করবার সময় নেই।

বুলবুল বলল, কিন্তু কি করব?

—একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

বুলবুল দুচোখে অশ্রু বন্যার মধ্যে আলিকুলির দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু উনি?

নাজির খাঁ বললেন, আমি শুনেছি, কিন্তু শোকের সময় এখন নেই। যদি অপমানের হাত থেকে রক্ষা পেতে চান, তবে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

—কিন্তু খাঁ সাহেব।

—তাঁর কবরের ব্যবস্থা আমরা কচ্ছি আপনি ভাববেন না।

বুলবুল অরো কেঁদে ফেলল।

নাজির খাঁ সন্ত্বনা দিয়ে বলল, কান্নায় যখন ফিরে পাওয়া যাবে না তখন মৃতের জন্য শোক করে লাভ নেই। তিনি যাতে সন্তুষ্ট হতেন আমাদের তাই করতে হবে।

বুলবুল অশ্রুসিক্ত আঁখিতে তাকিয়ে বলল, তিনি কি চাইতেন?

নাজির খাঁ বললেন, এই মুহূর্তে যা চাইতেন, তা হল পরিবারের সম্মান রক্ষা করা। তিনি অযোধ্যাতে পালাতেন।

—কিন্তু আমরা কি করে যাব?

নাজির বলল, সে কথা অমি ভেবেছি, আপনি এক কাজ করুন।

—বলুন,

—জাঠ সর্দ্দার সুরজমলকে ডাকুন। এক মুহূর্ত দেরী করবেন না। তিনিই এখন আমাদের রক্ষা করতে পারেন। তাছাড়া নিজেও ইমাদের বিরাগ ভাজন হয়েছেন।

বুলবুল বলল, বেশ তাই করুন।

নাজির বলল, তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন।

আপনি তার সঙ্গে দেখ করুন।

ঝুলবুল অশ্রু সিক্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর তার দেহের উপর লুটিয়ে পড়ল।

নাজির খাঁ ডাকলেন, বেগম সাহেবা, অভিভূত হবেন না।

বুলবুল উঠে দাঁড়াল। চোখের জল শুকোতে পারলনা, কন্যাকে টেনে নিয়ে বাইরে এল।

সর্দ্দার সুরজমল অপেক্ষা করছিল।

বুলবুল তাদের দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল।

সন্তনা নিয়ে জাঠ সর্দ্দার বলল জানি মা সব জানি। কিন্তু এখন যে ইজ্জত বড়। পরে কাঁদবেন বুলবুল বলল, কি করব সর্দ্দার সাহেব? আমাকে বাঁচান আপনি।

কি করবে সুরজমল নিজেও ঠিক করতে পারছিল না। ইমাদকে সে চেনে। ইমাদ দিল্লীতে ফিরলে কি শাস্তি, তা ভেবে কল্পনা করতেও সে ভয় পেল। অন্য কোন উপায় না দেখে সে বলল' আপনি অযোধ্যায় পালান। আর কোন উপায় নেই।

বুলবুল কান্নায় ভেঙে পড়ল, কিন্তু কি করে যাব। আমায় কে নিয়ে যাবে। সর্দ্দার সাহেব আপনি আমার পিতা আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

বুলবুলের আবেদনে নিতান্ত বিচলিত হল সুরজমল। বলল বেশ আমি আপনাকে দেহরক্ষী দিচ্ছি। কিছু সংখ্যক জাঠ দেহরক্ষী দিয়ে বুলবুল বেগম আর গান্না বানুকে সে অযোধ্যার দিকে পাঠাল।

পয়লা এপ্রিল সকালে, বুলবুল আর আর গান্না জাঠ বাহিনী আর মুষ্টিমেয় মুসলমান বাহিনীর রক্ষাধীনে দিল্লী ত্যাগ করল।

দ্রুত চলে অগ্রা গিয়ে তারা প্রথম থামল। কিন্তু অগ্রার সীমান্তে জওয়াহির সিংজাঠ এই সময় তাঁর দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যে বেলায় আগ্রার প্রান্তে নতুন শিবির দেখে তার সন্দেহ হল। তৎক্ষণাৎ চর পঠিয়ে খবর নিল জওয়াহির।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল, বুলবুল বেগম ইমাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কন্যা গান্নাবানুকে নিয়ে পালিয়ে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে। অনুচর সংবাদ নিয়ে ফিরে এল।

জাওয়াহির সিং জিজ্ঞেস করল—কি সংবাদ?

অনুচর বলল, বুলবুল বেগম আর গান্না বানু।

—গান্না বানু! চমকে ভঠল জাওয়াহির সিং। গান্না বানুর সৌন্দর্য্যের কথা সে শুনেছে। সমস্ত হিন্দুস্থানে অমন সুন্দরী জেনানা নাকি আর নেই। তৎক্ষণাৎ একটা তীব্র লোভে চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করে উঠল। চাই,— গান্না বানুকে তার চাই। এই হবে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ লুণ্ঠন।

চিৎকার করে উঠল জাওয়াহির সিং—হুঁসিয়ার!

—বলুন।

—প্রস্তুত থাকবে।

—কখন?

—রাত প্রাথম প্রহরে আমারা শিবির লুঠ করব।

—জো হুকুম।

অনুচর চলে গেল।

সুরজমল তার বিশ্বস্ত অনুচর হরমলকে পাঠিয়ে ছিল বুলবুলকে পৌঁছে দেবার জন্য। আগ্রায় এসেই সে জাওয়াহির সিংহের দু-একজন অনুচরকে দেখে চিনে ফেলল। জাওরাহির জাঠের চরিত্র তার ভালকরে জানা ছিল। বুঝল আজ তাদের বিপদ। বিশেষ করে জেনানা

আদমির প্রতি জওয়াহির সিংহের দারুণ লোভ। গান্না বানুর কথা যদি সে শোনে তবে রক্ষা নেই। সে প্রমাদ গুণল মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে জাওয়াহিরকে বাধা দেওয়াও সম্ভব নয়। তারপর সন্ধ্যার ছায়াতে শিবিরের চতুর্দ্দিকে জাঠদের ঘুরে বেড়াতে দেখে তার আর সাহস থাকল না। সে গিয়ে বুলবুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডাকল —বেগম সাহেবা।

বুলবুল তার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ভয় পেয়ে বলল, কি সর্দ্দার জী।

—বড় বিপদ।

—কি ?

—গান্না বহিনকে নিয়ে এক্ষুণি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যান।

—কেন ?

—ডাক্‌কু।

—ডাক্‌কু।

—হ্যাঁ, ডাক্‌কু, জাওয়হির সিং। গান্না বাইনের কথা জানতে পারলে আর রক্ষে নেই।

বুলবুল হরমলের হাত জড়িয়ে ধরল, আমাকে বাঁচাও।

হরমল বলল, আর কোন উপায় নেই পালান।

—কোথায় ?

—এখান থেকে কাছে ফারাক্কাবাদে আপনার আত্মীয় আহমদ বঙ্গাস খাঁ থাকেন শুনেছি। সেই দিকেই যেতে হবে। ওরা আমাদের আক্রমণ করবার পূর্বেই আমাদের পালাতে হবে। কাউকে জানান চলবে না। এমনকি আমাদের অনুচরদেরও না। চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ুন।

আর সময় নষ্ট না করে বুলবুল শিবিরের মধ্যে গিয়ে গান্নাকে ডাকল, গান্না।

—আম্মা ফিরে তাকাল সে। বুলবুলের চেহারা দেখে ভয়ে চিৎকার

করে উঠতে গেল সে। কিন্তু বুলবুল তার মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল—চুপ। কোনকথা নয়। চলে আয়। হতবুদ্ধি গান্না মায়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল। অন্ধকারের আচ্ছাদনে হরমল বুলবুল আর গান্নাকে নিয়ে পালাল কারাকাবাদের পথে। কেউ জানতে পারল না। এমনকি হরমলের অনুচরেরাও জানতে পারল না, কি ঘটেগেল। ওদিকে পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী রাত্রি প্রথম প্রহরে জওয়াহির সিং উন্মত্ত চিৎকারে শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

॥ একত্রিশ ॥

বহু কষ্টে বুল বুল গান্নাকে নিয়ে নিয়ে ফারাক্কাবাদে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে কিন্তু ইমাদের সঙ্গে বঙ্গাসের পুনর্মিলন হয়ে গেছে। কিন্তু সে কাহিনী বুলবুলের জানা নেই। সে ভাবল বাঁচা গেল।

কিন্তু হঠাৎ বুলবুলকে আর গান্নাকে এভাবে দেখে আশ্চর্য্য হলেন বঙ্গাস। বললেন, তুমি!

বুলবুল কেঁদে লুটিয়ে পড়ল। বঙ্গাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে উঠালেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বল।

আনুপূর্বক সমস্ত ঘটনা ভেঙে বলে বুলবুল বলল, এবার আমাকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দিন। বঙ্গাস যে পুনরায় ইমাদকে মিত্র রূপে পেয়েছেন সে কথা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে, হাসিমুখে বুলবুলকে বললেন, ও, এই কথা! ভয় কিসের আমিতো আছি। তোমার গায় আঁচড়টি লাগবেনা।

বুলবুল বলল, কিন্তু ইমাদকে আমার বড় ভয়। সে যদি ধরতে পারে তবে চরম শাস্তি দেবে।

একটু হাসলেন বঙ্গাস, বললেন, না। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমাদের উপর তার কোন আক্রোশ নেই।

—কিন্তু লোকে যে বলছে?

—লোকে ভুল শুনেছে।

হঠাৎ বঙ্গাসের নতুন কথা শুনে কেমন অশ্চের্য্য হল বুলবুল। মনে মনে কেমন সন্দেহও হল। বলল।

—আপনি কি বলছেন?

—হাঁা, আমি ঠিকই বলছি। তোমার ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।

—কিন্তু সুজার কাছে তো আমাকে যেতেই হবে।

—কেন ?

—উনি যে কথা দিয়ে ছিলেন, সুজার সঙ্গে গান্নার সাদি দেবেন।

বঙ্গাস এক মুহূর্ত বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বুলবুল বলল, কি কথা বলুন।

বঙ্গাস বললেন, একটা প্রশ্ন করব ?

—করুন না।

—সত্যি কি, তুমি সুজাকে তোমার জামাতা হিসেবে চাও ?

—এ প্রশ্ন কেন ?

—এ প্রশ্ন এই জন্য যে, তুমি তোমার একমাত্র কন্যাকে ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছ। তুমি জান, গান্না তোমার একমাত্র কন্যা। রূপবতী, বিদূষী। সমস্ত হিন্দুস্থানে তার মত পাত্রী দুটি নেই। তাকে তুমি বাদশার ঘরে সাদি দিতে পার। তাকে তুমি কুমারের সঙ্গে সাদি দিতে পার, কিন্তু কৃতদার সুজার সঙ্গে কেন ? গান্না বহুবেগমের ঘর করবে ?

বুলবুলের মনে কথাটা লাগল। সেতো এ চায়নি। কিন্তু ভাগ্য বিপাকে আজ তাকে এখানে অগ্রসর হতে হচ্ছে। তা'ছাড়া, আলি-কুলি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মৃত স্বামীর কথা রাখবার জন্যও তাকে। সে বলল, তিনি যে কথা দিয়ে ছিলেন।

বঙ্গাস হাসলেন, বললেন, আমি জানি, আলিকুলি একটু খেয়ালি ছিল। কিন্তু কন্যা একমাত্র তার নয় তোমারও। সব চেয়ে বড় কথা কন্যা তোমার আলিকুলির কারও নয়। সে তার নিজের। গান্না বড় হয়েছে, তারও সুখ দুঃখ আছে। নিজস্ব অভিরুচি আছে তাকে এ ভাবে ভাসিয়ে দেবার অধিকার কি আছে ?

বুলবুল বলল, আমি যে অসহায়।

—অসহায় কেন। তুমি মনস্থির কর। সত্য যা, তাই কর। তাতে কথার খেলাপ হয় হবে। ভুলকে মেনে নিলেই পাপ।

ধীরে ধীরে যেন বুলবুলের মন পড়ে আসল। সত্যিতো সে কি নিজেও সুজাকে তার জামাতা হিসাবে কামনা করেছে ? করেনি,

তবু অনুপায়ে আজ তাকে অযোধ্যাতেই যেতে হচ্ছে। ভাগ্য বিপর্যয় না হলে........বুলবুল বলল, কিন্তু আমি যদি অযোধ্যাতে না যাই, আমাকে আশ্রয় দেবে কে ?

—আশ্রয় দেবার লোকের তোমার অভাব নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। সে ব্যবস্থা আমি করব।

—কি রকম শুনি ?

—আমি তোমার কন্যার জন্য অন্য পাত্রের কথা ভাবছি।

বুলবুলের কৌতূহল হল, বলল, পাত্রটি কে ?

বঙ্গাস বললেন, পাত্র স্বয়ং ইমাদ-উল্-মুল্‌ক।

—ইমাদ !

—হ্যাঁ ! ইমাদ তোমার কন্যার জন্য পাগল। মনে রেখ এই যে যুদ্ধ বিদ্রোহ যা কিছু সে করেছে, তা তোমার গান্নারই জন্য। সে গান্নাকে ভাল বাসে, সে গান্নাকে চায়।

বুলবুল চুপ করে থাকল। মনের মধ্যে এ প্রশ্নের যেন মিমাংসা করে উঠতে পারলনা সে। ইমাদকে কি গ্রহণ করা চলে ?

বঙ্গাস বললেন, কি মনোমত হল না ? বিচার করে দেখ ইমাদ সুজার চেয়ে ছোট নয়। গুণে, যোগ্যতায় সে সুজার চেয়ে বড়। সে অকৃতদার। তোমার কন্যা সুখে থাকবে।

আবার চুপ করে একটু ভাবল বুলবুল। তারপর বলল, কিন্তু........।

—বল।

—শুনেছি ছোট বেলায় পাঞ্জাবের সুবেদার মুইন খাঁর কন্যা উমদা-বানুর সঙ্গে তার সাদি হবার কথা হয়েছে। উমদা তার বাগদত্তা কন্যা। সে ক্ষেত্রে বহু বেগমের ঘরই করতে হবে না কি গান্নাকে ?

বঙ্গাস বললেন তুমি ঠিকই শুনেছ। কিন্তু সে ভয় নেই। ইমাদ উমদাকে সাদি করতে রাজি নয়।

বুলবুল বলল, তবে শুনছি, পাঞ্জাব থেকে সে উমদাবানু আর তার আম্মা মুগলানি বেগমকে দিল্লীতে নিয়ে আসছে কেন ?

বঙ্গাস বললেন, উদ্দেশ্য আছে। সাদি ভেঙে গেলে মুগলানি ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি তো তার চরিত্রের কথা শুনেছ। সে ভয়ানক মেয়ে ছেলে। উত্তেজিত হলে ক্ষতি করতে পারে। তাই দিল্লীতে তাকে চোখে চোখে রাখবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

বুলবুল আর কথা বলতে পারল না। মৌনীভাব সম্মতির লক্ষণ। বলে ধরে নিয়ে বঙ্গাস বললেন, এতে তোমার খারাপ হবেনা তুমি দেখে নিও। তুমি চেয়েছিলে হিন্দুস্থানের প্রধান আমির অথচ অকৃত দার কোন ছেলেকে তোমার জামাতা করতে। ইমাদের চেয়ে সুপাত্র আর কে আছে বল? সে মোগল সাম্রাজ্যের উজির। বয়স অল্প। অবিবাহিত।

অপছন্দের আর বুলবুলের কিছু থাকল না। বলল, বেশ দেখুন, আপনাদের যা অভিরুচি। সে সম্মতি দিল।

॥ বত্রিশ ॥

নিয়তিকে প্রতিহত করবে কে ?

সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল উজির ইমাদ-উল্-মুলকের সাদি। বহুদিন পরে হিন্দুস্থানে গুরুত্ব পূর্ণ বিবাহ। ভারত বিখ্যাত সুন্দরী গান্না বানু স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবেন গাজিউদ্দিন ইমাদ-উল্-মুলক জঙ্গ বাহাদুরকে।

গান্নাকে একথা জানিয়ে মত চেয়ে ছিল বুলবুল নিজেই। গান্না নিজস্ব কোন অভিমত দেয়নি। বলেছিল, তোমার অভিমতই আমার মত।

বুলবুল বলেছিল, তোমার আব্বাজানের কথার খেলাপ হবে বলে তোমার দুঃখ নেই ?

—আব্বাজানও তো আমার, তাঁকে অস্বীকার করলে দুঃখ হবেনা ?

কথা শুনে বুলবুল ভাবল, তাহলে ইমাদকেই গান্নার পছন্দ। সন্তুষ্ট চিত্তে সাদির আয়োজনে লেগে গেল সে। আর গান্না ভাবতে বসল। বহুদিন আগে দেখা ষোড়শ বর্ষীয় এক শেষ-কিশোর তরুণের মুখ মনে পড়ল তার। তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত অথচ লাবণ্য ময়। তরুণ তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল। গান্নার মনে কি সেদিন কোন শিহরণ জাগেনি। সেই ঔদ্ধত্ব ভরা প্রত্যাখ্যানের কথাও মনে, পড়ে গান্নাকে বলে দিয়ে ছিল 'বুলান্দ দরওয়াজা পথে এস'। দীর্ঘ দিন ইমাদ তার বুকের মধ্যে গান্নাকেই পুষে রেখেছিল বোধ হয়। ভাবতে আবার শিহরণ আসে তার মধ্যে।

কিন্তু সেই মুহূর্তে সুজার কথা মনে পড়ে তার। অযোধ্যা ত্যাগ করবার পূর্ব্বে সুজার সেই অনুরোধ 'কথা দাও আবার আসবে' মনে পড়ে। সুজাকে কি ভালবাসে গান্না। তার হৃদয়ের গভীর প্রদেশে সুজাকে কি সে স্থান দিয়েছে ! সে প্রশ্ন বিচার করতে পারেনা গান্না।

সুজার দুটো চোখে প্রেমের গাম্ভীর্য্য আছে বলে মনে হয় না। অথচ কেন যেন নিম্নগামী ঝর্ণার মত মাটীর দিকে তাকে টানে সুজা। সেকি প্রেম। আকর্ষণ! নিয়তি! কে জানে। নিজের অন্তরের মধ্যেও আকাংখাকে বিশ্লেষণ করতে পারেনা গান্না। কিন্তু কেমন অসহায় ভাবে তবু যেন সে এগিয়ে যেত। সব যেন রহস্য।

আজ ইমাদের সঙ্গে সাদির কথা শুনে তার হৃদয় তো খুব উৎফুল্ল নয়। অথচ ইমাদকে যে তার মন অস্বীকার করেছে তাও নয়। যেন তার হৃদয়ের মধ্যে স্থির, স্থবির শান্ত একটি ভাব। এইকি তার চরিত্র! নিজেকে নিজে চিনতে না পেরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গান্না।

॥ তেত্রিশ ॥

অপর দিকে কিন্তু সাদির সংবাদ পেয়ে নিতান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন মুঘলানি বেগম। একি! ইমাদ কথার খেলাপ করবে? যদি শুধু তার কথার খেলাপ হত, কিছু বলবার ছিলনা। এর সঙ্গে যে যুক্ত হয়ে আছে, উমদার সম্মান, মুঘলানি বেগমের মর্য্যাদা। না, না, এ হতে পারেনা, এ তিনি হতে দেবেন না। পিঞ্জরা বদ্ধ সিংহীর মত গর্জাতে থাকলেন মুঘলানি বেগম। এরই জন্য বোধ হয় ইমাদ তাঁকে দিল্লী ধরে নিয়ে এসেছে? আচ্ছা, দেখা যাবে।

ইমাদকে তলব করে পাঠান তিনি।

ইমাদ দেখা করলে বলেন, একি শুনছি?

—বলুন।

—তুমি গান্নাকে সাদি করছ?

—হাঁা।

—এ সাদি তোমার হতে পারেনা।

—কেন?

—তুমি আমার কন্যা উমদা বানুর বাগদত্ত।

ইমাদ বলল,—কথা আমি দিইনি।

—তুমি না দিলেও তোমার পিতা দিয়ে ছিলেন।

—কিন্তু ইমাদের জন্য তিনি কি ক'রছিলেন জানি না তার জন্য আজকের ইমাদ দায়ী নয়।—আমার মন, ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে পারি না।

—তবে উমদার কি হবে?

—তাকে সাদি দেবেন।

—কার সঙ্গে?

—যার সঙ্গে ইচ্ছে।

—না, তা হয়না, এ সাদি তোমাকেই করতে হবে।

—আমাকে মাপ করবেন।

মুঘলানি বেগম তখন ইমাদের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বললেন আমাকে অপমান কোরনা ইমাদ।

ইমাদ নির্বিকার ভাবে বলল, আমি দুঃখিত, আমার কিছু করবার নেই।

দলিত ভুজঙ্গিনীর মত গর্জ্জন করে উঠলেন মুঘলানি, বেশ তবে আমাকে পাঞ্জাব পাঠিয়ে দাও।

—তা এখন সম্ভব নয়।

—কেন ?

পাঞ্জাবের নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

ইমাদ আর কথা না বাড়িয়ে চলেগেল। গর্জাতে লাগলেন মুঘলানি বেগম, আচ্ছা দেখা যাবে। এর প্রতিশোধ যদি আমি না নিতে পারিতো আমি মুঘলানি বেগম নই। এই উমদাকে তোমার সাদি করতে হবে, আর আজকের তোমার সাধের গান্নাকে করব তার বাঁদী। যদি না পারি তবে আমি মুসলমানের মেয়ে নই॥

॥ চৌত্রিশ ॥

সাদি।

দিল্লীর উজির ইমাদ-উল্-মুল্‌কের সাদি।

দিল্লী আজ উৎসব মুখরিত। আলোয় আলোয় রাজপথ ছেয়ে গিয়েছে। সানাইয়ের সুর বাতাসে। আগুনের ফুলকির হারে আসমান ভর্ত্তি। মিছিল আসছে দারা সুকোহর প্রাসাদের দিকে। সেখানই কনে। ইমাদ আসছেন সোনার পাল্কী চড়ে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলে বাদ্যধ্বনি, উন্মত্ত চিৎকার, হাউইয়ের শব্দ শোনে গান্না। আর বহুদিনের একটি ঘটনা তার স্মরণ পথে ভেসে উঠছে।

আরো একদিন দিল্লীর আকাশ বাতাস এমনি উৎসব মুখরিত হয়ে উঠেছিল। গান্নারা সবাই উৎসুক হয়ে বাইরে গিয়েছিল দেখতে। সাদি করতে চলেছিল সফদর জঙ্গের পুত্র সুজা। কিন্তু সে কথা জানতে পেরে মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল আলিকুলির, বুলবুলের, সবার।

আজকে আবার তেমনি মিছিল এগিয়ে আসছে। আজ কি তার আম্মার মুখে হাসি ফুটেছে। কবরের মধ্যে তার পিতা কিন্তু সন্তুষ্ট হন নি। সেই সুজার অপমানের প্রতিশোধ কি নেওয়া হয়নি!

সুজা! কথাটা মনে পড়তেই অযোধ্যায় মনটা চলে গেল গান্নার। কে জানে সুজা এতক্ষণ কি করছে! সে কি আজো অপেক্ষা করে বসে আছে! নিয়তি। একদিন তো তাকে ঘিরেই আম্মা স্বপ্ন দেখে-ছিলেন। সফল হয়েছিল কি? গান্নাকে ঘিরে সুজা হয়তো স্বপ্ন দেখছে সফল হবে কি? দুনিয়াটা একটা অদৃশ্য শক্তির খেয়ালে এগিয়ে চলে। গান্নাকে সেই শক্তিই তার যথা নির্দেশিত পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছু করবার নেই। সে শক্তির কাছে নতি স্বীকারই

একমাত্র উপায়। শব্দ এগিয়ে এল। দারা সুকোহর প্রাসাদের উপর আগুনের ফুলকির হার ফুটল। তোপধ্বনী হল। উজির উল্-মুল্ক বরবেশে নামলেন প্রাসাদের সিংহ ঘরে।

বিস্তৃত আঙিনায়—হাজার আমিরের সামনে সাদি সম্পন্ন হল।

মস্লিনের আড়ালে কন্যা, এ পাশে বর।

হাজার লোকের সামনে কনের প্রতিশ্রুতি নিলেন মৌলভি সাহেব —কবুল।

স্পষ্ট উচ্চারণ করল গান্না, কবুল।

একটু শুধু হাসল ইমাদ।

সাদি শেষে নীরব হল সব।

শুধু মাত্র গান্না আর ইমাদ।

তরুণ উজির তার লজ্জানত বধুর ওড়না উন্মোচন করে পূর্ণাবয়স্ক মুখখানি দেখলেন। আসমানের চাঁদ যেন ইমাদের ঘরে এসেছে।

আবেগে ইমাদ ডাকল—গান্না।

—একটু কেঁপে গেল গান্না। জবাব দিল, জনাব।

অবনত মুখখানির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ইমাদ। তার পর বলল, তুমি একদিন বলেছিলে 'বুলান্দ দরওয়াজার পথে এস।' এসেছি ?

—হ্যাঁ।

—তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ ?

—হয়েছি জনাব।

কম্পিত গান্নাকে নিজের বুকে টেনে নিল ইমাদ।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সাদির রাত্রে সানাইয়ের সুরে করুণ রাগিনী বেজেছিল। বুঝি তার কোন ইঙ্গিত ছিল। কারণ সে রাত্রে দিল্লীতে উৎসবের অগ্নি জ্বললেও বেদনার মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল মোগল সাম্রাজ্যের উপর। আহম্মদ আবদালি আফগান অনুচরদের নিয়ে পাঞ্জাব জয় করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, আরো ক্ষতি অপেক্ষা করে ছিল। মুঘলানি বেগম উৎসবের অবসরে দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন আহম্মদ আবদালি পাঞ্জাবে এসেছিলেন। কন্যা উমদাকে নিয়ে গোপেনে তিনি আহম্মদ আবদালির সঙ্গে দেখা করতে চললেন। আহম্মদ আবদালি তখন পাণিপথের কুড়ি মাইল পেছনে কার্নালে শিবির গড়ে বিশ্রাম করছিলেন। মুঘলানি সেখানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন। আহম্মদ আবদালির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল পূর্বের। আবদালি তাকে 'বেটী' বলে গ্রহণ করোছিলেন। তিনি শিবিরে গিয়ে আহম্মদের কাছে কেঁদে পড়লেন।

আহম্মদ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, কি খবর বেটী।

মুঘলানি কেঁদে বললেন, ইমাদ আমাকে অপমান করছে।

আনুপূর্বক সমস্ত ঘটনা ভেঙে বলে, মুঘলানি বললেন, তুমি এর প্রতিশোধ নাও।

আহম্মদ বললেন, নিশ্চয়ই নেব। আমার বেটীর যে অপমান করেছে তাকে শাস্তি দিতেই হবে। বল কি করতে হবে ?

মুঘলানি বলল, উমদাকে ইমাদ অপমান করেছে। তাকেই ওর সাদি করতে হবে। আর গান্নাবেগমকে আমার মেয়ের বাঁদী হতে হবে।

—বেশ তাই হবে। আহম্মদ আবদালি কথা দিলেন।

আফগান বাহিনী দিল্লীর পথে এগিয়ে এসে বাদ্‌লিতে শিবির গড়ল। আহম্মদ তার উজিরকে ডেকে আদেশ করলেন,—

—আপনি উজির ইমাদকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বলুন।

যদি তা' না পারে তাহলে সবেগম আমার সঙ্গে দেখা করুক।

না হলে দিল্লীকে আমি ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেব।

উজির জানালেন, আপনার ফরমাস অনুযায়ীই কাজ করা হবে।

॥ ছত্রিশ ॥

ইমাদ তখন নতুন জীবনের স্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত।

জীবনের সব চেয়ে পরম ধনকে সে পেয়েছে। হিন্দুস্থান জয় করে যে গৌরব তার হয়নি, আজ তার সেই গৌরব।

সে সুখী, চরম সুখী। দারা সুকোহর প্রাসাদে সেই চরম সুখের আস্বাদই গ্রহণ করছিল সে।

তখন রাত্রির শেষ প্রহর। গান্না তার তরুণ স্বামীর বক্ষলগ্না হয়ে আছে। পাখির কূজনের মত নানা কথা ইমাদ তার দয়িতার কানে কানে বলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন করছে: প্রথম তুমি যেদিন আমাকে দেখেছিলে, কি মনে হয়ে ছিল?

গান্না অর্ধ উত্তোলিত মুখখানি তুলে বলেছিল, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান?

—আর কিছু নয়?

—আর কি বল?

—প্রেমিক!

মুখ নীচু করেছিল গান্না।

নিজের করতলে তার মুখখানি তুলে ধরেছিল ইমাদ—

—বল?

—ভীরু গান্না উত্তর দিয়েছিল, ভেবেছিলাম, তবে আরো পরে।

—কখন?

—যখন আপনি চিঠি দিয়েছিলেন।

—সে চিঠি তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে কেন?

—প্রত্যাখ্যান তো করিনি, বীরের মত এসে জয় করে নিতে বলেছিলাম।

—আমি তা' নিয়েছি। আজ তুমি সুখী?

—হ্যাঁ।

ইমাদ প্রশ্ন করেছিল এই মুহূর্তে তোমার মনের মধ্যে কি প্রশ্ন, বলত?

একটু কেঁপে গিয়ে ছিল গান্না। কি বলবে সে!

—বল?

গান্না বলে ছিল, মনে হচ্ছে, এই মুহূর্ত অমর হয়ে থাক। যেন জীবনে আর কোন দিন বিচ্ছেদ না আসে।

এত ভাল লেগেছিল ইমাদের যে আবেগে সে গান্নাকে আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে ছিল।

দূরে আজানের শব্দ শোনা গিয়ে ছিল।

গান্না বলে ছিল দিনের আলো দেখা যাচ্ছে।

ইমাদ বলেছিল। দিনের আলোর মত আমাদের জীবন উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

কিন্তু সূর্য্য কি সেদিন মুখ ঢেকে উঠছিলেন। সত্যিই তাই। কুয়াশা ছিল প্রচুর। ইমাদ বাইরে এসে সূর্য্যের মুখ দেখতে পেল না।

নিজের মনেই বলল, বড় মেঘের দিন।

ভাবতেই বাঁদী এসে দাঁড়াল, সামনে।

ইমাদ বলল, কি খবর ?

—খোদাবন্দকে বাইরে ডাকছে।

—কে ?

—জানি না, খাঁন জাহান এই মুহূর্তে আপনাকে বাইরে যেতে অনুরোধ করেছেন।

এত সকালে কি ব্যাপার, বুঝতে না পেরে ইমাদ কৌতূহলী হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

বৈঠকখানায় একা বসে ছিল খাঁন জাহান।

ইমাদ দেখল সে বড় বিষণ্ণ। যেন ভেঙে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করল,

—কি খবর ?

ইমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে খাঁন জাহান বলল, বড় দুঃসংবাদ।

—দুঃসংবাদ।

—হ্যাঁ, জনাব, আহম্মদ আবদালি হঠাৎ তার দলবল গিয়ে দিল্লী আক্রমণ করেছেন।

যেন কিছু ভাবতে পারল না ইমাদ! চুপ করে গেল সে।

জীবনের পরম লগ্ন উপভোগ করবার মুহূর্তে এক চরম দুঃসংবাদ!

খাঁন জাহান বলল, আমরা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গেছি।

আবদালির সঙ্গে যোগদান করেছে ইন্‌তিজাম। সেই আহম্মদকে

দিল্লী নিয়ে এসেছে। দুকোটী টাকার বিনিময়ে উজিরি পদ প্রার্থনা করেছে সে। সঙ্গে মুঘলানি বেগম যোগ দিয়েছেন।

—মুঘলানি বেগম কি করে পালাল ?

—সাদির রাত্রে আমাদের ব্যস্ততার অবসরে পালিয়েছে।

দিল্লীর অলিগলির খবর সেই দিচ্ছে আবদালিকে।

—বিশ্বাস ঘাতক, বেইমান। দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল ইমাদ।

খাঁন জাহান আবদালির পত্রখানা তাকে পড়তে দিল।

পড়ে খানিকটা কোন কথা বলতে পারল না ইমাদ। তার পর বলল, বেশ, আমরা যুদ্ধই করব।

খাঁন জাহান বলল, তা এখন সম্ভব নয়। আমাদের বাহিনীকে ঘুষ খাইয়ে সরিয়ে নিয়েছে ইন্‌তিজাম।

আমিরদের অধিকাংশই যোগ দিয়েছে আবদালির সঙ্গে।

কথা হারিয়ে ফেলল ইমাদ।

খাঁন জাহান বলল—একমাত্র আত্মসমর্পন করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

ইমাদের চোখ দুটো ভিজে উঠল।

কিন্তু উপায় নেই। বাঁচতে হলে আত্মসমর্পই করতে হবে।

জেনানা মহলে চলে গেল।

তাকে দেখেই চমকে উঠল গান্না, আপনার কি হয়েছে ?

গান্নার হাত দুটো ধরে কেঁদে ফেলল, ইমাদ। আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।

সেই মুহূর্তে বুলবুল বেগম বাইরে এসে ওদের এ অবস্থায় দেখে। বলল, কি হয়েছে ?

ইমাদ বলল, আম্মাজান, আবদালি দিল্লী আক্রমণ করেছে। আমরা প্রকৃত পক্ষে অবরুদ্ধ।

বুলবুলের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

ইমাদ বলল, আমাদের যেতে হবে।

—কোথায় ?

ইমাদ বলল, আহম্মদ আবদালি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

—তুমি যাবে ?

—হ্যাঁ।

—যদি কোন বিপদ হয় ?

—কিন্তু এছাড়া আর তো কোন উপায় নেই।

বুলবুল বেগম বললেন, আমরা কোথায় থাকব ?

ইমাদ বলল, আপনি এখানেই থাকবেন।

—আমি মানে ? একা ?

—হ্যাঁ।

—কেন ? গান্না কোথায় থাকবে ?

—আমার সঙ্গে যাবে।

—কোথায় ?

—বাদ্‌লিতে আহম্মদ শাহের শিবিরে। আবদালি আমাদের দুজনকেই দেখা করতে আদেশ দিয়েছেন।

কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায়, বুলবুলের বুকটা দুর দুর করে কেঁপে উঠল।

ইমাদ গান্নাকে বলল, এস।

—এ ভাবেই ?

—হ্যাঁ। আর দেরী করা চলবেনা।

গান্না বুলবুলকে জড়িয়ে ধরল। বুলবুল তাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে চুমু খেল। বলল, এস। আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন।

ভয় পেয়ে গান্না ডাকল, আম্মা!

জীবনে এই প্রথম সে মায়ের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে। বুলবুল তাকে সাহস দিল, বলল, ভয় নেই, আমার কাছ থেকে কেউ তোকে ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। যেখানেই থাক্, আমি তোর পাশেই আছি জানবি।

ইমাদ আর গান্না বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

॥ আটত্রিশ॥

বার্দালিতে আহম্মদ আবদালির শিবিরে গিয়ে দেখা করল ইমাদ।

আপন কক্ষে আহম্মদ আবদালি ইমাদকে ডেকে নিলেন।

অবনত শিরে ইমাদ গিয়ে দাঁড়াল আবদালির সামনে।

সেই মুহূর্তে মস্‌লিনের পর্দ্দার ওপাশে এসে দাঁড়ালেন মুঘলানি বেগম।

আহম্মদ আবদালি ইমাদকে বললেন, মুখ তোল।

মুখ তুলে তাকাল ইমাদ।

আবদালি মুঘলানি বেগমের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, দেখতো চিনতে পার কি না?

—পারি খোদাবন্দ।

—তবে একে আপমান করেছিলে কেন?

নীরব থাকল ইমাদ।

আবদালি তিরস্কার করে বললেন, ছিঃ ছিঃ আমিরের পুত্র হয়ে সামান্য একজন নর্তকীর মেয়েকে সাদি করলে?

ইমাদ মাথা নীচু করে থাকল।

আবদালি বললেন, তোমার পাপের শাস্তি কি বল?

—কি পাপ, খোদাবন্দ?

—তুমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে অপমান করেছ। তার কন্যাকে সাদি করতে অস্বীকার করেছ। বল কি শাস্তি?

ভীত ইমাদ বলল, জনাবের যেমন মর্জ্জি।

আবদালি বললেন, আমি নিজে তোমাকে শাস্তি দেবনা।

যাঁকে তুমি অপমান করেছ, তিনিই তোমার শাস্তি বিধান করবেন।

মুঘলানির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, বলো বেটি কি চাই?

উদ্ধত ভঙ্গীতে মুঘলানি বললেন, উমদাকে সাদি করতে হবে ইমাদের।

আবদালি ইমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রাজি?

ইমাদ নীরব থাকল।

আবদালি ধমকে উঠলেন, সাদি তোমায় করতেই হবে।

ইমাদ বিমর্ষ চিত্তে বলল, তাই হবে।

আবদালি মুঘলানি বেগমের দিকে তাকালেন, এবার তুমি সন্তুষ্ট?

মুঘলানি বললেন, আরো একটি আর্জ্জি আছে, আব্বাজান

—বল?

—নর্তকীর বেটী আমার উমদাকে অপমান করেছে। তাকে শাস্তি নিতে হবে।

—বল।

আমার আর্জ্জি, গান্না উমদা বানুর বাঁদী হয়ে থাকবে।

ইমাদ শিউরে উঠল। অনুনয়ের ভঙ্গিতে তাকাল আবদালির দিকে। বলল, খোদাবন্দ, যা শাস্তি আমায় দিন। গান্না নিরপরাধ, তাকে শাস্তি দেবেন না।

ধমকে উঠলেন আবদালি, চোপরাও কমবক্ত।

তৎক্ষণাৎ আদেশ দেওয়া হল। উমদা আর গান্না বেগমকে নিয়ে আসা হোক।

মুহূর্তেই গান্নাকে শিবির থেকে নিয়ে আসা হল। উমদাকেও আনা হল।

আবদালি আদেশ করলেন ইমাদকে, উমদার হাত ধর। ইমাদ হাত ধরল।

—কবুল কর—

—কবুল।

গান্না প্রথমটা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

আবদালি ইমাদকে বললেন,—গান্নাকে ধর।

নিশ্চল পুতুলের মত ইমাদ গান্নার হাত ধরল।

আবদালি উমদাকে বললেন, একটা দিনার দাও ইমাদের হাতে।
একখানি দিনার দিল উমদা।

আবদালি বললেন, একখানি দিনার নিয়ে তুমি ওকে বিক্রী করে দাও।

—কাকে ?

—ধমকে উঠলেন আবদালি, কাকে বুঝতে পাচ্ছ না ? তোমার বেগমকে। নর্তকীর কন্যা আবার বেগম !

গান্নার মনে হল চিৎকার করে কেঁদে উঠে, আল্লা—! কিন্তু কে যেন তার কণ্ঠ রোধ করে দিল।

ইমাদ ঘামতে লাগল।

আবদালি বললেন, বল আমি ওকে আমার উমদা বেগমের কাছে চির দিনের জন্য বাঁদী হিসেবে বিক্রী করলাম। আল্লা সাক্ষী, গান্নার আর কখনো মুখ দর্শন করব না।

—হায় আল্লা একি করলে! চিৎকার করতে চাইল গান্না। পারল না।

ইমাদও কিছুতেই কথা বলতে পারল না যেন। অবশেষে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কি যেন উচ্চারণ করল।

মুঘলানি বেরিয়ে এসে গান্নাকে টেনে নিলেন।

কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, পয়্জার্ খোল।

অবাক হল উমদা, কেন ?

ধমকে উঠলেন মুঘলানি বেগম, খোলনা।

উমদা পা থেকে পয়জার খুলল।

মুঘলানি গান্নাকে বললেন, মাথায় নাও।

গান্না অভিভূত হয়ে স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল।

আহম্মদ আবদালি ধমক দিলেন, কৈ যাও। অত্যাচার করতে হবে ?

গান্না নয়, গান্নার মধ্যে কে যেন পয়জার্ জোড়া তুলে নিল মাথায়।

মুঘলানি বেগম বললেন, পর্দার ওপাশে চলে যাও। যন্ত্রচালিতের মত গান্না এগিয়ে গেল।

ইমাদের চোখ দিয়ে মুক্তোর মত কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

জীবনে স্বপ্ন দেখার হয়তো এইই পরিণতি !

গান্নাকে নিয়েও যে তার আব্বাজান আম্মা স্বপ্ন দেখছিলেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

মানুষের স্বপ্নের যে এমন পরিণতি হতে পারে কে জানতো। জীবনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে মনে করে যে মুহূর্তে বুলবুল বেগম আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে এই দুর্ঘটনা ঘটল। আবদালি দিল্লী আক্রমণ করলেন।

ইমাদ বাদ্‌লিতে আবদালির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। বুলবুলের শান্তি নেই, ওরা না ফিরে আসা পর্যন্ত। তার নবপরিণীতা কন্যা। আল্লা যেন তার কোন অমঙ্গল হতে না দেন। সাত পাঁচ ভেবে বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়ছিল বুলবুল। হঠাৎ এমন সময় ইখ্‌তিয়ার এসে তার সামনে দাঁড়াল ইখ্‌তিয়ার ইমাদের সঙ্গেই গিয়েছিল।

তাকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে প্রশ্নকরল বুলবুল,—কি সংবাদ ?

চুপ করে থাকল ইখ্‌তিয়ার।

—কি, খবর বল ? ইমাদ ভাল আছে ?

—আছে বেগম সাহেবা।

—তবে তুমি এত গম্ভীর কেন ?

ইখ্‌তিয়ারের দুচোখ ঝাঁপিয়ে অশ্রু দেখা দিল।

কেঁদে উঠল বুলবুল, কি হয়েছে ? বল ? আমার গান্না ভাল আছে তো ?

এবার ইখ্‌তিয়ার কেঁদে ফেলল।

বুলবুলের বুকখানা লাফিয়ে উঠল! এগিয়ে গিয়ে হাত ধরল সে ইখ্‌তিয়ারের, কি হয়েছে বল। তাড়াতাড়ি বল! গান্না বেঁচে আছে তো।

কান্নার আবেগ নিয়েই ইখ্‌তিয়ার বলল, আছেন বেগম সাহেবা

—তবে ?

বুলবুলের বুকটা কাঁপতে লাগল।

ইখ্‌তিয়ার বলল কিন্তু........

—কিন্তু !

—তিনি আর এখন বেগম নেই।

তার মানে ?

—আবদালি, ইমাদকে গান্না বেগমকে তালাক দিতে বাধ্য করেছেন।

—হায় আল্লা, চিৎকার করে উঠল বুলবুল।

তার দুচোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ কাঁন্নার আবেগে কথা বলতে পারল না সে। তারপর বলল, সে এখন কোথায় ?

—মুঘলানি বেগমের কাছে।

—সেখানে কেন?

ইখ্‌তিয়ার বলল, উমদা বানুকে সাদি করতে বাধ্য হয়েছেন ইমাদ-উল্‌-মুলক।

—এঁ্যা !

—হ্যাঁ। আবদালি গান্না বেগমকে উমদা বেগমের বাঁদী করে দিয়েছেন।

চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুলবুল।

বোধ হয় জ্ঞান হারাল। কারণ কিছুক্ষণ সে নড়তে পারল না। নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকল ইখ্‌তিয়ার।

ব্যথার আঘাত একটু কমলে বুলবুল উঠে দাঁড়াল। অশ্রুপূর্ণ দুটো চোখ সে তাকাল ইখ্‌তিয়ারের দিকে। তার দুচোখে অনুরোধ। বলল, ভাই ইখ্‌তিয়ার একটি কাজ করে দিতে পারবে ?

—বলুন মালিকান।

—আমাকে এক্ষুণি বাদ্‌লিতে নিয়ে চল।

—আপনি যাবেন ?

—যাব।

—যদি ওরা আপনাকেও অপমান করে ?

কেঁদে উঠল বুলবুল, বলল, করুক, করুক। তবু আমার গান্নাকে ছেড়ে আমি কি ভাবে থাকব ? তুমি আমাকে নিয়ে চল।

ইখ্‌তিয়ার আর না করতে পারল না। বুলবুলকে নিয়ে বাদ্‌লির দিকে চলল।

॥ চল্লিশ ॥

সন্ধ্যার সময় ইখ্‌তিয়ার ও বুলবুল বাদ্‌লির আফগান শিবিরে এসে পৌঁছুল।

আহম্মদ তখন নিজের শিবিরে মুঘলানির সঙ্গে লাল কেল্লা লুণ্ঠনের পরিকল্পনা করছিলেন।

বাঁদী এসে সালাম জানাল, একজন জেনানা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আশ্চর্য্য হলেন আবদালি—কে?

—বুলবুল বেগম।

চমকে উঠলেন মুঘলানি। আহম্মদ তাকে বললেন, তুমি চেন?

—চিনি।

—কে সে?

—গান্নার আম্মাজান।

আবদালি বলল, নিয়ে এস তাঁকে।

বাঁদী বুলবুলকে নিয়ে এল।

বুলবুল ভূমিতে পড়ে কুর্নীস জানাল আবদালিকে।

আবদালি বললেন, কি চাই?

বুলবুল বলল, শাহান শা, আমি সামান্য একজন রমণী, আপনার কাছে ক্ষুদ্র একটি ভিক্ষা আছে।

—বল।

—আমার কন্যা গান্নাবানু আপনার কাছে বন্দী, আপনি তাকে মুক্তি দিন।

আবদালি বললেন, তার ভার আমার নয়। ওর। মুঘলানিকে দেখিয়ে দিলেন তিনি।

বুলবুল হাঁটু গেড়ে মুঘলানির কাছে বসল, হজরত সাহেবা আপনি দয়া করুন। আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন। আমি দিল্লী ত্যাগ করে আপনাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাব।

নিষ্ঠুর মুঘলানি বললেন, না।

—দয়া করুন বেগম সাহেবা।

—না।

স্থির হয়ে কিছুটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুলবুল বলল,—তবে আমাকেও আপনার বাঁদী করে রাখুন। আমার একমাত্র কন্যার কাছে আমাকে থাকতে দিন। শুধু এইটুকু ভিক্ষা আমাকে দিন।

বুলবুল আবদালির পায়ের কাছে বসল। শাহান শা, এই টুকু দয়া করুন।

আবদালি মুঘলানি বেগমের দিকে তাকালেন।

মুঘলানির এক জবাব, না।

নিষ্ঠুর প্রত্যাখান। বুলবুলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ সে স্থির হয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার পর বলল, বেশ তবে তাই হোক। আল্লা আপনাদের সুখী করুন।

বুলবুলের হিরক অঙ্গুরীর মধ্যে লুকান বিষ ছিল। বুলবুল তাই পান করল। মুহূর্তে তার চেতনাহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

শেষবারের জন্যও কন্যাকে আর দেখতে পেল না সে।

সন্তানের বেদনা সহ্য করতে না পেরে। বুলবুল আত্মহত্যা করল বটে কিন্তু গান্না করল না।

নিয়তির কাছে সে আত্মসমর্পন করেছিল। বাঁদী হয়েই থেকেছিল আরো দীর্ঘ দিন। প্রতি মুহূর্তে চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করেছিল জীবনের কোন মুহূর্তে স্বপ্ন দেখার। কোন কামনা নয়, কোন সাধনা নয়, শুধু একটি মাত্র জীবনের অনুরোধ সে করেছিল সমাজকে—"আমি

মরলে আমার চোখের জল দিয়ে রচনা কয়টি কথা শুধু উৎকার্ণ কোর কবরের প্রস্তরে।”

আঠার বছর পরে গান্নার মৃত্যুতে সে কথা কয়টিই মুরাবাদে গান্নার কবর প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ হয়েছিল।

“ওহ্ ঘাম-ই-গান্না বেগম।”

সে চোখের জল নির্মল শিশির বিন্দুর মত আজো তার কবরের উপর টল্ মল্ করছে। রক্তের দাগ মুছে গেছে, কিন্তু অশ্রু সিক্ততা আজো যায়নি।